প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর :
অসিত সরকার
গ্রন্থনা
৩৪ শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী :
গৌতম রায়

পঁচিশ টাকা
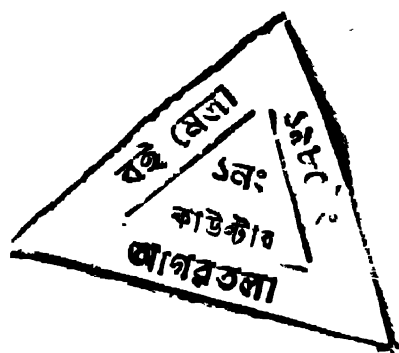
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু

সূচীপত্র

আমাদের প্রকাশিত
এই লেখকের অন্যান্য বই

সাঁকোর ওপরে নীরা
আততায়ী
যুবতীর মন নদী
অনুভার স্বপ্ন

আমার সাহিত্যজীবন

মেঘলা আকাশের মতন মুখভার। হাসি নেই। কথা নেই মুখে। এই ছেলে এমন কেন। চুপচাপ। খেলাধুলা করে না, মেলামেশা নেই কারো সঙ্গে।

এই বয়সে বাচ্চারা হুটোপাটি করে। সারাক্ষণ তাদের ছুটোছুটি লেগেই আছে। এটার জন্য বায়না, ওটার জন্য কান্নাকাটি, খেলনা পেলে খাবার পেলে মহাখুশি। মেলায় যাবার নাম শুনলে আহ্লাদে নাচতে থাকে। জাম পাকলে জামতলায় ছুটে যাচ্ছে! শীতের রোদ্দুরে টোপাকুল গাছের তলায় তাদের ভিড়।

এই ছেলে তো তা নয়।

ছনের ছাউনি দেওয়া রান্নাঘর। ছেঁচা বাঁশের বেড়া টিনের চাল ঠাকুর্দার শোবার ঘর, যার নাম বড ঘর। মাঝখানে একফালি রাস্তা পুকুরঘাটে যাবার। রাস্তা ঘেঁষে পুঁইমাচা। মাচার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ধনু। কি ভাবছে ও।

চার বছরের ছেলের এত ভাবনা কোথা থেকে আসে। কি ভাবছিস, মা জিজ্ঞেস করে। তারপর ঠাকুর্দা-ঠানদি জিজ্ঞেস করে। তারপর কাকারা পিসিরা। উঁহু, উত্তর দেবে কে। রা নেই ছেলের মুখে। ড্যাবড্যাব করে পুকুরঘাটের দিকে তাকিয়ে। খেজুর আর ডালপালা ছড়ান একটা ঝুপসি শেওড়া গাছের পিছনে লাল দগদগে আকাশ। সূর্য অস্ত যায়।

ছোটকাকা বলল, ধনু আকাশ দেখছে। বড়পিসি বলল, ফড়িং দেখছে ও। ঝাঁক বেঁধে লাল ফড়িং উড়ছে খেজুর গাছের মাথার কাছে। ঠানদি বলল, ওর বোধ করি ঘুম পেয়েছে বউমা, খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও। মা ছুটে এসে ঠাস করে গালে চড় লাগায়। আসলে ওর এখানে মন বসে না। মামাবাড়ির জন্য ছটফট।

ততক্ষণে কোর্ট-কাছারি সেরে বাড়ি ফিরে উকিলের ধড়াচূড়া ছেড়ে বাবা আদর করে ওকে কাছে ডেকে নেয়। তারপর ছেলের হাত ধরে রাস্তার ওপারে সোজা কোবরেজ মশায়ের বৈঠকখানায়। ওষুধের আলমারি ঠাসা ঘরের পিছনে ভিতর দিকে দাবার আড্ডা। দাবার ছক ঘিরে কতগুলি কাঁচা পাকা অত্যুৎসাহী মাথা। হুঁকোর গুড়ুক গুড়ুক। ধোঁয়ার কুণ্ডলী। আর থেকে থেকে পিলে চমকান হৈ-হৈ। 'আহা, ঘোড়ার চাল দিন।' 'নৌকোটা ধরে রাখুন মশাই।'

বাবার পিঠ ধরে হাঁ করে ধনু দাঁড়িয়ে। খেলা দেখছে? না তো। কিছুই দেখছে না সে। রাজা মন্ত্রী হাতি ঘোড়া নৌকো বোড়ে, ঘুঁটির ওপর ঝুঁকে পড়া এতগুলি মাথা মুখ, খেলোয়াড়দের বাঁ-হাতে ধরা হুঁকো, গলগলে ধোঁয়ার কুণ্ডলী —কিছুই তার দেখবার নেই। কেবল ভাবছে। কি ভাবছে ও?

তাই আজ চিন্তা করি। সারাক্ষণ মুখ গোমড়া করে কোন্ ভাবনায় ডুবে থাকতাম সেদিন। আসলে কি জায়গাটাই আমার ভাল লাগত না? হয়তো তাই। মা-ই আমার মন বুঝত। মা ছাড়া ছেলের মন কে বেশি বোঝে।

ছোট মফঃস্বল শহর। কোর্ট-কাছারি হাসপাতাল ট্রেজারী থানা গার্লস স্কুল, এদিক ওদিক কিছু পান সিগারেটের দোকান, স্টেশনারী দোকান, মিষ্টির দোকান, আর কম করেও চার পাঁচটা কবিরাজি ডিসপেনসারী। শীতের মুখে বড় বড় কড়ায়ে চ্যবনপ্রাশ জ্বাল দেওয়ার গন্ধ আর ফাল্গুন পড়তে পাঁচন সেদ্ধর গাঢ় তেতো গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠত।

কিন্তু কেন ভাল লাগত না! জ্ঞান হওয়ার আগে থাকতে যে আমি এই শহরে। বাবার কাছে। মা-র শ্বশুরবাড়ি এটা। কিন্তু মা-র চেয়েও বাবাকে যে আমি বেশি ভালবাসি। এখানে আমার মন না বসার কারণ? ঐ বয়সে কি কোনো শিশু নিজেকে প্রশ্ন করত। না প্রশ্ন করে নিজের মধ্যে সঠিক উত্তর পেত?

ভাল লাগত না, বাস্ এই পর্যন্ত। একরত্তি শহরটার দু পা বাড়ালেই ধান ক্ষেত প্লাট ক্ষেত, নদী খাল বিল, আর ধুধু গ্রাম। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে বড় বড় ভাওয়ালে নৌকো কাঁঠাল বোঝাই হয়ে বাজারের ঘাটে এসে ভিড়ত। আষাঢ়ে তিন পয়সা দুধের সের। আর কার্তিকের শুরু থেকে সারাটা শীত মাছ আর মাছ। মানুষ কত মাছ খাবে। কাকে বকে খেত। তারপরও যা থেকে যেত, বাঁশের চটায় গেঁথে শুকিয়ে শুঁটকি করা হত। কিন্তু মাছ দুধ কাঁঠাল দেখে কি চার বছরের শিশু খুশি হয়। তাই তো। কি দেখলে তার ভাল লাগবে!

আজ আমি বুঝি তখনও আমার ভাললাগার বোধ জন্মায়নি। ভাসানের দিন তিতাসের বুকে কত ঠাকুর! শহরে আর ক'টা পুজো। দূর-দুরান্তের সব গ্রাম থেকে নৌকায় করে সেদিন বড় বড় দুর্গা প্রতিমা এসে ভিড়েছে শহরের বাজারের ঘাটে। যেন বিসর্জনের আগে শহরের মানুষকে ঠাকুর না দেখালে গাঁয়ের লোকের মন উঠত না। তেমনি পয়লা ভাদ্রের নৌকা-দৌড়। শত শত নৌকো সেদিন তিতাসের জলে ছুটোছুটি করেছে। বিচিত্র দৃশ্য! আর

পাঁচটি শিশুর মতন ভাল জামা-কাপড় পরে নৌকা-দৌড় দেখতে গেছি। এই পর্যন্ত। খুব একটা উৎসুক দিশেহারা হতে পারিনি যেন।

ঐ যে বললাম, কোন্ দৃশ্য কোন্ শব্দ—কিসের গন্ধ আমাকে আনন্দ দেবার জন্য অপেক্ষা করছিল তখনও জানতে পারিনি, বুঝতে পারিনি। একদিন ঠাকুর্দার সঙ্গে একটা বাগান দেখতে গেলাম। আম-কাঁঠালের না, ফুলের বাগান।

ঠাকুর্দার সঙ্গে রোজ সূর্য ওঠার আগে বেরিয়ে পড়তাম। প্রাতঃভ্রমণের নেশা ছিল তাঁর। ঠাকুর্দার আঙুল ধরে শহরের শেষ সীমায় রেল লাইন পার হয়ে ধান ক্ষেত পাট ক্ষেত দেখতে দেখতে একটা খালের ধারে চলে গেছি। ভাদ্র মাসে জলে ডোবান পাটের পচা গন্ধে, অঘ্রানে পাকা ধানের গন্ধে আর বর্ষার দিনে—বলেছি খাল বিলের দেশ আমাদের, পুঁটি মৌরলা খলসে মাছের আঁশটে গন্ধে ভোরের বাতাস ভুর-ভুর করছে টের পেতাম। আমি এখানে গন্ধের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। সব ক'টা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সেই শৈশব থেকে আমার নাকটা অতিমাত্রায় সজাগ সচেতন। পরবর্তী জীবনে সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে এই গন্ধ আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। সেদিন খালের ধারে পৌঁছে ঠাকুর্দার সঙ্গে হেলিডি সাহেবের বাংলোর লাগোয়া ফুলবাগানের কাছে চলে গেলাম। দারোয়ান গেট খুলে দিল। বুড়ো দারোয়ান ঠাকুর্দাকে বড় ভালবাসত। বাগানে ঢুকেই তিনচার হাত দূরে একটা জিনিস দেখে চমকে উঠলাম। না, খুব যে একটা ফুলের সমারোহ ছিল বাগানে তা নয়। দেখলাম আমার মাথার সমান উঁচু একটা গাছের দুটো ডালে দুটো সদ্য ফোটা গোলাপ। একটু একটু শিশির লেগে আছে পাপড়ির গায়ে। ভোরের রক্তরাঙা আলোর ছটা লেগে ঝকমক করছে ফুল দুটো। অল্প বাতাসে একটু একটু কাঁপছে। একটা সোনালী নীল প্রজাপতি একটা আফোটা কলির বোঁটায় চুপ করে বসে আছে। আমার চোখের পলক পড়ল না। শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। ভাললাগা কাকে বলে, ভাল দৃশ্য কী সেদিন প্রথম টের পেলাম। আর গন্ধ। নির্জন উষার সেই বাগানে গোলাপের মৃদু কোমল গন্ধে আমার বুকের ভিতর ছেয়ে গেল। সেই গন্ধ বুকে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। যেন একটা আশ্চর্য সম্পদ আহরণ করে বাড়ি ফিরলাম।

আর একদিন। বাবার সঙ্গে ট্রেনে চড়ে আমার জন্মস্থান, আমার মায়ের দেশ কুমিল্লায় বেড়াতে গেছি। শহরের ওপর মামাদের বাসা। মাকে ছেড়ে এই প্রথম আমার মামাবাড়ি যাওয়া। চার থেকে সাড়ে চার বছর আমার বয়স

তখন। কাজেই মামাবাড়িতে আমার খাতির যত্নটা সেদিন একটু অন্যরকম ছিল। বড়মামা চোখের ইসারা করতে আমার সমবয়সী দুটি মামা বাড়ির ভিতর ছুটে গিয়ে আমার জন্য উপহার নিয়ে এল। তখনও আমার জামা-কাপড় ছাড়া হয়নি, দিদিমার দেওয়া লুচি সন্দেশ খাওয়া হয়নি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছোট দুই মামার হাতে ধরা উপহারগুলি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। চোখের পলক পড়ছিল না। রঙবেরঙের ক'টা পাখির পালক, কাজু বাদামের সাইজের—তেমনি সাদা ধবধবে ক'টা বালি-পাথর আর একরাশ শুকনো বকুল। অর্থাৎ ধনু মামাবাড়ি বেড়াতে আসছে, বাবার চিঠি পেয়ে মামারা ছোট্ট ভাগ্নেটির জন্য রঙিন পাখির পালক, ছোট ছোট বালি-পাথর ও কিছু বকুল ফুল যোগাড় করে রেখেছিল। সকালের কুড়োনো বকুল শুকিয়ে লাল হয়ে গেছে। তা হলে হবে কি। ওই শুকিয়ে ওঠা বকুলের গন্ধ তীব্র হয়ে আমার নাকে লাগল। যেন সঙ্গে সঙ্গে আমি সুরভিত হয়ে উঠলাম। যেন ফুলটা বাসি হয়ে উঠেছিল বলে গন্ধটা এত বেশি ভাল লাগছিল।

যাই হোক, সেদিন আবার আমার প্রথম ভাললাগার আশ্চর্য অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে দিল। যেমন একদিন আশ্বিনের পরিচ্ছন্ন প্রত্যূষে হেলিডি সাহেবের বাগানের দুটি শিশিরভেজা গোলাপ আমাকে আবিষ্ট করেছিল। প্রথম ভাল-লাগার অনুভূতি। এর অর্থ কি! আজ ভাবি, সেদিনের সেই সব মুহূর্ত থেকে একটা শিল্প-বোধ আমার মধ্যে তৈরী হতে শুরু করেছিল। কৈ আমাদের দেশের নৌকো বোঝাই কাঁঠাল নারিকেল, কার্তিকের এত মাছ, ভাসানের ঘাটের অগুনতি প্রতিমা, পয়লা ভাদ্রের নৌকা-দৌড়ে নদীর বুক জুড়ে সরঙ্গা পাতাম কোষা নাওয়ের ছুটোছুটির দৃশ্য এমন বিস্মিত অভিভূত করতে পারেনি তো। না কি হাজার হাজার মানুষ সে-সব জিনিস দেখত উপভোগ করত বলে? ভিড়ের ভাললাগা আমার ভাল লাগেনি? তাই হবে। নির্জন উষায় সাহেবের বাংলোর গোলাপ দুটি যেন একান্ত করে আমার জন্য ফুটেছিল। যেমন আমাকে উপহার দেবে আমাকে খুশি করবে ভেবে ছোট্ট দুটি মামা রঙিন পাখির পালক বাসি বকুল ও কৌটো ভরে বেলেপাথর নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

এত কথা আমার বলার উদ্দেশ্য একটা মানুষের জীবনে সাহিত্য-রচনা শিল্প-সৃষ্টি কিছু আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একটু একটু করে সে গল্পলেখক হয়ে ওঠে, ঔপন্যাসিক কবি বা চিত্রকর হয়ে ওঠে। বিন্দু বিন্দু করে তার রক্তে শিহরণ সঞ্চারিত হয়। আমার তাই বিশ্বাস।

হ্যাঁ, ভাল-লাগা কাকে বলে জানলাম। পাখির পালক দেখে শুকনো বকুলের গন্ধ বুকে টেনে মুগ্ধ হতে শিখলাম।

তারপরের ঘটনা কবিতা পড়া নয়—আবৃত্তি। স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বিভাগীয় কমিশনার, মহকুমা হাকিম, ডেপুটি মুন্সেফ, উকিল মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ, পেশকার, দোকান-মালিকদের নিয়ে প্রায় তিনশ ছেলের অভিভাবকদের বিরাট সমাবেশ। পুরস্কার বিতরণের আগে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। একলা স্বভাবের ছেলেটি 'যাও পাখি যাও উড়ে' বলে একটা কবিতা আবৃত্তি করল। কেমন করে আবৃত্তি করতে হয়, তার বাবা আগের দিন সকালে তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। নীল আকাশের বুকে মুক্তির পাখা মেলে ছোট পাখি উড়ে যাচ্ছে। ছেলেটি যেন নিজেই পাখি হয়ে অগাধ নীলের মধ্যে হারিয়ে যেতে লাগল। আবৃত্তি শেষ। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক শ মানুষের হাততালি, প্রশংসার গুঞ্জন। বালক স্তব্ধ হয়ে শুনল। উঁচু উঁচু ক্লাসের ছেলেদের হারিয়ে দিয়ে আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেল সে। পুরস্কারের বইটি বগলে নিয়ে তক্ষুনি বাড়ি ছুটে যাওয়া। কিন্তু বাড়ি গিয়ে সে কি দেখল। রান্নাঘরে চুপ করে মা বসে আছে, উনুনের কড়াইয়ে ডাল সেদ্ধ হচ্ছে। ভাল লাগল তার। যেন একটা প্রকাণ্ড আকাশ থেকে নেমে এসেছে সে। খেলার মাঠের প্যাণ্ডেলের সেই সভাটাও আকাশের মতন বড় লাগছিল তার কাছে। যেন অগুনতি তারার মতন অসংখ্য মানুষের মুখ মাথা। এখন নিরিবিলি রান্নাঘরে মা-র পাশে এসে স্বস্তি পাচ্ছে সে।

কিন্তু জিনিসটা সেখানেই শেষ হয়ে গেল কি। কল্পনার পাখি দেখতে শিখলাম। মনের মধ্যে অন্তহীন নীলিমা ধরা দিতে লাগল। তারপর থেকে ক্লাসে মাস্টারমশাই বই খুলে যখনই কবিতা পড়ে শোনাতেন, তখন আর শুধু কবিতা শুনতাম না। চোখের সামনে ছবি দেখতাম। 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে' অথবা 'বাঁশ বাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ঐ'—বুকের ভিতর শিরশির করে উঠত। অর্থাৎ সাহিত্যের রস কবিতার রস কেমন একটু একটু করে তার স্বাদ বুঝতে পারছি।

ঠিক তার এক বছর পরেই, তখন আমার বয়স এগারো, একদিন কবিতা পড়া বন্ধ করে মাস্টারমশাই আমাদের দিকে চোখ তুলে বললেন, তোরাও কবিতা লিখতে পারিস। পারবি। চেষ্টা করে ছাখ না। চমকে উঠলাম কথাটা শুনে। তাই তো, এমন কথা তো কেউ বলেনি, এ ধরনের কথা কারো মুখে তো শুনিনি।

বুকের ভিতর যেন বাজনা বেজে উঠল। তোরাও পারবি কবিতা লিখতে। চেষ্টা করে ত্থাখ্। আর কেউ চেষ্টা করেছিল কিনা জানি না। তার প্রমাণ পাইনি। আমি তখনই কোমর বেঁধে লেগে গেলাম। সাদা ফুলস্কেপ কাগজ কিনে চটপট একটা খাতা তৈরী করে ফেললাম। রুলটানা বাঁধান একসারাইজ খাতায় আমি কিন্তু কোনোদিন গল্প কবিতা লিখতে পারিনি। আজও না। রুলটানা কাগজের চেহারা দেখলেই মনে হয় এই জিনিসে স্কুলের হোম-টাস্ক করা চলে। অর্থাৎ ধরাবাঁধা যে-সব লেখা। আর পাঁচজন যা লেখে। সাদা কাগজের পৃষ্ঠায় স্বাধীনভাবে কলম চালাবার সুযোগ থাকে। আর আমার কলমও তখন দারুণ স্ফূর্তি পায়। আজও এমন কাগজেই আমি আমার পাণ্ডুলিপি তৈরী করি।

হুঁ, গ্রীষ্মের ছুটিটা কবিতা লিখে কেটে গেল। কবিতায় কবিতায় খাতা ভরে গেল। কবিতার খাতার নাম দিলাম "ঝরনা" যেন একটা কবিতার বই ছাপিয়েছি আমি। ছুটির শেষ ক'টা দিন মামাবাড়ি ছিলাম। খাতাটা সেজমামাকে দেখালাম। একটু হাসলেন তিনি। ক'টা পাতা উল্টেপাল্টে দেখলেন। ব্যস, এই পর্যন্ত। কোনোরকম মন্তব্য না। যদি তিনি বলতেন, 'কিচ্ছু হয়নি'— একরকম লাগত; যদি তিনি বলতেন, 'বেশ বেশ, সুন্দর হচ্ছে, লিখে যা', নিশ্চয় আহ্লাদে নাচতাম। কিন্তু শুধু একটা নিঃশব্দ হাসি এবং তারপর খাতাটা আমার হাতে ফিরিয়ে দেওয়া। কেমন যেন অবাক হলাম, অভিমান হল খানিকটা, ব্যথাও পেলাম কম না। আজ আমার নতুন প্রকাশিত একখানা উপন্যাস উৎসাহের সঙ্গে কাউকে পড়তে দেই, আর যদি তিনি এভাবে একটু হেসে কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টেপাল্টে দেখে বইটা তখনি আমাকে ফিরিয়ে দেন! আমার মনের অবস্থা কেমন হবে? সেদিনও তাই হয়েছিল। আমার লেখা সম্বন্ধে একজন পাঠকের শীতল নিস্পৃহতা আমাকে যত ক্ষুন্ন ক্ষিপ্ত করে, গালিগালাজ তা করে না।

কিন্তু সাতদিন পরেই আমার নিরুৎসাহের ভাবটা কেটে গেল। বাড়ি ফিরলাম। স্কুল খুলে গেছে। ক্লাসের মাস্টারমশাইকে কবিতার খাতাটা দেখালাম। চেয়ারে বসে একটা একটা করে সবকটা কবিতা পড়লেন তিনি। উৎসুক হয়ে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে। দেখলাম, এক সময় তাঁর বড় বড় সাদা দাঁত চকচকে হয়ে উঠল, চোখেমুখে খুশির আলো বিচ্ছুরিত হল। খাতাটা বন্ধ করে কাছে ডেকে আমার পিঠে মৃদু চাপড় দিলেন। 'লিখে যা, তুই পারবি', ক্লাসের সবাইকে শুনিয়ে বড় গলায় তিনি বললেন, 'তোর হবে'। দেখলাম, আমি ছাড়া আর একটি ছেলেও কবিতা লিখে আনেনি, মাস্টারমশায়ের হাতে কবিতার খাতা তুলে

দেখিনি। চোখ বড করে সতীর্থরা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। গর্বে আমার বুক উঁচু হয়ে উঠল। এই হল সাহিত্য-জগতে আমার প্রথম প্রবেশের কাহিনী। আমার ছোট মহলে আমি 'কবি' হয়ে গেলাম।

ঠিক তার কদিন আগের একটা ঘটনা। শরতের মহাঅষ্টমীর জ্যোৎস্না টলটল করছে। বড়মামার সঙ্গে ঠাকুর দেখে আমরা ফিরছি! রাস্তার দুদিকে ধানক্ষেত। অল্প বাতাসে ধান গাছে দোলা লাগছে। ধানে দুধ এসে গেছে। কদিন পরে ধান পাকবে। এমন সময় ক্ষেতের দিকে চোখ রেখে হাঁটতে হাঁটতে বড়-মামা বললেন, পাকা ধানের গন্ধে রবিঠাকুর পাগল হয়ে কবিতা লিখতে বসে যান। খচ করে কথাটা এসে আমার মগজে বিঁধল। অ্যাঁ, রবিঠাকুর, কোন রবিঠাকুর, ঐ যে আমাদের বাংলা সাহিত্য-পাঠের 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে…' কবিতাটা লিখেছেন! তাই তো, ধানের গন্ধে তিনি পাগল হন! অদ্ভুত লাগল শুনে। সেদিন কালিদাস রায়, কুমুদ মল্লিক, কামিনী রায় থেকে শুরু করে সব কবিকেই সমান চোখে দেখতাম। কিন্তু বড়মামার কথা শুনে মনে হল রবিঠাকুর একজন বিশেষ জাতের কবি, অন্য কবিদের চেয়ে তিনি আলাদা। ধানের গন্ধ তাঁকে উন্মনা করে, অস্থির করে। আগেই বলেছি, শৈশব থেকে আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয় অত্যন্ত সজাগ প্রখর। তাই সারাক্ষণ বড়মামার কথাটা চিন্তা করলাম, আর ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হতে লাগলাম। আমিও তো ধানের গন্ধ পাই, ঘাসের গন্ধ পাই। কেবল কি ধান ঘাস। ফুলের গন্ধ, পাখির পোকা-মাকড়ের গায়ের গন্ধ, খড়কুটো কাঁকড়ার মাটি মুলো শসা, এমন কি ঘরের কোণার মাকড়সার জালের গন্ধ অহরহ আমার নাকে লাগে, আমি তো পাগল হয়ে রবিঠাকুরের মতন কবিতা লিখতে বসে যাই না।

সেদিন আফসোস করেছি। কিন্তু পরবর্তী জীবনে এই সব গন্ধের স্মৃতি আমাকে অনেক গল্পের অনেক উপন্যাসের চরিত্র আঁকতে সাহায্য করেছে।

আমাদের বাসার কাছেই ভুবন পণ্ডিতের বাসা। একটা প্রকাণ্ড বাতাবি লেবু গাছ পণ্ডিতের রান্নাঘরের পিছনে। পণ্ডিতের দু' মেয়ে বড়বুড়ি ও যমুনা। বাতাবি লেবুর লোভে প্রায়ই আমরা ওদের বাসায় ছুটে যেতাম। এবং যখনই যেতাম, আমি যেন দু'বোনের গায়ে একটা গন্ধ পেতাম। কেমন গন্ধ? বাদলা দিনে মাটির খোলায় কাঁঠালবিচি ভাজলে যেমন গন্ধ বেরোয়। বস্তুত বড়বুড়িরা সারাক্ষণ যে কাঁঠালবিচি ভাজত বা কটকট করে কাঁঠালবিচি চিবোত তা নয়। কেবল গ্রীষ্ম বর্ষাই না, মাঘের কড়া শীতেও দু'বোনের গায়ে আমি ওই গন্ধ

পেতাম। কৈশোরের সেই গন্ধের স্মৃতি চল্লিশ বছর বয়সে আমাকে দিয়ে 'বুটকি ছুটকি' গল্প লিখিয়েছিল।

বলেছি আমাদের বাসার কাছেই কোর্ট-কাছারি। কাছারির কাছেই একটা কাঁঠালগাছের নিচে মিষ্টির দোকান। দোকানের পিছন দিকটায় হালুইকরের এক ফোঁটা বাসা। ছোটপিসির সঙ্গে রোজ একবার করে হালুইকরের বউয়ের কাছে যেতাম। ছোটপিসির সঙ্গে হালুইকরের বউয়ের খুব ভাব ছিল। মাটিতে দাগ কেটে তেঁতুলবীচি দিয়ে আমরা ষোলঘুঁটি খেলতাম। ছোট বাসা, ছোট স্যাঁতস্যাঁতে উঠোন। শ্যাওলা ধরে কেমন সবুজ সবুজ দেখাত। উঠোনের পাশেই গুঁড়িপানা ভরতি ডোবা। সেখানে সারাক্ষণ হাঁসের প্যাঁকপ্যাঁক শুনতাম। কিন্তু হালুইকরের গিন্নী ছিল ভয়ানক সুন্দরী। জোছনা ছাঁকা গায়ের রঙ। টানা টানা চোখ। হাঁসের গায়ের গন্ধ থানা-ডোবার গন্ধ স্যাঁতস্যাঁতে উঠোন আর ওদিকে হালুইকরের কড়াই থেকে উঠে আসা খাঁটি ভয়সা-ঘিয়ে লুচি পান্তুয়া ভাজার গন্ধের স্মৃতি দীর্ঘকাল আমার নাকে লেগেছিল। সেইসব গন্ধের সঙ্গে হালুইকরের যুবতী স্ত্রীর অপরূপ রঙ, ছিমছাম কাঠামো ও অনিন্দ্যসুন্দর চোখদুটির স্মৃতি পরে একদিন আমাকে দিয়ে 'গিরগিটি' গল্প লিখিয়েছিল কিনা কে জানে।

তেমনি শিশুকালে নিত্য যার সঙ্গে প্রত্যূষে বেড়াতে বেরোতাম, সেই আমার দীর্ঘায়ু লোভী ঠাকুর্দার গায়ের পাকা আমের গন্ধের মতন নিবিড় মদির গন্ধ ও হেলিডির বাংলোর গোলাপের টাটকা গন্ধ মিলেমিশে গিয়ে আমার কলম থেকে একদিন 'বনের রাজা' বেরিয়ে এল।

আমার 'সমুদ্র' গল্প পড়ে পাঠক বন্ধুরা, আমি যতটা তাঁদের মুখে শুনেছি, কলকাতায় বসে তাঁরা পুরীর সমুদ্রতটের রৌদ্রতপ্ত বালু, বালুর ওপর ছড়ান ঝিনুক-শামুক ও ইতস্তত সঞ্চরমান ক্ষুদে কাঁকড়া, নুন মেশানো বাতাস ও মাছ ভাজার গন্ধ পেয়েছেন।

আবার আমি আমার কৈশোরে ফিরে যাই। কবিতা দিয়ে সাহিত্য আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু কেবল কবিতা লিখে কবিতা পড়ে ক্ষুধা মিটছিল না। গল্প চাই। গল্প খুঁজছি। বাড়ির কারো সাহিত্য পড়ার নেশা খুব একটা ছিল না। কাজেই তেমন বইটই বাড়িতে বড় একটা দেখতাম না। একদিন কিন্তু বাবার টেবিলে আইনের বইয়ের পাশে গ্রন্থাবলীর সাইজের মলাট-ছেঁড়া তিনখানা উপন্যাস পেয়ে গেলাম। রাজপুত জীবনসন্ধ্যা, মাধবীকঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত। ব্যস্, যেন অমূল্যরত্ন হাতে এসে গেল। রুদ্ধশ্বাসে তিনখণ্ড বই পড়ে শেষ করলাম।

শেষ করবার পর আবার বসিয়ে এক একটা বই পড়ি। এগারো থেকে বারো আমার বয়স তখন। হয়তো সব কথা বুঝতাম না। কিন্তু বাংলা ভাষা তো। পড়ে যেতে অসুবিধে ছিল কি। তার আগে মোটে দুতিনখানা শিশুগ্রন্থ পড়ে শেষ করেছিলাম। চারু-হারু, ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুর্দার ঝুলি। তার পরেই রমেশ-চন্দ্রের গ্রন্থাবলী দিয়ে সাবালক সাহিত্য পাঠ শুরু। চরিত্রগুলি চোখের সামনে নড়চড়া করতে লাগল।

আমার একটা দোষ। অন্তত ছেলেবেলায় এটা খুব ছিল। ভাবতাম আমি যেন উপন্যাসের একজন নায়ক, এমনকি কোনো কোনো সময় নিজেকে নায়িকা ভাবতেও সুখ হত। ভাবতাম নায়ক নায়িকাদের মতন আমিও আমার জীবনটা কাটাব। মাধবীকঙ্কণ পড়ে বালুবেলায় একটি বালিকাকে আমি মনে মনে খুঁজেছি এবং কল্পনায় আমি তার হাতে মাধবীকঙ্কণ পরিয়ে দিয়েছি। মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত পড়ে নিজেকে মনে হত আমিও সেই দুঃসাহসী মারাঠী বীর। মাওয়ালী সৈন্যদের নিয়ে আমিও যেন পাহাড়ে পাহাড়ে একটার পর একটা দুর্গ জয় করে চলেছি। বলতে কি সেদিন থেকে আমি খুব পাহাড়ের স্বপ্ন দেখতাম। খেলার সঙ্গীদের নিয়ে যুদ্ধ কেল্লা-দখল ইত্যাদি খেলা খেলতে আরম্ভ করে দিলাম। কেবল কি খেলা, ইট মাটি পাথর একত্র করে তার ওপর ঘাসের চাপড়া বসিয়ে ছোট বড় পাহাড় তৈরী করতাম। পাহাড়ে ঝরণা থাকত, গুহা থাকত, গিরিবর্ত্ম থাকত। উঁহু ইট মাটি পাথর দিয়ে পাহাড় বানিয়ে তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না। রঙ তুলি ও কাগজ নিয়ে ছবি আঁকতে বসে গেলাম। সবই ল্যাণ্ডস্কেপ। পাহাড় পর্বত অরণ্য প্রান্তর। ব্যস্, এবার ছবি আঁকাটাই নেশার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল। আমার ছবি আঁকার সাথী ছিল ছোটমামা। পরে তিনি গভর্নমেণ্ট আর্টস স্কুল থেকে পাস করেন এবং ছবি এঁকে যথেষ্ট নাম করেন।

ছবি আঁকা, পাথর মাটি দিয়ে পাহাড় বানান আর সাহিত্য পড়া। আমি আমার কাজ পেয়ে গেলাম। আর আমি গোমড়ামুখ করে রান্নাঘরের পিছনে পুকুর ঘাটের সেই খেজুর ও শেওড়া ঝোপের পিছনে সন্ধ্যার রক্তাক্ত আকাশের দিকে চোখ রেখে একা একা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি না। অবশ্য তখন একটু বড়ও হয়েছি। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। মাধবীকঙ্কণ, মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত শেষ হয়ে গেল। হাতে এখন জলধর সেনের বিশুদাদা, পাগল, অভয়া। যেন আমিও পাগল হয়ে গেলাম। আত্মহারা হয়ে তিনখানা বই শেষ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা উপন্যাস হাতে এসে পড়ল। যতীন্দ্রমোহন সিংহের ধ্রুবতারা। পড়ে

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। না, ইতিহাসের কোনো চরিত্র নয়। এ যে আমার দেখা মানুষ। উপীন যেন আমার বড়মামা। চারুলতাকে যেন আমাদের পাড়ার কোনো বাড়িতে দেখেছি। বনলতাকে দেখেছি। আর উপীনদের সেই দেশের গাঁয়ের বৃহৎ একান্নবর্তী সংসার। এ আমার নিত্য দেখা ছবি। ভীষণ ভাল লাগল বইটা। বার তিনেক পড়েছিলাম মনে আছে। বলেছি, উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে আমার প্রাণ ছটফট করত। মনে মনে নিজেকে উপীন ভাবতাম আর উপীনের মতন আমার জীবনের ধ্রুবতারা কোনো চারুলতাকে খুঁজতাম। প্রেম ও প্রেমের ব্যর্থতার চিত্র তখন থেকে আমার মনে আঁকা হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে কোর্টের কাজে বাবার এক উকিল বন্ধু আমাদের বাসায় এলেন। হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করলেন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, বয়স বারো অতিক্রম করেনি, ধম্ম জলধর সেনের বই পড়ছে, ধ্রুবতারার মতন উপন্যাস পড়ছে। দেখে তিনি চমকে উঠলেন। বাবাকে সাবধান করে দিলেন। এত অল্প বয়সের ছেলেকে এ সব উপন্যাসটুপন্যাস পড়তে দেবে না। উপদেশ দেবার পর কাজ সেরে তিনি চলে গেলেন। অবাক হলাম বাবাকে দেখে। তিনি কিন্তু একবারও আমাকে বললেন না যে এখনও তোমার উপন্যাস পড়ার সময় হয়নি। আমি কিন্তু সেটাই আশা করেছিলাম। কিন্তু এই সম্পর্কে আমাকে কিছুই বললেন না তিনি। আমার সাহিত্য পড়া ছবি আঁকা বা কবিতা লেখার ব্যাপারে বাবা ভীষণ উদার ছিলেন। আমার সবকিছু তিনি পছন্দ করতেন। একটু বড় হয়েও লক্ষ্য করেছি।

সপ্তম শ্রেণীতে উঠে আমি প্রথম রবীন্দ্রনাথের গল্পের স্বাদ পাই। স্কুলে আবৃত্তি করে একখণ্ড গল্পগুচ্ছ উপহার পেয়েছিলাম। প্রায় রাতারাতি গল্পগুলি পড়ে শেষ করলাম। তারপর খুঁজতে লাগলাম গল্পগুচ্ছের বাকি খণ্ডগুলি কোথায় পাওয়া যায়। ছোট শহর, পাবলিক লাইব্রেরী বলতে সেদিন প্রায় কিছুই ছিল না। স্কুলের লাইব্রেরীতেও রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের পুরো সেট ছিল না। কাজেই বাকি খণ্ডগুলি যোগাড় করে পড়ে শেষ করতে প্রায় বছর দু'তিন আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

যাই হোক, একটা মজার ব্যাপার, সেই একখণ্ড গল্পগুচ্ছ পড়ার পর উপন্যাস পড়ার ঝোঁকটা আমার কমে গেল। ছবি আঁকা তখনও সমান বেগে চলছে। কিন্তু একখণ্ড গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি ক্রমাগত মাথায় ঘুরতে লাগল। এবং একদিন

হুট করে ছবি আঁকা ছেড়ে গল্প লিখতে বসে গেলাম। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র আমি তখন। চৌদ্দ পার হয়ে পনেরোয় পা দেব দেব করছি। বয়ঃসন্ধির সেই ভয়ংকর সময়ে পদ্য ছেড়ে আমি গদ্য লেখায় মন দিলাম। এবং সেটা ছোটগল্প।

ছোটগল্প লিখতে আরম্ভ করে কিন্তু আমি আর ছবি আঁকার দিকে তেমন মন দিতে পারিনি। ইচ্ছেও করত না। মনে হত গল্প লেখাটাই জরুরী। যখন নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন থেকে এই সমিতি সেই ক্লাব অমুক সঙ্ঘ বা এ-পাড়া ও-পাড়ার হাতে লেখা কাগজগুলিতে আমি গল্প দিতে আরম্ভ করি। অর্থাৎ তখন থেকে আমার ছোট গল্পের রীতিমত 'ডিমাণ্ড' শুরু হয়ে গেছে। সেদিন মফঃস্বল শহরগুলিতে হাতে লিখে কাগজ বার করার একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিল।

আমার মত করে আমি নিজেও হাতে লিখে একটা কাগজ বার করেছিলাম। একটি সংখ্যাই বার করেছিলাম। অবশ্য তাতে অন্য কারো রচনা ছিল না। আমার লেখা কবিতা, আমার আঁকা ছবি আর আমার লেখা গল্প—ব্যস! কাগজটা যখন হাতে নিতাম কী যে হাসি পেত না!

এভাবে বন্ধুমহলে, ছাত্রমহলে, আমাদের ছোট শহর এবং মামাবাড়ি কুমিল্লা শহরে আস্তে আস্তে আমি গল্পলেখক হিসাবে পরিচিত হতে লাগলাম।

স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে ঢুকে প্রথম বছরেই মোপাসার একটা ছোট গল্প অনুবাদ করে ঢাকার সাপ্তাহিক 'বাংলার বাণী' পত্রিকায় পাঠিয়ে দিই। গল্পটা ছাপা হল। ছাপার অক্ষরে এই প্রথম নিজের লেখা দেখলাম। যদিও অনুবাদ কর্ম। তার ঠিক একমাস পর ঐ কাগজে একটা গল্প লিখে পাঠাই। সম্পাদক মশায় সঙ্গে সঙ্গে গল্পটা ছেপে দেন। ছাপার অক্ষরে এই আমার প্রথম মৌলিক রচনা। গল্পের নামটা আজ মনে নেই। তবে ঐ সময় আমাদের কলেজ-ম্যাগাজিনে একটা গল্প লিখি। গল্পের নাম 'অন্তরালে'—আমাদের বাংলার অধ্যাপক গল্পটার খুব প্রশংসা করেছিলেন মনে আছে। তারপর থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, যেমন ঢাকার সাপ্তাহিক 'বাংলার বাণী', 'সোনার বাংলা', কলকাতার 'নবশক্তি', সাপ্তাহিক 'সংবাদ' ইত্যাদি কাগজে একের পর এক আমার গল্প ছাপা হতে থাকে। তখন এক দুপুরে একটা গল্প লিখে ফেলতাম। লেখার জন্য সেদিন কোনো কাগজ থেকে পয়সা পেতাম না।

হুঁ, এক দুপুরে, কি একটা সকালে বসে এক একটা গল্প লিখে শেষ করেছি। পরবর্তী জীবনে একটা গল্প লিখতে আমি দু মাসের বেশি সময় নিয়েছি। ইচ্ছে করে। কাটাকুটি মাজাঘষা অদলবদল করা যেন আর শেষ হত না। এখনও

প্রায় সেই অবস্থা। আমার পাণ্ডুলিপির চেহারা দেখে অনেক সম্পাদক ভয় পান।

তখন আমি কলেজের ৩য় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। 'সন্ত্রাসবাদী' সন্দেহে পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করে। চার মাস জেলে আটক রাখার পর আমাকে স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়। কথাটা বললাম এই জন্য সেদিন সরকারী নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে আমার ওপর আর একটা কড়া নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। পত্রপত্রিকায় লেখালেখি চলবে না। মুশকিলে পড়া গেল। মাথায় রাশি রাশি গল্প জমা হচ্ছে যে। বাধ্য হয়ে "জ্যোৎস্না রায়" ছদ্মনাম নিয়ে বিভিন্ন সাপ্তাহিক পত্রিকায় অনেকগুলি গল্প লিখেছিলাম। কাটিং রাখিনি। বা যেন রেখেছিলাম। দেশে আমার বইয়ের আলমারিতে ছিল। দেশভাগের পর সেসব আর আনা হয়নি। এভাবে আমার অনেক লেখা হারিয়ে গেছে। এবং আমার আঁকা অনেক ছবি।

একদিন আমার ওপর থেকে সরকারী নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল। আর ঠিক প্রায় ঐ সময় সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকা বেরোতে আরম্ভ করে। যতটা মনে পড়ে 'দেশ' পত্রিকার তৃতীয় বছরেই (১৯৩৬) 'রাইচরণের বাবরি' নামে আমার একটা গল্প প্রকাশিত হয়। এর কিছুকাল পরেই চাকরিবাকরির আশায় কলকাতা চলে আসি। অর্ডিনারী গ্রাজুয়েট। চাকরি দেয় কে! আজকের মতন সেদিনও (১৯৩৭-৩৮) চাকরির বাজার ভয়ানক টাইট ছিল। তবে এ-ও সত্য আদাজল খেয়ে অফিসের দরজায় ঢু মেরে চাকরি খোঁজার মেজাজ আমার ছিল না। কোনোদিনই ছিল না। চোখ ছিল সাহিত্যের দিকে। মন ছিল কি করে একটা ভাল গল্প লিখব। একটা পাইস-হোটেলে থাকি খাই। গোটা দুই টুইশনি করি। আর সারা দুপুর একা একা নিজের সীটে বসে গল্প লিখি। অদ্ভুত ভাল লাগত দিনগুলি। সিনেমা দেখি না খেলা দেখি না। হোটেলে থাকা খাওয়ার জন্য মাসে বারো তেরো টাকা দিতে হত। চা জলখাবার ধোপা নাপিত পান বিড়ি ট্রাম বাস ও টুকিটাকি খরচ নিয়ে আরও দশ বারো টাকা। ব্যস্, ছেলে পড়িয়ে ঐ কুড়ি বাইশ টাকা রোজগার করে ভাবতাম যথেষ্ট, আর রোজগারের দরকার কি। আমাকে 'লেখক' হতে হবে। বড় সাহিত্যিক হব। খ্যাতিমান হব। রাতদিন কেবল এই স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন দেখার ঠেলা এখন সামলাতে হচ্ছে। সত্যি, 'লেখক' হবার নেশায়, আজ চিন্তা করি, সেদিন কি ছেলেমানুষী না পেয়ে বসেছিল।

হুঁ, হোটেলের তক্তপোশের বিছানায় বসে সারা দুপুর গল্প লিখি। তখন

প্রেমেন্দ্র মিত্র সাপ্তাহিক 'নবশক্তি' কাগজের সম্পাদক। আমার অনেকগুলি গল্প তিনি ছেপেছেন। একবার 'নবশক্তির' পুজো-সংখ্যায় আমার একটা গল্প ছেপে দিলেন। বুকের পাটা বেড়ে গেল। তার মানে লেখক হবার পাগলামি আর একটু বেশি করে পেয়ে বসল। ঐ সময়ে 'পূর্বাশা' ও 'অগ্রগতি' বেরোচ্ছে। দুটো কাগজই দারুণ ভাল লাগত। একটা সাপ্তাহিক একটা মাসিক। কাগজ দুটো হাতে নিলেই একটা নতুন গন্ধ বেরোত। আষাঢ়ের শেষে নতুন ফোটা কদমফুল হাতে নিলে যেমন নাকে গন্ধ লাগে। পড়তে আরম্ভ করলে নতুন স্বাদ পেতাম। কেনার পয়সা সব সময় থাকত না। কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে পাতিরামের স্টলে দাঁড়িয়ে কতদিন পড়ে ফেলেছি। তখন ঐ পাড়াতেই থাকতাম কিনা। কদিন পরেই ভ্যানসিটার্ট রো থেকে "দৈনিক যুগান্তর" বেরোতে আরম্ভ করে। একটা সাব-এডিটরের চাকরি জুটে গেল। অবশ্য খুব অল্প সময় চাকরি করার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু সময়টার উল্লেখ করছি এই জন্য, এই ক'মাসের মধ্যে আমার তিনটি উল্লেখযোগ্য গল্প বেরোয় তিনটি কাগজে। পূর্বাশায় 'সূর্য', ত্রৈমাসিক পরিচয়ে 'নদী ও নারী' এবং দেশ পত্রিকায় 'অনাবৃষ্টি' নামে গল্প। তারপর থেকে পূর্বাশা ও দেশ-এ আমি নিয়মিত গল্প লিখতে থাকি। তখন শ্রীসাগরময় ঘোষ 'দেশ' পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। কদিন পরই হুমায়ুন কবীর সম্পাদিত 'চতুরঙ্গে' আমার একটি গল্প ছাপা হল। গল্পের নাম 'শালিক কি চড়ুই'।

পূর্বাশা, দেশ, চতুরঙ্গ, ভারতবর্ষ, মাতৃভূমি, পরিচয় ইত্যাদি কাগজে একের পর এক আমার 'পালিশ', 'মঙ্গলগ্রহ', 'কমরেড', বধিরা', 'শালিশ কি চড়ুই', 'শশাঙ্ক মল্লিকের নতুন বাড়ি', 'বনানীর প্রেম', 'নদী ও নারী' গল্প বেরিয়ে গেল। তখনও আমি উপন্যাসে হাত দিইনি। আমার সমসাময়িক লেখক বন্ধুরা প্রত্যেকে তখন উপন্যাস লিখতে শুরু করেছেন বা কেউ কেউ একাধিক উপন্যাস লিখেও শেষ করেছেন। আমি কেন উপন্যাসে হাত দিই না এই নিয়ে দু একটি বন্ধু প্রায়ই অভিযোগ করছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল এই: গল্প লিখে তোমার হাত পেকেছে, ভাষা পরিচ্ছন্ন, চরিত্র-চিত্রণও মন্দ হচ্ছে না। এখন উপন্যাস লিখতে আটকাচ্ছে কোথায়।

আমি মনে মনে হাসতাম। বন্ধুদের বোঝাতে পারতাম না বা মুখ ফুটে বলতাম না আমি উপন্যাসের দিকে আস্তে আস্তে এগোচ্ছি। আমি মনে করতাম গল্পগুলি হল এক এক খণ্ড ইট। আর উপন্যাস হল একটা প্রকাণ্ড ইমারত। সুতরাং ইটের পর ইট গাঁথার মতন আমি আমার গল্পের চরিত্রগুলি সাজিয়ে

দেব। সেই সঙ্গে সিচুয়েশনের দরজা জানালা জুড়ে দেব, ঘটনার সিঁড়ি থাকবে বারান্দা থাকবে। তার ওপর স্টাইলের পলেস্তারা পড়বে এবং তারপর ভাষার রং।

জানিনা বন্ধুরা সেদিন কথাটা শুনলে হাসতেন কিনা। আজ আমি হাসি। কারণ আমার মতন ইট না পুড়িয়েও এই পর্যন্ত অনেকে বড় এবং সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন। রোদে জলে ঘেমে নেয়ে একশা হয়ে ছোট-গল্প লেখার জন্য তাঁদের হাড় পাকাতে হয়নি। একবারেই তাঁরা মনোলিথিক স্ট্রাকচারের মতন এক একটি সুবৃহৎ উপন্যাস লিখে ফেলেছেন।

কাজেই বুড়ো বয়সে এখন বুঝতে শিখেছি ছোট্র-গল্প এক জিনিস, উপন্যাস আলাদা শিল্প। উপন্যাস লিখতে হলে ছোট-গল্প লিখে হাত পাকাবার দরকার পড়ে না। বরং বেশি ছোট-গল্প লিখতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে উপন্যাসের মধ্যে ছোট-গল্পের মেজাজ এসে যাবার ভয় থাকে। আমার কিছু কিছু উপন্যাস তাই হয়ে গেছে। এই জন্য অবশ্য আমি অনুতপ্ত নই। কারণ এই এক ধরনের উপন্যাস না হোক, উপন্যাসিকা তো বটে।

একদিন 'দেশ' পত্রিকার জন্য শ্রীসাগরময় ঘোষ গল্প চেয়ে চিঠি লিখে পাঠালেন এবং সেই সঙ্গে এক লাইন যোগ করে দিলেন—এবার উপন্যাসে হাত দাও।

আর দ্বিধা করলাম না। কাগজ-কলম নিয়ে কোমর বেঁধে উপন্যাস লিখতে বসে গেলাম। দু-চার মাসের পরিশ্রমের পর মোটামুটি একটা লেখা দাঁড়িয়ে গেল। দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক সেটা ছাপা হয়। এই হল আমার প্রথম উপন্যাস। নাম 'সূর্যমুখী'।

'সূর্যমুখী' লিখে নিন্দা খ্যাতি দু-ই জুটেছিল আমার। খ্যাতির চেয়ে নিন্দাই বেশি। 'সূর্যমুখী' পড়ে দু-চারজন পাবলিশার আমার পরবর্তী গ্রন্থ প্রকাশের জন্য উৎসাহী হয়ে আমাকে চিঠি দেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে তাঁরা বলেন, মশাই, আপনার 'সূর্যমুখী' পড়ে আমরা মুগ্ধ হয়েছি—তবে আমাদের যে বইখানা দেবেন, সেটি যেন 'সূর্যমুখী'র মতন না হয়। কথাটা শুনে কেমন বোকা হয়ে গিয়েছিলাম। হাঁ করে তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরে তাঁরা দাঁত ছড়িয়ে হাসলেন, বললেন, আপনার 'সূর্যমুখী'র ভাষা বর্ণনা চরিত্র চিত্রণের তুলনা হয় না। খুবই সরস লেখা। তবে আপনার ideology আমরা মেনে নিতে পারছি না। Ideology বলতে তাঁরা কি বুঝেছিলেন এবং

'সূর্যমুখী'তে আমি কোন্ আদর্শ দাঁড় করাতে চেয়েছিলাম, আজও আমার কাছে তা অস্পষ্ট থেকে গেছে। একটা ছোট মফঃস্বল শহর নিয়ে গল্প। সেখানে কিছু ভাল লোক ছিল, কিছু মন্দ লোক ছিল। তাদের লোভ হিংসা ছিল, কামনা বাসনা ছিল, যথেষ্ট স্নেহ মমতাও ছিল কারো কারো মধ্যে। এ-সব নিয়ে তারা বাঁচতে চেয়েছিল। সাধারণভাবে মানুষ যেভাবে বাঁচতে চায়। কোনো বড় আকাঙ্ক্ষা সাংঘাতিক স্বপ্ন তাদের চোখের সামনে ছিল না। এবং তাদের নিয়তি শেষ পর্যন্ত তাদের কোথায় টেনে নিয়ে গেল এই আমি শুধু দেখাতে চেয়েছি। আদর্শ প্রচার করার জন্য আমি ঐ উপন্যাস লিখিনি।

'সূর্যমুখী'র পর 'মীরার দুপুর' আমার দ্বিতীয় উপন্যাস। তৃতীয় উপন্যাস 'বারো ঘর এক উঠোন'।

পাঠকদের মতামত শুনে যতটা ধারণা হয় 'বারো ঘর এক উঠোন' আমার সবচেয়ে জনপ্রিয় বহুপঠিত উপন্যাস। হতে পারে। অনেক মুখ অনেক চরিত্র অনেক অন্ধকার বেদনা ও হাহাকার নিয়ে এই বই। এটিও 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। যতটা মনে পড়ে 'ন দশ মাস লেগেছিল 'দেশ'-এর লেখা শেষ করতে। কিন্তু শেষ করার পর আমার মনে হয়েছিল উপন্যাসের পরিণতি যেন ঠিক হল না। অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। আরও কিছু কথা বলার বাকি আছে। তাই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার পূর্বে আরও অনেকটা লিখতে হয়েছিল আমাকে। প্রায় তিন ফর্মা।

সেদিন 'বারো ঘর এক উঠোন' নিয়েও আমাকে নানা মহল থেকে কম আক্রমণ করা হয় নি। বিদগ্ধ পাঠকদের মধ্যেও কেউ কেউ এই উপন্যাসের নিন্দায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য অনেকটা এই রকম ছিল: এই সুবৃহৎ উপন্যাস লিখতে জ্যোতিরিন্দ্রকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে সন্দেহ নেই। এবং এই গ্রন্থে নিঃসন্দেহে তিনি যথেষ্ট শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সব শ্রম সব নৈপুণ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। প্রতিভার এমন মর্মান্তিক অপচয় সচরাচর দেখা যায় না। তিনি শুধু অন্ধকারই দেখেছেন। নিজে যেমন আলো দেখতে পান নি, তেমনি তাঁর এতগুলি চরিত্রের মধ্যে একটিকেও তিনি আলোর পথে উত্তরণের পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হলেন না। এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে।

কথাটা ঠিক। আমিও আমার জন্য দুঃখ করেছি। পাঁচশ পাতার একখানা ঢাউস উপন্যাস লিখেও পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে পারলাম না।

অর্থাৎ এমন বই তাঁদের হাতে আমি তুলে দিতে পারি না, যা পড়ে তাঁরা আনন্দ পেতেন তাঁদের মনে সুখের জন্ম দিত অথবা দুঃখের বিলাসে মন ভরে উঠত।

বারো ঘর লেখার আগে কিছুদিনের জন্য আমাকে এমন একটা বাড়িতে বাস করতে হয়েছিল। তা বলে সেখানে কে গুপ্তও ছিল না বা পাঁচু ভাদুড়ী, রমেশ, বিধু মাস্টার কি রুচি শিবনাথের মতন শিক্ষিত দম্পতিকেও আমি দেখিনি। কেবল একটা উঠোন ঘিরে বারোটা পরিবারকেই দেখেছিলাম। তার বেশি কিছু নয়। তবে আমার তখন মনে হল উপন্যাসের কাঠামো হিসাবে বহু পরিবারবিশিষ্ট এমন একটা আস্তানা মন্দ হয় না। হ্যাঁ, শুধু কাঠামোটাই কাজে লাগিয়েছিলাম। তারপর মগজ হাতড়ে হাতড়ে সেখান থেকে কে গুপ্ত, শিবনাথ, রুচি, রমেশ, বেবি, অমল চাকলাদার, কমলা নার্স, পারিজাত ও প্রীতি বীথিকে উদ্ধার করেছিলাম। তার অর্থ কি। আজ থেকে কুড়ি বাইশ বছর আগে তখন আমার বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ, তখনই আমি বারো ঘর লিখি, আর আমার ঐ স্বল্পপরিসর জীবনেই সমাজের কোনো না কোনো স্তরে, কোনো না কোনো সময় সেটা আমার মফঃস্বলের জীবনেও হতে পারে, বা কলকাতার মেছুয়াবাজারের বাড়ি, দর্জিপাড়ার বাসা কি শ্যামবাজারের আস্তানায় থাকার সময় আমার আশে-পাশে এমন সব চরিত্র ঘোরাফেরা করতে আমি দেখেছিলাম। বারো ঘরের মতন একটা বাড়ি পেয়ে চরিত্রগুলিকে একত্র করার সুবিধা হল। এবং এ-ও সত্য কোনো কোনো চরিত্র ও ঘটনা একেবারেই আমার কল্পনাপ্রসূত। পূর্বাশায় 'তারিণীর বাড়ি বদল' বলে আমার একটা গল্প বেরোয়। আমি চিন্তা করে দেখেছি 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসের বীজ কয়েক বছর আগে লেখা ঐ গল্পের মধ্যে লুকিয়ে ছিল।

আমি স্বীকার করছি। আলো দেখাবার জন্য উত্তরণ দেখাবার জন্য আমি এ-বই লিখিনি। কেননা আমার দেখা ও জানা চরিত্রগুলির মধ্যে এমন একটি মানুষও ছিল না, যে এদের মধ্যে উপস্থিত থেকে মহৎ জীবনাদর্শের বাণী শোনাতে পারত। বিপন্ন বিপর্যস্ত অবক্ষয়িত সমাজের মানুষগুলি শুধু বেঁচে থাকার জন্য, কোনোরকমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কতটা অন্ধকারে, কতটা নিচে নেমে যেতে পারে আমি তাই দেখিয়েছি। আলো বা উত্তরণের পথে এদের নিয়ে যেতে হলে আমাকে আর এক ভল্যুম বারো ঘর লিখতে হত। কেননা আমি যে-সব চরিত্র দেখেছিলাম, তারা জীবিকার অন্বেষণ, খাওয়া ঘুম মৈথুনে

সন্তান উৎপাদন ও পরস্ত্রীর দিকে কামার্ত চোখে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করত না, এর অতিরিক্ত কোনোদিনই তারা কিছু করে না।

তবে এর মধ্যে ব্যতিক্রম যে না ছিল এমন নয়। যেমন রুচি ও শিবনাথ। তারা নিজেদের অন্ধকারে তলিয়ে যেতে দেবে কেন। চিরকালের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানুষদের মতন আলোর দিকে হাত বাড়াবার সুবুদ্ধি ও বিচক্ষণতা তাদের ছিল। তবে এই আলোর সঙ্গে মহৎ জীবনদর্শন বা আধ্যাত্মিকতার কোনোরকম সংস্রব ছিল কি। যেন সুখ সচ্ছলতার উষ্ণতা গায়ে মেখে শীতের সকালের মৌমাছির মতন সৌভাগ্যের রোদ্দুরে পাখা মেলে দেবার জন্য দুজন নিয়ত উসখুস করছে।

যাই হোক 'বারো ঘর এক উঠোন' লেখার পর সমালোচকদের নিন্দা আক্রমণের যেমন কমতি ছিল না, তেমনি আমার ভাগ্যে প্রশংসা বাহবাও অজস্র জুটেছিল। পাল্লার কোন্ দিকটা ভারি ছিল বলা মুশকিল। ওজন করে দেখিনি। দেখার উৎসাহ আমার শিল্পী-জীবনের প্রায় গোড়ার দিকেই বুঝতে শিখেছিলাম যে, নিজের রচনার ভাল মন্দ যাচাই করতে শিল্পী যত বেশি বাইরের দিকে তাকাবেন তত বেশি তাকে ঠকতে হবে। আপনার একটা লেখা বেরোনো মাত্র একটা কাগজ সার্থক রচনা বলে চিৎকার করে আকাশ ফাটাল। এবং প্রায় একই সময় দেখলেন, একই শ্রেণীর কাগজে ব্যর্থ রচনা—কিছুই হয়নি ইত্যাদি বলে আপনাকে ধরাশায়ী করে দিল। একই সময় আপনি নরক-বাস ও স্বর্গ-বাসের সুখ-যন্ত্রণা ভোগ করলেন। যুগটা বড় বেশি মুখর। অনেক কাগজ অনেক পাঠক অনেক মতবাদের সামনে আপনাকে অহরহ দাঁড়াতে হচ্ছে। আপনি চোখ বুজে থাকলেও সমালোচনার চোখা তীর সাঁই সাঁই করে ছুটে এসে আপনার চোখের পাতা এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে। একই সময়ে নিন্দা প্রশংসার ঝড়ের সামনে আপনাকে দাঁড়াতে হচ্ছে। আপনার পায়ের চল্লিশ টাকা দামের জুতো দেখে যদি কোনো একটি বন্ধু চব্বিশের উর্ধ্বে উঠতে রাজী না হয়, আপনার সতেরো টাকার গায়ের চাদর দেখে যদি আপনার অতি-ভক্ত কোনো বন্ধু সত্তর টাকা আন্দাজ করতে আরম্ভ করেন তো কী করার আছে। উপায় নেই।

আপনার উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল, আপনার উপন্যাস অপাঠ্য অপ্রীতিকর, সাহিত্যের অঙ্গনে এই রচনা অনাবশ্যক। পরস্পর-বিরোধী এই দুটি মতামতের কোন্‌টা ঔপন্যাসিক গ্রহণ করবেন? একই সঙ্গে নিন্দা ও স্তুতির সুমেরু কুমেরুর দিকে তিনি পা বাড়াবেন? যেন একই সময়ে

আপনার হাতে দুটো টেলিগ্রাম এসে গেল। আপনার ঘোড়া রেসে ফার্স্ট হয়েছে—আপনার ঘোড়া রওনাই হয়নি। অর্থাৎ একটা বই লিখে একই সময়ে ঔপন্যাসিক হাসলেন ও কাঁদলেন—তাই না? শিল্পীর জীবনে এ এক অভিশাপ।

আবার পরীক্ষাও। আমি তাই মনে করি। পরীক্ষা হচ্ছে শিল্পী তাঁর নিজের সৃষ্টি-ক্ষমতার ওপর অকাট্য বিশ্বাস রেখে তাঁর পরবর্তী রচনায় হাত দিচ্ছেন কিনা। কারণ তিনি যদি বুঝতে পারেন এই ধরনের কোনো সমালোচনাই সার্থক আলোচনা নয় তো এই সবের ওপর নির্ভর করে আত্মসমালোচনা করার মূঢ়তা আর হতে পারে না। প্রত্যয়ের হাল শক্ত করে ধরে হাজার রকম মতামতের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া শিল্পীর আর কিছু করার আছে বলে আমি অন্তত মনে করি না।

আমার 'এতাবৎকালীন রচনার' মধ্যে কোনো উপন্যাসকেই আমি 'শ্রেষ্ঠ' মনে করি না। নিজের রচনার ক্ষেত্রে 'শ্রেষ্ঠ' শব্দটা প্রয়োগ করতে কোথায় যেন আটকায়। মনে হয়, কোনো রচনাই 'নিখুঁত' হল না 'সর্বাঙ্গীণ সুন্দর' হল না—আরও ভাল করে লেখা উচিত ছিল।

যাই হোক—আমার রচিত 'প্রেমের চেয়ে বড়' উপন্যাসখানা আমি মনের মতন করে লিখতে চেষ্টা করেছিলাম। বিষয়বস্তুটি ভাল লেগেছিল। রচনা কতটা সার্থক হয়েছে বলতে পারব না। এখানেও সেই অপরিতৃপ্তির প্রশ্ন। তবে আমার অন্যান্য রচনার তুলনায় এটিকে আমি 'অপেক্ষাকৃত ভাল' মনে করি।

তাঁকে নিয়ে গল্প

এসব কারণেই একটা মানুষকে নিয়ে আমি খুব বেশি নাড়াচাড়া করতে চাই না। কি দরকার। তিনি যেমন আছেন তেমন থাকুন।

আসলেও ভদ্রলোক তাই আছেন না কি। আমাদের সাতেও নেই পাঁচেও নেই। পোস্টাপিসের চাকরি। দশটায় কাজে যান পাঁচটায় বেরিয়ে আসেন। কোনোদিন বেরোতে একটু দেরি হয়। সবাই কোনো না কোনো কারণে, যাঁরা যে-অফিসেই কাজ করুন না, জানেন, ছুটির সঙ্গে সঙ্গেই ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে রোজ কিছু বেরিয়ে আসা যায় না। এক আধদিন আটকে যেতে হয়।

এসব আলোচনার মধ্যেই আসে না। এবং ছুটির পর অফিস থেকে বেরিয়ে তিনি যদি একটি ইস্কুলের ছেলের মতন রাস্তায় চিনেবাদামওয়ালাকে দেখেই উৎসাহে দু-হাত তুলে ডাকেন ও দশ পয়সার বাদাম কিনে পকেটে পুরে হাঁটতে থাকেন ও মুড়মুড় খোসা ভেঙে একটি দুটি দানা চিবোতে থাকেন।

তুচ্ছ জিনিস। কোনো মানুষের এই জিনিসগুলি কেউ খুঁটিয়ে দেখে না। দেখা উচিত নয়। আমি দেখি না।

যেমন সেদিন। বৌবাজারের মতন জনাকীর্ণ রাস্তা। কি যেন একটা কথা চিন্তা করতে করতে চোখ বুজে তিনি হাঁটছিলেন। তদ্গতচিত্ত হয়ে কোনো কিছু ভাবতে গেলে অনেক সময় আমরা এমন চোখ বুজি। কিন্তু কত বিপজ্জনক! রাস্তায় বেরিয়ে অন্ধের মতন হাঁটা। পথচারী গিসগিস করে। চোখ খুলে হাঁটতে গেলেও গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগে। ভিখিরি বসে থাকে রাস্তায় ওপর। হকাররা বসে থাকে। ফলের খোলা ইতস্তত ছড়িয়ে। কখন কিসে পা লেগে উল্টে পড়ে যাব। এবং ফুটপাথ ঘেঁষে যেখানে অবিশ্রাম গাড়ির স্রোত।

না, যেটা অদ্ভুত ভদ্রলোকের। দু-তিন সেকেণ্ড পরেই তাঁর চোখের পাতা খুলে গেল। দেখা গেল একটা গলির মুখে ভিড় দেখে তিনি দাঁড়িয়ে পড়েছেন। বাঁদরের খেলা হচ্ছে। তন্ময় হয়ে খেলা দেখতে থাকেন। তবে কেন একটু আগে চোখ বুজে হাঁটা!

তা বলে এসব জিনিস মোটেই আমি আমার গল্পে আনতে চাই না। আদৌ এই ভদ্রলোককে নিয়ে গল্প লেখার ন্যূনতম ইচ্ছেও আমার নেই।

হুঁ, পোস্টাপিসের চাকরি। কোন্ পোস্টাপিসে তাঁকে দেখেছি বলতে পারব না। আমহার্স্ট স্ট্রীট? বৌবাজার? কাঁকুড়গাছি? মানিকতলা? জোড়া-সাঁকোর আপিস হতে ক্ষতি কি! বদলি চাকরি যখন। যে-কোনো একটা ডাক-ঘরে তাঁকে দেখে থাকব।

এখন তিনি পোস্টমাস্টার কি সাব-পোস্টমাস্টার। না কি একজন সাধারণ কর্মচারী তা আমি বলতে পারব না। আমি যেন তাঁকে একদিন মাস্টারবাবুর চেয়ারে বসে থাকতে দেখেছিলাম। আর একদিন তিনি খাম 'পোস্টকার্ড বিক্রি করছিলেন।

এসব অবান্তর জিনিস। তাঁর কাজ তিনি বোঝেন। সাধারণ কর্মচারী যদি সময় মত উপস্থিত না থাকে, ওপরওয়ালা তার কাজ চালান। যেমন পোস্ট-মাস্টার হয়েও তিনি সেদিন তাঁর চেয়ার ছেড়ে কাউণ্টারে চলে এসে আমাকে খাম পোস্টকার্ড দিয়েছিলেন। আর সাধারণ কর্মচারী হয়েও যদি কোনো সময় তাকে মাস্টারবাবুর চেয়ারে বসে কাজ করতে দেখা যায় তো তিনি যে একজন দক্ষ কর্মচারী এ বিষয়ে সন্দেহ কি!

এখন যে-কথাটা আমি বলতে চাইছি না, আপত্তি আছে বলায়—তলিয়ে দেখলে খুবই একটা সাধারণ ঘটনা—ঘটনাই নয় যেটা। যেমন সেদিন। ছুটির দিন। আটপৌরে একটা পার্ক। ছিরিছাঁদ কিছু নেই। এদিক ওদিক আধডজন ভাঙা কাঠের বেঞ্চ বসান। মাঝখানে চোরকাঁটায় ভরতি মাঠের মতন খানিকটা জায়গা। ওই মাঠ ঘিরে একটা সরু বাঁধান পথ। মাঠের একধারে দুটো রাধাচূড়া গাছ, আর একপাশে গোটা তিনেক ঘাড় উঁচোনো দেবদারু বৃক্ষ। তাই বুঝি পার্ক নাম দেওয়া হয়েছে। তবু যা হোক ফাঁকা জায়গা। শহরে এই জিনিস দুর্লভ। উৎসাহী ভ্রমণবিলাসীরা সকাল সন্ধ্যায় এখানে আসেন। বাঁধান রাস্তাটুকু ধরে হাঁটেন অথবা কাঠের বেঞ্চে বসে গালগল্প করেন।

তখন বেলা দশটা। কেউ নেই। দুটো বেঞ্চে দুটো দাড়িওলা ছাগল বসে ঝিমোচ্ছে। রোদ নেই, মেঘলা আকাশ। যেন এই জন্যই সেদিন ছুটির দিন ভদ্রলোক এ সময়ে এখানে ঢুকেছেন। রোদ থাকলে নিশ্চয় আসতেন না। ফুরফুরে মিঠে বাদলা বাতাস বইছিল। হাঁটতে ভালই লাগে তখন। তিনি একদমে দুটো চক্কর দিলেন। নিয়মের হাঁটা। তারপর এমন একটা কাণ্ড করলেন। মুখটা সামনের দিকে রেখে পিছুন দিকে হাঁটতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে কোথায় চলে গেছেন—একেবারে পার্কের শেষ মাথায়। যেখানে চোরকাঁটার বেড়া ও একটা
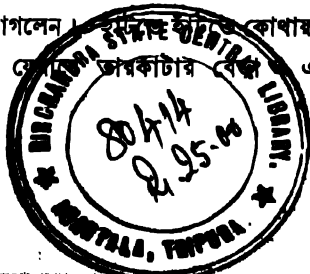
ফণিমনসার ঝোপ রয়েছে। ভাগ্যিস ঐ পর্যন্ত পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়লেন। না হলে তারকাঁটার বেড়ায় লেগে কি ফণিমনসার কাঁটার আঁচড়ে তাঁর গায়ের চামড়া ছড়ে যেত। পাঞ্জাবি পায়জামা ছিঁড়ত।

শুনে আপনারা মারমার করে উঠবেন। বলবেন এই তো! এই তো! কিন্তু আমি এ নিয়ে মোটে মাথা ঘামাই না। বলেছি পোস্টাপিসের চাকরি। খুবই নিয়ম ও শৃঙ্খলার জীবন। ডাকঘরের কাজ বোধ করি সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন কাজ। ডাক-কর্মচারীরা সরকারের সবচেয়ে নিরীহ কর্মচারী। এখানে ঘুষ খাওয়ার উপায় নেই, চুরি করার প্রশ্রয় নেই মিছে কথা বলার সুযোগ নেই। আমি আপনি কোথাও চিঠিপত্র লিখব কি টাকাপয়সা পাঠাব—তাঁরা যত্ন করে যথাস্থানে সেসব পাঠিয়ে দেন। আমাদের নামে চিঠি বা টাকা এলে ডাক-কর্মচারীরা সমান যত্ন করে আমাদের ঠিকানায় পৌঁছে দেন। ব্যস্, এর মধ্যে কোনো প্যাঁচ নেই, চালাকি নেই। রীতিমত রসিদ দিয়ে তাঁরা আমাদের টাকাকড়ি ও মূল্যবান সামগ্রী অন্যত্র পাঠাবার দায়িত্ব নেন। তাই বলা হয় যাবতীয় জোচ্চুরি জালিয়াতি ও কালোবাজারির দুর্গন্ধ থেকে পৃথিবীর ডাকঘরগুলি মুক্ত।

তাই বলছিলাম, এত নিয়ম শৃঙ্খলা ও সংযমের জীবনে হঠাৎ একদিন একটা পার্কে ঢুকে ভদ্রলোক যদি একটু অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা করেন—কতটুকু অনিয়ম, কী বা উচ্ছৃঙ্খলতা, কিছুক্ষণ সামনের দিকে হাঁটার পর একটু উল্টোদিকে হেঁটে চুপিচুপি নিজের মনে আনন্দ করা—এটা কি খুব দোষের হল। আমি মনে করি না। আর তাই বলে এই নিয়ে ঘটা করে একটা গল্প ফাঁদতে হবে—আমি রাজী নই। এতে মানুষটাকে ঠাট্টা করা হয়, অপমান করা হয়। ঠাট্টা অপমানের পাত্র তিনি নন।

যেমন ধরুন আর একদিন। আষাঢ়ের বিকেল। রিমঝিম বৃষ্টির পর রংদুলালী ফুলের মতন বাহারের হলুদ রোদ উঠেছে। শনিবার। সকাল সকাল ছুটি হতে অফিস থেকে বেরিয়ে হঠাৎ ট্রামে চেপে তিনি বৈঠকখানা বাজারের দিকে চললেন। বাজার সওদা নিজের হাতে বড় একটা করেন না। বাড়ির লোকেরা সেসব সারেন। তা হলেও মাসের প্রথম দিক, সদ্য মাইনে পেয়েছেন—একটু কেনাকাটা করতে হাত নিসপিস করবেই। বাজারে ঢুকে তিনি সর্বাগ্রে মাছের কাছে যান। বেশ ভাল আড় মাছ আমদানি হয়েছে। বরফের হলেও তাজা চকচকে চেহারা। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তিনি দামদর করছিলেন। কি ভেবে থমকে যান। ঘাড় তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ান। তারপর মাছের দোকান ছেড়ে

চলে আসেন। রাত্রে মাছ খাওয়া তাঁর স্ত্রীর একেবারে অপছন্দ। এত বড় জিনিসটা কি করে ভুলতে যাচ্ছিলেন। কপালে দুফোঁটা ঘাম উঁকি দিল। তক্ষুনি তিনি ডিমের দোকানের সামনে চলে আসেন। যেন এক সঙ্গে কয়েক ডজন ডিম কিনে ফেলেন। কিনলে অসুবিধে ছিল না। ঘরে ফ্রিজ আছে। রেখে দেওয়া যেত। একদিনে এত ডিম খেত কে। কিন্তু কিনবেন যে, ডিম খেলে তাঁর মেয়ের—আরতির এলার্জি হয়। যে জন্য বাড়িতে ডিম বড় একটা রান্নাই হয় না। মাঝে মধ্যে ছুটির দিন চায়ের সঙ্গে তিনি নিজে এক আধটা অমলেট খান। আলাদা করে স্ত্রী স্টোভে ভেজে দেন।

মাছ কেনা হল না, ডিম কেনা গেল না। কতকটা বিমূঢ় হয়ে দ্রুত পায়ে ভদ্রলোক বাজার থেকে বেরিয়ে আসেন। তখনই ট্রাম বাসে ওঠেন না। ট্রাম বাস পিছনে রেখে পুবদিকে হেঁটে সোজা শিয়ালদা স্টেশনে এসে ঢোকেন। ঢুকে প্ল্যাটফরমের দরজার মুখে ওজন লওয়ার যন্ত্রটার কাছে এসে দাঁড়ান। জায়গাটা তখন বেশ ফাঁকা। এবং যেন কারো ওপর চটে গিয়ে একটা চাপা বিরক্তি অস্থিরতা ও মৃদু ফোঁসফোঁসানি নিয়ে যন্ত্রটার ওপর তিনি উঠে দাঁড়ান। পকেট থেকে একটা দশ নয়া বের করে ছিদ্রের মধ্যে ফেলে দেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর 'ওজন' বেরিয়ে আসে। কিলোগ্রামের মাপ। লোলুপ চোখে হলদে টিকিটটা হাতের তেলোয় নিয়ে নাড়া-চাড়া করেন। তারপর সেটা পকেটে ঢোকান। তারপর আবার যন্ত্রের ওপর দাঁড়িয়ে দশ নয়ার মুদ্রা ছিদ্রের মধ্যে ছুঁড়ে দেন। চাকা ঘুরে ওজনের চাপ নিয়ে হলদে টিকিট বেরিয়ে আসে। ভারি আমোদ পান। মেশিনটা ভাল কাজ করছে। তৎক্ষণাৎ আর একটা মুদ্রা গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। ভাগ্যিস পকেটে বেশ কয়েকটা দশ নয়া জমে আছে। অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রামে টাকা ভাঙিয়ে যখন টিকিট কাটেন, তাঁর বেশ মনে আছে, কণ্ডাক্টর যেন রগড় করে আটটা দশ নয়া তাঁর হাতে গুঁজে দিয়েছিল। তখন তিনি রুষ্ট হয়েছিলেন। এখন খুশি। তিন নম্বর টিকিট হাতে নিয়ে হৃষ্ট মনে চার নম্বর মুদ্রাটি এবার তিনি গর্তে ফেললেন। যেন একটা ঝোঁক চেপে গেল। যেন একটা খেলা—

উঁহু দেহের ওজন নিয়ে তিনি মোটে মাথা ঘামান না। স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা কম। ঘাড়ে গর্দানে বুকে কোমরে আজও তিনি শক্ত সমর্থ পরিপুষ্ট পুরুষ। মাথায় খানিকটা টাক পড়েছে। প্রস্রাবে সামান্য চিনি। খুবই নগণ্য সেটা। আটান্ন বছর বয়সে শতকরা সত্তরজনের এমন হয়। কিন্তু তবু তিনি মেশিনটা ছাড়ছিলেন না। ক্রমাগত ওজন নিচ্ছেন। সাতটা হলদে টিকিট পকেটে জমেছে।

এবার অষ্টম মুদ্রাটি ছিদ্রের ভিতর ফেলতে গিয়ে তিনি নিরস্ত হন। হঠাৎ তাঁর খেয়াল হয় এক জোড়া তরুণ-তরুণী। যেন ওজন নিতে এসে চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। একদৃষ্টে তাঁকে দেখছে। লজ্জা পান ভদ্রলোক। তৎক্ষণাৎ যন্ত্রটা থেকে নেমে পড়েন।

উঁহু, আমাদের তাড়া নেই। ছেলেটি সরল গলায় বলল, আপনি নামছেন কেন।

আমরা অপেক্ষা করছি। আপনি ওজন নিন। মেয়েটি মিষ্টি করে বলল।

ছেলেটির গায়ে নীল শার্ট বাদামী প্যাণ্ট। মেয়েটির পরনে হালকা সবুজ শাড়ি। সুশ্রী তন্বী। তবু দ্বিতীয়বার সেদিকে চোখ না ফিরিয়ে মাথা গুঁজে তাড়াতাড়ি তিনি সেখান থেকে সরে এলেন।

এই যে একটা ঘটনা এটাকে আপনারা কী বলবেন! বাজার করতে এসে ছিলেন। তা না করে গুনে গুনে সাতবার নিজের ওজন নিলেন। এবং যখন ভদ্রলোক চলে যান পিছন থেকে ছেলেটি ও মেয়েটি টিপে টিপে হাসছিল।

জানি এবারও আপনারা হৈ-চৈ করে উঠবেন, অস্বাভাবিকতা অপ্রকৃতিস্থতার গন্ধ খুঁজে বার করে আমাকে দিয়ে একটা রসাল গল্প লেখাবার জন্য বায়না ধরবেন।

যদি তাই বলেন তবে ওই দুটিকে দেখুন। যন্ত্রটা ফাঁকা পেয়ে যুবক-যুবতী উঠে পড়ে লেগেছে শরীরের ওজন নিতে। এক একবার এক একজন ওটার ওপর লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। ফুটো দিয়ে পয়সা ছুঁড়ে দেয়, ঝপ্ করে হলদে টিকিট বেরিয়ে আসে। দেখে তারা হি-হি হাসে। এর ওজন দেখে ও হাসে। ওর ওজন দেখে এ হাসে।

মেয়েটি তেরোবার ফুটো দিয়ে পয়সা গলিয়ে দিল। ছেলেটি চৌদ্দবার। মেয়েটির বয়স সতেরো থেকে উনিশ, ছেলেটির বাইশ চব্বিশ। অর্থাৎ সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে যে কারো 'ওয়েট্' বাড়ে না—এটা বুঝবার বয়স তাদের হয়েছিল।

তবে কেন এই ছেলেমানুষি আমোদ। বার বার যন্ত্রটার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে খেলা।

তবে আর ভদ্রলোককে দোষ দেওয়া কেন। সঙ্গী সাথী নেই বলে কি একা একা—

আমি আপনাদের মতে সায় দিতে পারি না।

এখন দেখুন। তিনি তাঁর ঘরে। রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। এই মাত্র রেডিওতে কে যেন সেতারে আলাপ করছিল। মাথায় ওপর বনবন পাখা ঘুরছে। খাবার টেবিলে বসে আছেন তিনি। টেবিলের ওপাশে স্ত্রী মাধুরী। ডাইনে

মেয়ে আরতি। যেন সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে ভদ্রলোক স্নান করেছেন। এখন আর পায়জামা পাঞ্জাবি না। জংলা লুঙ্গি ও গেঞ্জি গায়ে। লাল ডোরা কাটা গেঞ্জিটার জন্য স্পোর্টসম্যানের মতন লাগছে তাঁকে। গলায় ঘাড়ে পাউডারের ছোপ। তাড়াহুড়ো করে পাউডারটা ঢালা হয়েছিল বোঝা যায়। চকের গুঁড়োর মতন দেখাচ্ছে। তা দেখাক। শান্ত অমায়িক প্রসন্ন অথচ বেশ একটি রাসভারি মুখ ভদ্রলোকের।

তিনি যে বিকেলে বাজারে মাছ বা ডিম কিনতে গিয়েছিলেন ঘুণাক্ষরেও কেউ জানে না। তিনি না বললে কি করে তারা জানবে। কিন্তু মাছ বা ডিমের জন্য রাত্রের আহার আটকায়নি। বাড়ি ফেরার পথে মাধুরী একটু মুরগির মাংস কিনে এনেছেন। আরতি এনেছে লেংড়া আম। মাধুরী একটা গানের ইস্কুলে গান শেখান। আরতি একটা সেলাইয়ের ইস্কুলে সেলাই শেখায়। দুজনেই কাল মাইনে পেয়েছে।

রুটি মাংস আম। পরিতৃপ্তির খাওয়া। খেতে খেতে তিনি পর পর দুটো হাঁচি দিলেন।

ঠাণ্ডা লেগেছে। মাধুরী বললেন।

কাল একটু ভিজেছিলাম। তিনি উত্তর করলেন।

একটা টেবলেট খেয়ে নিও, বাবা। আরতি বলল।

ও কিছু না। মৃদু হেসে তিনি মেয়ের দিকে ঘাড় ফেরান।

তার অর্থ টেবলেট খাওয়ার দরকার হবে না।

এসব নিত্যনৈমিত্তিক। ঘরোয়া খুঁটিনাটি। হাঁচি কাশি টেবলেট, রেডিওতে সেতার বা ঠুংরী গান, খাবার টেবিলে আম এবং মাঝে মধ্যে মুরগি বা পাঁঠার মাংস।

কথা হচ্ছে যখন তিনি একা থাকেন। যখন নিজের মতন থাকেন। যেমন এক রবিবার। সেদিন সারাদিন তাঁর ছুটি। আর সারাদিন বৃষ্টি। ওফ্, কী ভেজাটাই ভদ্রলোক ভিজলেন। ইচ্ছে করে। জেদ করে আমি বলব না, ভিজতে তাঁর ভাল লাগছিল। কদিন আগে অফিসে যাবার সময় একটু ভিজতে হয়েছিল বলে পরদিন খাবার টেবিলে বসে দুবার হেঁচেছিলেন আপনাদের মনে আছে। কিন্তু ঐ রবিবারের ভেজার কোনো তুলনাই হয় না। গিন্নী দেখলে আঁৎকে উঠতেন, মেয়ে দেখলে ভয় পেত। ডবল নিউমোনিয়া হবে বাবার। চেঁচিয়ে উঠত আরতি কিন্তু তাদের আতঙ্ক আশঙ্কার অনেক দূরে তিনি তখন। সত্যি, কি

করে যে ঘুরতে ঘুরতে এমন একটা জায়গায় এসে পড়লেন। অথচ তাঁর টালা যাবার কথা। মামাতো ভাইয়ের ছেলের মুখে ভাতের নেমন্তন্ন। বাড়িতে তাঁকেই শুধু বলা হয়েছিল। মাধুরী তাড়া দিচ্ছিলেন, আরতি বার বার তাড়া দিচ্ছিল। এইবেলা তুমি বেরিয়ে পড়। আকাশের অবস্থা ভাল না। দুজনের তাড়া খেয়ে বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়েছিলেন। তারপর ?

নাকের সামনে দিয়ে টালার ট্রাম চলে গেল বাস চলে গেল। তিনি তাকালেন না পর্যন্ত। যেমন সেদিন মাছ ডিম কোনোটাই কিনতে না পেরে বৈঠকখানা বাজারকে কাঁচকলা দেখিয়ে শেষটায় শিয়ালদা স্টেশনে ছুটে গিয়ে ওজন নেওয়ার যন্ত্রটার ওপর দাঁড়িয়ে কতক্ষণ কেবল নিজের ওজন নিলেন। তেমনি আজও। টালার ট্রাম বাসকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দক্ষিণগামী একটা গাড়িতে চেপে বসলেন। যেন অনেকটা মনের গোঁসায়। নেমন্তন্নে তাঁর চিরকাল অরুচি। বেছে বেছে লোকে কেন যে তাঁকে নেমন্তন্ন করে। ব্যস্, তখন থেকে বৃষ্টি।

এটাই জিজ্ঞাস্য, তিনি কি জানতেন যে বৃষ্টির মতন বৃষ্টি দেখতে হলে, প্রাণভরে বৃষ্টিতে ভিজতে হলে তোমাকে পার্ক সার্কাস ময়দানের কাছে ছুটে যেতে হবে। মিছে কি, আয়নার মতন ঝকমকে সবুজ একটা মাঠের ওপর কালো মেঘের দাবড়ানি ফুঁসানি ছুটোছুটি। কলকাতার আকাশে এত মেঘ এক জায়গায় ভিড় করে তিনি আগে জানতেন না। আর ময়দান ঘেঁষে সেই ভয়ংকর নির্জন চওড়া পথের দুধারে কৃষ্ণচূড়া ও দেবদারু—শাল ও অশোকের সারি। বৃষ্টির ঝমঝম শুরু হয়েছে সেখানেও। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মাঠ না থাকলে আকাশে মেঘের খেলা জমে না, গাছ না থাকলে বৃষ্টির বাজনা খোলে না। নিশ্চয় গাড়ির জানালা দিয়ে ঐ অপরূপ মাঠ ও বনের বৃষ্টি দেখে তাঁর বুকে মোচড় দিয়ে উঠেছিল। ভিজতে হলে এমন জায়গায় ভিজতে হবে। তখনি লাফিয়ে বাস থেকে নেমে পড়েন। তারপর ভিজতে শুরু করেন। কতক্ষণ মাঠে দাঁড়িয়ে মাঠের ছিপছিপ বৃষ্টিতে ভিজলেন। তারপর গাছের কাছে ছুটলেন। গাছতলার ঝুপুর ঝুপুর বৃষ্টির অন্য স্বাদ। তা-ও কি—কৃষ্ণচূড়ার নিচে দাঁড়িয়ে ভেজার এক স্বাদ, দেবদারু গাছের নিচের বৃষ্টির অন্য আস্বাদ। তাঁর মাথা গরম হয়ে গেল। কোন্ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কত বেশি ভিজবেন। একটা গাছ ছেড়ে আর একটা গাছের দিকে দৌড়ন। এর মধ্যেই জুতো সপসপ করছে, জামাকাপড় ভিজে ঢোল। টাক পড়া মাথায় জল দাঁড়ায় না। কচুপাতার মতন গড়িয়ে গলগল করে জামার ভিতর ঢুকছিল। ঘাড় বেঁকিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে তিনি দেখ-

ছিলেন বৃষ্টির বাড়ি খেয়ে গাছের পাতা থরথর কাঁপছে ডাল বেয়ে কাণ্ড বেয়ে জলের ধারা হুড়হুড় করে নিচে নামছে। ব্যাঙ ডাকছিল, ডাহুক। কান পেতে শুনলেন। ডাকঘরের চাকরি হলে হবে কি। বোঝা গেল বিদ্যাপতি পড়া আছে তাঁর। না হলে মেঘ দেখে এত উল্লাস অস্থিরতা! ভিজতে ভিজতে একটা ঝাঁকড়া গাছের নিচে এসে থমকে দাঁড়ান। হতভম্ব হন। পাতায় পাতায় ঠাসবুনন হয়ে মস্ত একটা ছাতা তৈরি হয়ে আছে মাথার ওপর। বড় বড় বাদামের পাতা বৃষ্টি আটকে রেখেছে। জল পড়ছিল, না পড়ার মতন, টুপটাপ, তা-ও কতক্ষণ থেমে থেমে, যেন পাখির চোখ চুইয়ে এক ফোঁটা দু' ফোঁটা। সেটা কিছু না। অবাক হন ভদ্রলোক, গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে। পেতলের বকলস আঁটা স্লিপার জল কাদায় মাখামাখি। অতসী ফুল রঙের ট্রাউজার, গায়ের অপরাজিতা রঙের টুকটুকে নীল কুর্তা, কোনোটাই ভিজতে বাকি নেই, টসটস জল ঝরছে। ঝুপসি লতার মতন মাথার চুল বেয়ে টাপুস টুপুস জল পড়ছে। তেমনি চোখ দুটো। বৃষ্টির জল আটকে গিয়ে লম্বা পালক ঘেরা চোখের পাতা অবিকল দুটো ঝালরির মতন দেখাচ্ছে। আর কোথাও দাঁড়িয়ে ও ভিজছিল যেন। এখন ছাতার মতন গাছটার নিচে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ভাল! মনে মনে বললেন তিনি।

তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে ও অল্প হাসল। মাথাটা সামান্য নুইয়ে তিনিও হাসলেন। ছোট্ট মানুষ, কিন্তু অত সুন্দর মুখ দেখে 'বাও' না করে যেন পারলেন না।

আপনি পোস্টমাস্টার! বলল ও।

হুঁ। তিনি ঘাড় নাড়লেন।

নর্থ ক্যালকাটার একটা পোস্টাপিসে দেখেছি আপনাকে।

হবে। বদলির চাকরি আমার। তিনি উত্তর করলেন।

এবার ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখল যুবতী। তারপর, যেন ভারি সন্তর্পণে, জামার তলা থেকে, নিশ্চয় বৃষ্টির ভয়ে কোমরে গোঁজা ছিল, একটা খাম বের করল।

দেখুন তো এটার কত ডাকটিকিট লাগবে!

সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে তিনি খামটা ধরেন।

রেজিস্ট্রি হবে বুঝি?

হুঁ, রেজিস্টার্ড লেটার।

দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। হাতের তেলোয় খামটা রেখে তিনি ওজন

পরীক্ষা করেন। বেশ ভারি, আস্তে বলেন, খুব বড় চিঠি লেখা হয়েছে দেখছি।

আরক্ত হয়ে উঠল ও। বলল, আজ রোববার, আজ হবে না। কালই চিঠিটা পোস্ট করব। আপনি দেখুন কত খরচ পড়বে, আপনি বুঝবেন।

দেখছি দেখছি, আমি এখনি বলে দিচ্ছি, রোজ তো এত চিঠি হাতাই। ঝুঁকে দাঁড়ান তিনি, ওপর থেকে জলের ফোঁটা না পড়ে, বুকের আড়াল করে খামের ওজন পরীক্ষা করেন। বলেন, বড় চিঠি ভাল। বড় চিঠি না পেলে কারো মন ভরে!

ও ঠোঁট টিপে হাসল।

কালকের ডাকে এটা না পাঠালে সে ভীষণ রাগ করবে।

তা তো করবেই, আমি এখনি ওজনটা বলে দিতে পারব। ডান হাত থেকে বাঁহাতের তেলোয় খামটা চালান করেন তিনি। তারপর যেন চোখ বুজে চিঠির ওজন আন্দাজ করেন।

কদিন পর এই চিঠি পেলে সে ভীষণ অবাক হবে। ও বলল।

হওয়ার কথা। কদিন অভিমান করে চিঠি লেখা হয়নি বুঝি!

হুঁ।

দেখছি, দেখছি আমি এখনি বলে দিচ্ছি কত ডাকখরচা পড়বে এর। নাকের কাছে তুলে তিনি খামের গন্ধ শোঁকেন। গোলাপ না গন্ধরাজ!

যুবতী ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে।

গন্ধ শোঁকা শেষ করে তিনি খামটা ঠোঁটে ঠেকান।

দেখে মেয়েটি আরও বেশি টিপে টিপে হাসে। মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী। চারদিকে জলের ছপছপ শব্দ।

জানি আপনারা আবার হৈ-চৈ করে উঠবেন। বলবেন, এই তো এই তো! এই জন্যই ভদ্রলোকের এমন সৃষ্টিছাড়া চলাফেরা, এমন উদ্ভট সব পাগলামি। মনে মনে এই জিনিস তিনি খুঁজছিলেন। সুতরাং এক্ষুনি তাঁকে নিয়ে একটা—

আমার ইচ্ছে করে না। ময়দানের কাছে বর্ষার গাছতলার এমন সুন্দর একটা বিকেল, বিশেষ করে তাঁর ছুটির দিন, মানুষটাকে চুপি চুপি উপভোগ করতে দিতে ক্ষতি কি। মনে মনে আমরাও কি এক বিকেলে এমন চমৎকার কোনো গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অফুরন্ত ভিজতে চাই না।

এক ঝাঁক দেবশিশু

বাবুদের গাড়ি প্রায়ই রাস্তার মাঝখানে আটকে যায়। যন্ত্র তো। যন্ত্র কিছু মানুষ না যে খুশি মতন চলবে। তা বলে মানুষ কি আটকায় না। খুব আটকায়। মানুষের ভেতরকার যন্ত্রপাতি বিগড়ে গেলে ডাক্তার ডাকতে হয়। অ্যামবুলেনস ডাকতে হয়—হাসপাতলে ছুটোছুটি লেগে যায়। মানুষের জীবন ভারি মূলব্যান।

তাহলেও বাবুদের এক একটা গাড়ির মূল্য কি কম। কলকব্জা বিগড়ে গিয়ে গাড়ি যখন রাস্তায় অচল হয়ে পড়ে বাবুরা তখন মানুষজনের খোঁজ করেন। মানুষ-জন এসে দশটা হাত লাগিয়ে গাড়িটাকে ঠেলতে থাকে। ঠেলতে ঠেলতে গ্যারেজে নিয়ে তোলে। যার নাম গাড়ির হাসপাতাল।

যেমন আজ। খরার দুপুর। রাস্তার মাঝখানে গাড়ি আটকে গিয়ে বাবু ক্রমাগত ঘামছেন। কোথায় মানুষ! কাক-পক্ষিটিও চোখে পড়ছে না। অন্যদিন রাস্তার ধারে লেটারবক্স-এর ছায়ায় নেড়ি কুত্তাটা পড়ে পড়ে ঘুমায়। আজ জায়গাটা শূন্য।

বাবু চিন্তিত হলেন। চোখে মুখে উদ্বেগ। লাল লেটারবক্স-এর ছায়ায় লাল কুকুরটা যখন নেই তখন ধরে নিতে হবে ওরাও ধারে কাছে নেই। টের পেয়ে বাবু রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছেন।

কুকুরটার নাম লালু। ওরাই এই নাম দিয়েছে। কুকুরটা ওদের সঙ্গী। লালু ওদের ছেড়ে এক মিনিট থাকতে পারে না। লালুকে ছেড়ে ওরাও থাকতে পারে না। তাহলে?

বাবু চোখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখেন। এই সময়, এই গরমের দুপুরে ওরা, বাবু যাদের মনে মনে খুঁজছেন—ঘেনু নানু হুদা ভোঁদা বেন্দা ছোটকা এবং তাদের আরো কে কে সব সঙ্গী—সোরগোল করে হাইড্র্যান্টের ঘোলা জলে স্নান করে। হি-হি হাসে। এই সময় তাদের দাঁত দেখা যায়! ছাতাপড়া হলদে দাঁত, পোকায় খাওয়া দাঁত, ভাঙা দাঁত। দাঁত আছে সকলেরই। বত্রিশটা করে এক একজনের দাঁত। কামড়ে ধরলে বছর কদিনে যায় টের পাইয়ে দেব। কিন্তু কাউকে কামড়ায় না ওরা। স্নান করার সময় জল ছিটায়। অন্য সময় ধুলো। আর বড় জোর থুতু ছিটোয় এর ওর গায়ে। অন্য কাউকে নয়। নিজেদের মধ্যেই এসব খেলা।

উদোম গা, ঝাঁটার কাঠির মতন খোঁচা খোঁচা বাদামী চুল এবং রোদ পোড়া রুখু শরীর ভিজিয়ে নেংটো হয়ে ওরা যখন স্নান করে দেখবার মতন।

আজ জায়গাটা একদম ফাঁকা। বাবু রুমাল দিয়ে ঘাড়ের ঘাম মোছেন। এক ঝাঁক কাক নেচে নেচে হাইড্র্যাণ্টের কাছে চলে এসেছে। ওরা নেই বলে কাকেরাই এখন প্রাণভরে স্নান। করছে তাইতো, গেল কোথায় সব। বাবু গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। রাস্তার ধারে রাধাচূড়া গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সন্ধানী চোখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখেন।

তাইতো, বাবু আবার চিন্তা করেন। এই সময় কুলি মজুর কোথায় মেলে যে তার গাড়িটাকে ঠেলে নিয়ে গ্যারেজে পৌঁছে দেবে। কুলি-মজুররা এখন কল-কারখানায় রেলস্টেশনে জাহাজঘাটায় বা এই বাজারে সেই বাজারে বেপারীদের আড়তে গুদোমে ছড়িয়ে আছে। মাল তুলছে মাল খালাস করছে। গলির ভিতর একরত্তি একটা অ্যাম্বাসেডার ঠেলতে তারা আসবে কেন। সুতরাং ওরা। নান্টু ঘেন্টু হুদা ভোঁদা এবং তাদের বন্ধুরা। দুপুর বিকেল রাত, যখনই গাড়ি আটকে যায়, শিস দিয়ে ডাকলে ওরা ঠিক ছুটে আসে। আর তক্ষণি দশটা পনেরোটা বিশটা হাত লাগিয়ে গাড়িটা ঠেলতে আরম্ভ করে। আট দশ বারো তেরো এক একটির বয়স। তার বেশি নয়। আর একটু বড় হলেই তারা জোয়ান মরদ হয়ে বাজারে স্টেশনে অথবা জাহাজঘাটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে। তাদের আর পাওয়া যাবে না।

তা হোক পুঁচকে পুঁচকে শরীর, বকের ঠ্যাং-এর মতন লিকলিকে হাত-পা মুরগীর ঠ্যাং-এর মতন সরু সরু শিরদাঁড়া। ওরা দিব্যি গাড়িটা ঠেলে নিতে পারে। তবে দুজন কুলি হলেই যেখানে কাজ চলে, ওদের বেলায় তা হবে কেন। ওদের এক ঝাঁকের দরকার। এক ঝাঁক দেবশিশু, বাবুরা তাই নাম দিয়েছে, কোথা থেকে ওরা এল, কে বা ওদের বাবা, কে বা মা কিছুই জানা যায় না, এক ঝাঁক দেবশিশু দশটা বিশটা পঁচিশটা হাত ঠেকিয়ে গড়গড় করে গাড়িটাকে যখন ঠেলতে থাকে বাবু স্টিয়ারিং-এ হাত ঠেকিয়ে আহ্লাদে চোখ বুজে থাকেন। আর ওরাও তখন গান করে শিস দেয়। ওদেরও আহ্লাদের সীমা থাকে না। বাবুদের গাড়ি রাস্তায় আটকে গেলে ওরা দারুণ খুশি হয়। তার কারণ আছে। এমন একটা দামী চকচকে গাড়ি ওরা ছুঁতে পেয়েছে। কেবল ছুঁতে পারা কেন, কিছুক্ষণের জন্য গাড়িটা ওদের মুঠোর মধ্যে এসে যায়। কেবল কি গ্যারেজ, ইচ্ছা করলে ওরা ঠেলে ঠেলে গাড়িটাকে মাঠের মধ্যে নামিয়ে দিতে পারে। জঙ্গলে ঢুকিয়ে দিতে পারে।

পুকুরের জলে নামিয়ে দিতে আটকায় কে। কিন্তু তা কি ওরা করে? কক্ষনো না। বাবু চোখ বুজে থাকেন। গাড়ি ঠিক জায়গায় পৌঁছে যায়। গ্যারেজে উঠে যায়।

রাতদিন গাড়ি অবিশ্যি ওরা কম দেখে না। ওদের কান ঘেঁষে মাথা ছুঁয়ে বোঁ বোঁ গাড়ি ছুটছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে ছুটছে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে—সব সময় গাড়ি। কারণ রাস্তাই ওদের ঘর বাড়ি। রাস্তায় রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া. হাগা-মোতা। এবং এই রাস্তাই ওদের খেলার জায়গা। তবে দুপুরটা একটু ফাঁকা থাকে। গাড়ি ঘোড়া কম চলে। তখন মাথার ওপর সূর্য জলতে থাকে। রাস্তায় পীচ গলতে থাকে। ওরা গ্রাহ্য করে না। গরম গলা পীচের ওপর পায়ের চটাস চটাস শব্দ করে মহানন্দে হা-ডু-ডু খেলে, কোনদিন বোঁ বোঁ কানামাছি। আর যেদিন ঝুপুস ঝুপুস বৃষ্টি নামে সেদিন তো কথাই নেই। রাস্তার ছপছপ জল ছিটিয়ে দেবশিশুরা হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে নাচে। হি-হি হাসে। লালুও তখন ওদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়। লাল জিভ ঝুলিয়ে দিয়ে লেজ নেড়ে নেড়ে দেবশিশুদের ঘিরে লালু বেদম ছুটতে থাকে। তখনকার মতন ওরাই রাস্তার রাজা।

কোথায় গেল সব। একটিরও দেখা নেই। বিগড়ান গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে বাবু মুখ চুন করে ভাবেন। হাইড্র্যান্টের জলে কাকেরা স্নান করছে, একটা ছেঁড়া-ঘুড়ি ইলেকট্রিক তারে আটকে গিয়ে চরকির মতন ঘুরছে। এসব দেখতে দেখতে বাবু চিন্তা করেন, এ রাজ্য ছেড়ে ওরা চলে গেছে বিশ্বাস করা যায় না। তবে মাঝে মাঝে এমন হয়। এখানকার খেলাধুলা ছেড়ে এদিক ওদিক সব ফড়িং ধরতে চলে যায়। অথবা যেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কোথাও তারা বাঁদর-নাচ কি ভালুকের খেলা দেখে। খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা ফিরে আসে। এসেই কোন বাবুকে তারা বিগড়ান গাড়ি নিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে দেখলে আর কথা নেই। কালবিলম্ব না করে গাড়িটাকে ছেঁকে ধরে সব। মনে হয় তখন একটা মস্ত বড় ভিমরুলের চাক বুঝি গাড়িটাকে ঘিরে ফেলল। তারপর অচল গাড়ি চলতে শুরু করল। মনে হবে এক ঝাঁক ভিমরুল গাড়িটাকে গড়গড় করে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তা বলে ভিমরুলের মতন হিংস্রুটে ওরা মোটেই নয়। দংশন করতে জানে না, বরং উল্টোটা। ময়লা ছাতা পড়া দাঁত বের করে ওরা কেবল হাসতে পারে। আর পারে রক্তশূন্য ফ্যাকাসে বড় বড় চোখ মেলে ফ্যালফ্যাল করে পৃথিবীটার দিকে তাকিয়ে থেকে কেবল খুশি হতে। ওরা সব কিছু দেখে খুশি। বাবুদের

গাড়ি আটকে গেছে দেখে যেমন আনন্দ পায় তেমনি ধুলো অ্যাশফল্টের চিকন কণা উড়িয়ে ওদের চোখ কানা করে দিয়ে সোঁ করে এক একটা গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে দেখেও ওরা কম আমোদ পায় না। আর বাবুদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের দেখে। বিশেষ করে ওদের বয়সের শিশুরা ফিটফাট সেজে-গুজে বই-এর ব্যাগ টিফিনের বাক্স জলের বোতল হাতে ঝুলিয়ে যখন স্কুলে যায়। রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে এরা দেখে। এদের মনে হয় কি আশ্চর্য একটা রঙের মিছিল দেখছে। কেমন রঙিন জামা-কাপড় এক একটির গায়ে। দুধ-ছানা খাওয়া নধর ফরসা শরীর। যেমন বাবুদের চকচকে ঝকঝকে গাড়িগুলি ছুঁতে পেরে এদের আহ্লাদের শেষ নেই, তেমনি এদের বয়সের ঐ সব দামী পোশাকপরা টুকটুকে শিশুদের ছুঁতে পেলেও এরা বর্তে যেত। কিন্তু তা তো হবার নয়। সঙ্গে চাকর দারোয়ানরা থাকে। কারো কারো অভিভাবক। এই সব ছেলেমেয়েদের ছুঁতে গেলে ধরতে গেলে এরা ভীষণ ধমক খায়। গালিগালাজ শোনে। তাছাড়া ভালো ভালো জামা কাপড় পরা ক্ষীর ননী খাওয়া শিশুরাও এদিকে, এদের দিকে মোটে তাকাতে চায় না। চোখে চোখ পড়লেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। নাক সিঁটকায়।

এই জন্য এরা, রাস্তার দেবশিশুরা কিন্তু কখনো মন খারাপ করে না। অভিমান করে না। রাগ করে না। এরা বোঝে ছেঁড়া ময়লা নেকড়ার জামা কাপড় গায়ে তাদের। তা-ও আবার সকলের নেই। উদোম দিগম্বর মূর্তি। নোংরা হাত পা নখ চুল। হাভাতে জিরজিরে শরীর। ভিমরুলের মত ময়লা রং। বাবুদের ছেলেমেয়েরা ওদের কাছে এদের ঘেঁষতে দেবে কেন! কাজেই দূর থেকেই এরা ঝক্‌ঝকে বাচ্চাদের দেখে খুশি হয়। যতক্ষণ চোখ যায় হাঁ করে চেয়ে থাকে। কখনো রিকশায়, কখনো গাড়ি চেপে এই সব আশ্চর্য শিশুরা স্কুলে যায়। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরে।

আরো আছে। বাবুদের গিন্নিরা, ঝকমকে চেহারার ছেলেমেয়েদের মায়েরা, জমকালো শাড়ি জুতো, গয়নাগাটি গায়ে—উঁহু অনেকে গয়না পছন্দ করেন না, ঘড়ি পরেন হাতে—ব্যাগ ঝুলিয়ে হাঁটেন। যখন তারা বাড়ি থেকে বেরোন বা বাইরে ঘুরেটুরে ঘরে ফেরেন তাদের দেখেও এরা বেজায় খুশি হয়। কত কিছু সঙ্গে থাকে গিন্নিদের। নতুন শাড়ির প্যাকেট জামার প্যাকেট সন্দেশের বাক্স আপেল আঙুরের ঠোঙা, বাচ্চাদের জন্য রকমারী খেলনা। দেবশিশুদের তখন ভারি লোভ হয় ঐ জিনিসগুলি একবার ছুঁয়ে দেখতে। কখনো কখনো এরা হাত বাড়িয়েও দেয়। এবং গিন্নিদের পিছু পিছু অনেকটা পথ ছুটে যায়। হুঁ,

যদি তারা হেঁটে যান। গাড়ি চড়ে গেলে গাড়ির পিছনে ছোটে, কিন্তু এক-সময় তাদের থমকে দাঁড়াতে হয়। হাত গুটিয়ে নিতে হয়। মহিলারা দাঁত খিঁচোন, চোখ রাঙান। সরে যা সরে যা! নোংরা সব। গিন্নিরা রীতিমত চেঁচামেচি করেন।

কাজেই এরা দাঁড়িয়ে পড়ে। মুখ কালো করে না। ভ্যবলার মতন কেবল হাসে। আর ড্যাবড্যাবে চোখে গিন্নিদের হাতের শাড়ি জুতোর বাক্স সন্দেশের বাক্স ফলের ঠোঙা পুতুল খেলনাগুলি দেখে। ফরসা মোটাসোটা চেহারার মায়েরা মুখ ঘুরিয়ে চলে যান। কিন্তু তবুও তাদের ভালো লাগে। যেন আর একটা মিছিল দেখতে পাওয়ার আনন্দ পায়।

রক্তশূন্য ফ্যাকাসে চোখগুলি কিছুক্ষণের জন্য চকচকে হয়ে ওঠে।

এবং কিছুটা পথ ওই সব দামিদামি গিন্নিদের পিছনে যে ছুটতে পেরেছে তাতেই তাদের তৃপ্তি।

একদিন, কেবল ঐ একদিনই, এক গিন্নির হাতের একটা দ্রব্য ছুঁতে পারার সুযোগ হয়েছিল এদের। না, সকলের না। দলের একজনের। ভোঁদার।

একটা রিকশা চেপে ঘরে ফিরছিলেন মহিলা। সঙ্গে এত সব ঠোঙা বাক্স প্যাকেট। কিছু কোলের ওপর চাপান ছিল। কিছু তার হাতে ধরা ছিল। হঠাৎ রিকশাটা একটা ঝাঁকুনি খাওয়াতে তার কোলের একটা বাক্স ছিটকে রাস্তায় পড়ে যায়। মহিলা হয়তো খেয়ালই করতেন না। যেমন চলছিল, ঠুং ঠুং ঘণ্টা বাজিয়ে রিকশাটা চলে যেত। কিন্তু ভোঁদা জিনিসটা দেখতে পেল। তক্ষুনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে বাক্সটা কুড়িয়ে নিয়ে রিকশার পিছনে ছুটতে লাগল আর চেঁচাতে লাগল: হেই রিকশা, হেই রিকশাওয়ালা! রিকশা দাঁড়ায়। মুখখানা আহ্লাদে আটখানা করে ভোঁদা রংচং-এ কাগজের বাক্সটা মহিলার হাতে তুলে দেয়। বাক্স ফিরে পেয়ে তিনি মহাখুশি। তা বলে রাস্তার কোন ছেলেটা এত বড় একটা উপকার করল দেখতে একবার কি ভোঁদার মুখের দিকে তাকালেন? মোটেই না। আর পাঁচটা বাক্স ও ঠোঙার সঙ্গে হারান বাক্সটা কোলের ওপর যত্ন করে বসিয়ে দিতে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তখন। এবং দেখতে দেখতে তাকে নিয়ে রিকশাটা দূরে চলে গেল।

কিন্তু ভোঁদার দিকে তাকাবার অনেক লোক ছিল। তার সঙ্গীরা। সবাই ছুটে এসে ভোঁদাকে পাঁজাকোলা করে শূন্যে তুলে ধরল। প্রাণভরে দেখল তাকে। সেই মুহূর্তে ভোঁদা একটি দর্শনীয় ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাবুদের এক গিন্নির একটা মূল্যবান বাক্স ছুঁতে পেরেছে। যা এত কাল চেষ্টা করে তারা কেউ

পারেনি। ভোঁদা ভাগ্যবান। যে হাত দিয়ে ভোঁদা বাক্সটা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে মহিলার হাতে তুলে দিয়েছিল সেই হাতটা নিয়ে সঙ্গীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সবাই ভোঁদার হাতটা নাকের কাছে টেনে নিয়ে শুঁকতে চাইছিল। তাইতো, ভোঁদার হাতে একটা অন্য রকম গন্ধ লেগে আছে। এই গন্ধের সঙ্গে তারা কোনো দিন পরিচিত ছিল না। ভোঁদার হাত শুঁকে শুঁকে তাদের আশ মিটছিল না। কি ছিলরে ভোঁদা ওই বাক্সে—কিসের বাক্স ওটা? আমি কি করে জানব। আমিও ভাবছি। বাক্সটা খুলে দেখিনি। এক গাল হেসে ভোঁদা নাকের কাছে নিয়ে নিজের হাত শুঁকতে আরম্ভ করল। তারপর সারাটা বিকেল রাস্তার ধারে কদম গাছটার নিচে বসে সকলে মিলে জল্পনা করল মহিলার ঐ বাক্সে সন্দেশ ছিল। নাকি আমসত্ত্ব নাকি সাবানটাবান। শাড়ি জুতোর বাক্স হলে আকারে সেটা আরো বড় হত। ভারি হত ইত্যাদি।

আজ, এখন, তাহলে সব গেল কোথায়! বাবু মুখ কালো করে থাকেন। গিন্নিকে কথা দিয়ে এসেছিলেন গাড়ি নিয়ে সকাল সকাল বাড়ি ফিরবেন, তারপর দুজনে মিলে সিনেমায় যাবেন। এখন এভাবে যদি রাস্তায় গাড়িটা পড়ে থাকে, ভয়ানক চিন্তিত হয়ে বাবু নতুন সিগারেট ধরান। না। বাবু জানেন না, এই ভর দুপুরে একটা ফাজিল পুবাল হাওয়া ছেড়েছিল।

কার্তিক মাস। এখন পুবের বাতাস বইবার কথা নয়। তবে কিনা, কথায় বলে, হাওয়ার মর্জি। কখন কোন দিকে বইবে অনেক সময় ঠিক থাকে না।

এখন হয়েছে কি, সেই পুবের বাতাসে একটা ভারি চমৎকার গন্ধ ভাসিয়ে আনছিল। প্রথমটা তারা—হুদা ভোঁদারা বুঝতেই পারল না। কিসের এই মিষ্টি মাতাল করা গন্ধ। তারপর তারা বুঝেছে। লুচি ভাজার সুবাস। যেন খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে লুচি ভাজা হচ্ছে কোথাও। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে হল, তারা অনেককাল লুচি খায়নি। বা কোনদিন খেয়েছে মনে করতে পারল না। কেবল শুনেছে। গরম লুচি। লুচি হালুয়া। লুচি মাংস। লুচি মাছের কালিয়া।

আশ্চর্য কাণ্ড! সঙ্গে সঙ্গে তাদের জিভে জল এল। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড ক্ষুধা তাদের পেয়ে বসল। পেয়ে বসল মানে কি—পেটের ভিতর দাউদাউ আগুন জ্বলে উঠল। এই অভিজ্ঞতা নতুন। এমন আর হয়নি। কত লোককে কত কিছু খেতে দেখে তারা। কত মানুষ ভাল ভাল খাবার জিনিস

কিনে নিয়ে যায়, নিত্য তাদের চোখে পড়ে। সারাদিন তারা রাস্তায় ঘোরে। এক একটা খাবার দোকানে কত রকমারী খাবার সাজান থাকে। দেখে তাদের জিভে জল আসে না। পেটের মধ্যে এমন আগুনও জ্বলে না। তারা তাদের মনে খেলাধুলা করে। নেংটো হয়ে হাইড্রান্টের জলে স্নান করে। এ ওর গায়ে জল ছিটোয়, কাদা ছিটোয়। আর হি হি হাসে। যেমন একটু আগে গরম অ্যাসফল্টের ওপর ছুটোছুটি করে হা-ডু-ডু খেলছিল। হঠাৎ সব ওলট-পালট হয়ে গেল। খেলা থেমে গেল। এক সঙ্গে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। যেদিক থেকে সেই গন্ধটা আসছিল, পুব বরাবর মুখটা ঘুরিয়ে রাখল। তাদের সঙ্গী কুকুরটা, যার নাম লালু, তাদের দেখাদেখি পূবদিকে মুখটা তুলে ধরে ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। অর্থাৎ সেও সেই আশ্চর্য গন্ধ টের পেয়েছে। বোধকরি একটু বেশিই টের পেল। কারণ কুকুরের ঘ্রাণশক্তি বড়ো প্রবল। এবং তার ঠিক এক সেকেণ্ড পরেই ঘাড় ঘুরিয়ে লালু এদিকে, তার বন্ধুদের মুখের দিকে তাকাল, তারপর পূবদিক ধরে ছুটতে লাগল।

লালুর ইঙ্গিতটা নেমু ঘেমু হুদা ভোঁদাদের বুঝতে বাকি থাকে না। তারাও তখন লালুর পিছু পিছু ছুটতে আরম্ভ করে।

একদমে পোয়া মাইল ছুটে গিয়ে একটা জমকালো বাড়ির ফটকের সামনে তারা দাঁড়ায় বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড লনে মেরাপ বাঁধা হয়েছে। কত মানুষ ভিতরে ঢুকছে। সারি সারি গাড়ি দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে বাবুরা নামছেন, গিন্নিরা নামছেন —তাঁদের ছেলে মেয়েরা নামছে। তারপর ফটক পার হয়ে ভিতরে চলে যাচ্ছে।

নেমন্তন্ন খেতে এসেছে সব বোঝা যায়। বিয়ে? মুখে-ভাত? পৈতে? শ্রাদ্ধ! কিছু একটা হবে তো বটেই। না হলে এত লোক খেতে আসে। এত ভাল রান্নার গন্ধ। নেমু ঘেমু হুদা ভোঁদারা এখন সার কেবল লুচি ভাজা না, মাছ ভাজা কপির ডালনা, ছোলার ডাল, মাছের কালিয়া, মাংস পোলাও চাটনি এবং দই রাবড়ি রসগোল্লার ভুরভুরে গন্ধ টের পেল। লালু আগে টের পেল। লম্বা জিভ দিয়ে সে ঠোঁট চাটছিল। দেখে দেবশিশুরাও ঠোঁট চাটতে লাগল। তাদের ক্ষুধার আগুন নতুন করে দাউদাউ করে উঠল। লালুর দেখাদেখি ফটকের গা ঘেঁষে সকলে দাঁড়াতে গেল। তখুনি চাকর দারোয়ানরা হৈ-হৈ করে তেড়ে এল। এই এদিক না এদিক না, সরে যা! পালা। ভয়ে সকলে পিছিয়ে এল। একটু পরে আবার তারা ফটকের দিকে এগোয়। আবার চাকরবাকরেরা ছুটে আসে। আবার তোরা এখানে! যদি কিছু খেতে চাস,

কিছু পাবার আশা করিস তবে বাড়ির সামনে থেকে সরে দাঁড়া। নইলে মেরে ঠাণ্ডা করে দেব। চাকরদের শাসানি শুনে আর তারা ওদিকে এগুতে সাহস পেল না। কিছুক্ষণ রাস্তার এধারে দাঁড়িয়ে থাকার পর বুদ্ধি করে তারা বাড়ির পিছন দিকে সরে এল।

তাদের বুদ্ধি ঠিক বলা যায় না। লালু পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। এবার ভোঁদাদের চোখ চড়কে ওঠে। এঁটো খুরি ভাঁড় ও কলাপাতার পাহাড় জমে আছে। বোঝা গেল কয়েক হাজার মানুষ ইতিমধ্যে খেয়ে গেছে। আরো যাবে। গাড়ির পর গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে ফটকের সামনে। দলে দলে বাবুরা গিন্নিরা তাদের ছেলেমেয়েরা গাড়ি থেকে নামছে। যাই হোক, এঁটো পাতা ও মাটির ভাঁড় চাটতে তারা কিছু এখানে আসেনি। তাদের অপেক্ষা করতে হবে। দু'দুবার তেড়ে এলেও, চাকরবাকরদের কাছ থেকে এটুকু অন্তত আশা পাওয়া গেছে, শেষ পর্যন্ত কিছু তাদের খেতে দেওয়া হবে। বাবুদের মতন তারাও লুচি মাংস পোলাও কালিয়ার ভাগ পাবে। হয়তো কম পাবে। তা বলে শুধু মুখে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। অল্প স্বল্প খেতে পেলেও তারা তুষ্ট হয়।

জায়গাটা কেমন অন্ধকার মতন। হবেই। কেবল তো একটা বাড়ি না। কম করেও দশটা বাড়ি আকাশে গলা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সব কটা বাড়ির পিছন দিক এটা। সব বাড়ির জঞ্জাল এখানে এসে পড়ছে।

হুঁ, কিছু পাবে তারা। ভোঁদারা চিন্তা করল। তাদের পাওয়া উচিত। তারা কিছু বাইরের লোক না। ধরতে গেলে এ পাড়ার ছেলে। বাবুরা গিন্নিরা, তাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা, তাদের আত্মীয়বন্ধুরা রাতদিন রাস্তায় ঘাটে হুদা ভোঁদার দলটাকে দেখছে। চব্বিশ ঘণ্টা রাস্তায় খেলাধুলো করছে ওরা। লালুও সারাক্ষণ এ পাড়ায় ঘুরঘুর করছে। সুতরাং তারও কিছুর প্রাপ্তির আশা আছে। অন্য দিন হলে লালু এতক্ষণ এঁটো পাতার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দিত। আজ সে তা করল না। সেই বড় বাড়ির দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন লেজ নাড়তে লাগল। বেশ কিছুটা সময় কাটে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে তারা। জঞ্জালের টালের মধ্যে দাঁড়িয়ে খুব যে একটা খারাপ লাগছিল তা নয়। এ পাড়ায় অনেক জঞ্জাল তারা ঘাটে। ঘেঁটে মাঝে মাঝে মণি-মুক্তো কুড়িয়ে পায়। যেমন নেদু একদিন একটা আস্ত পাউরুটি পেয়েছিল। যদিও বাসী রুটি। শুকিয়ে চিপসে মেরে গেছিল এবং পিঠটা একেবারে পোড়া ছিল, তা হলেও আস্ত রুটি। ঘেন্টু একদিন একছড়া আঙুর

কুড়িয়ে পায়। দোষের মধ্যে একটু দাগ ধরেছিল। তা না হলে আঙুরটা ভালই ছিল। হুদা একবার একটা বীয়ারের খালি বোতল পেয়ে যায়। এত চমৎকার ছিল না বোতলটা দেখতে। খাঁটি বিলিতি বোতল। দুদিন নিজের কাছে রেখে পরে হুদা শিশি বোতলওয়ালার কাছে বোতলটা বেচে পাচ পয়সা পায়। মন্দ লাভ হয়েছিল কি। ভোঁদা সেদিন এতবড় একটা প্ল্যাস্টিকের পুতুল পেয়েছিল। মুখটা এবং পেটটা একটু তুবড়ে গিয়েছিল। তা হলেও কত বড়ো একটা পুতুল। এভাবে অনেক দিন অনেক কিছু তারা পেয়ে যায়। বেন্দা একদিন একটা স্প্রীং কেটে যাওয়া টিনের মোটরগাড়ি কুড়িয়ে পেয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে ভাল জিনিস পেয়েছিল বেন্দার ভাই মেন্দা। একটা চেন লাগান গেঞ্জি। এখানে ওখানে খানিকটা করে ইঁদুর টুকেছিল। তাতে কিছু ক্ষতি হয়নি; এক নাগাড়ে ছ'মাস মেন্দা লাল টুকটুকে রঙের জামাটা পরতে পেরেছিল। যদিও তার গায়ের মাপ থেকে একটু বেশি বড় ছিল। তা হলেও এমন একটা গেঞ্জি আর কোথায় সে পেত! কে দিত তাকে! কাজেই এটা ওটা পেয়ে যাবে আশায় হরদম তারা জঞ্জাল ঘাঁটে।

অবশ্য আজকের জঞ্জাল কেবল এঁটো কলাপাতা ও মাটির গেলাস ভাঁড়। ঘাঁটবার মতন কিছু নেই। আরো কথা আছে। খাওয়ার গন্ধ এক, আর এঁটো উচ্ছিষ্টের গন্ধ অন্য। পাতায় লেগে থাকা ছেঁড়া লুচি মাংসের ঝোল মাংসের হাড় মাছের কাঁটা চাটনি দই ইত্যাদি এর মধ্যেই যেন পচে উঠে একটা বিচ্ছিরি টকো মদো গন্ধ ছড়াচ্ছিল।

তা হলেও তারা ঐ দুর্গন্ধ ভরা আবর্জনা নাকের সামনে নিয়ে অপেক্ষা করে। কম করেও যেন কয়েক হাজার কাক উড়ে এসে এঁটো পাতার পাহাড়ের ওপর বসে এটা ওটা ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছিল। অনেক খাবার সামনে ছড়ান ছিল। তাই কাকের গোষ্ঠীর খাওয়া আর শেষ হচ্ছিল না। যত খাচ্ছে তারা তত বেশী কা-কা ডাকছে। ক্রমেই শব্দটা বাড়ছিল। ফলে উচ্ছব বাড়ির হাঁকডাক গোলমাল ভাল শোনা যাচ্ছিল না, বোঝা যাচ্ছিল না। এরকম জঞ্জালের সামনে দাঁড়িয়ে দেবশিশুদের এক এক জনের আট দশ বারো তেরো বছরের জীবনে কাক কুকুরের ডাক ও চেঁচামেচি কম শোনা হয়নি। যেখানেই জঞ্জাল সেখানেই কাক কুকুর। এই শহরে তো বটেই, পৃথিবীর সর্বত্র এই নিয়ম।

যাই হোক, একভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দশ পনেরো বিশ মিনিট—আধঘণ্টা

কেটে গেল। তারপরও তারা দাঁড়িয়ে থাকল। তারা বুঝতে পারছিল না, শেষ পর্যন্ত আরো কিছু পাবার আছে কিনা।

এদিকে ক্ষুধায় পেটের নাড়িভুঁড়ি মুখে উঠে আসার উপক্রম। সেই সঙ্গে একটা বমিবমি ভাব, মাথা ঝিমঝিম, চোখে অন্ধকার দেখার মতন অবস্থা দাঁড়াল সকলের।

তারা চিন্তা করল, আবার ঘুরে ফিরে ফটকের সামনে দাঁড়াবে কিনা। না, তা হয় না। চাকরদের দাঁত খিঁচোনি ও দারোয়ানদের লাঠির চেহারা মনে পড়তে তারা নিরস্ত হয়। বরং যেখানে আছে সেখানে অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

অহো, ওখানটায় দাঁড়িয়ে থেকে তাদের লাভ হল বৈকি। তা না হলে বাবুদের বাড়ির এতসব কাণ্ডকীর্তি দেখতে পেত না যে। লুচির বদলে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো তাদের গায়ে এসে পড়ছিল। দেখে তারা হতভম্ব। এতবড় একটা বাড়িতে কি ছাইদানির অভাব হল! হতে পারে, তারা তখন চিন্তা করল, নেমন্তন্ন খেতে অনেক বাবু এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল। বাড়ির কর্তা কত ছাইদানি জোগাবে। সুতরাং রেলিং টপকে এদিকের জঞ্জালে পোড়া সিগারেটের টুকরো ছুঁড়ে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে বাবুরা ধরে নিয়েছেন। তা না হয় নিলেন, কিন্তু বাবুদের গিন্নিরা কি করছিলেন। অনেক মহিলা ভিড় করেছেন নেমন্তন্ন বাড়িতে। মনে হয় গলা পর্যন্ত লুচি মাংস দই রসগোল্লা ঠেসে তারা অনবরত পান চিবোচ্ছিলেন, আর মুহুর্মুহুঃ বাড়ির পিছন দিকের বারান্দায় ছুটে এসে জর্দা-গন্ধী পানের পিক ফেলছিলেন, পানের ছিবড়ে ফেলছিলেন নিচে। সিগারেটের আগুনে নান্নুর কাঁধের চামড়া ও বেন্দার পিঠের চামড়ায় ফোসকা পড়ে গেল। এবার পানের পিক পড়ে ভোঁদার মাথায় সবটা চুল ও হঠাৎ ওপর দিকে মুখ তুলে তাকাতে মেন্দার গাল লাল হয়ে গেল। দেখে মনে হয় একসঙ্গে তিনটি পিচকিরি থেকে রং ছিটকে এসে পড়লো দু' জনের গায়ে। তাছাড়া কি। আসলে একসঙ্গে তিন চারটি গিন্নি ওপর থেকে এত পানের পিক ছিবড়ে ফেলে চলে গেলেন। তারা পরিষ্কার দেখছিলেন নীচে একদঙ্গল ছেলে দাঁড়িয়ে।

দেবশিশুরা কিন্তু রাগ করল না। গোড়ায় খানিকটা অবাক হল, তারপর আর অবাকও হল না। বরং এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শব্দ না করে হাসছিল। তারপর আরো যা কাণ্ড ঘটল না—অবিশ্বাস্য ব্যাপার! কাউকে বলা যায় এসব! তাদের বয়সের দশবারো তেরো বছরের ধাড়ি ধাড়ি ছেলেগুলি,

যেন বাড়িতে বাথরুমের অভাব, এাদকের বারান্দায় ছুটে এসে পটাপট প্যাণ্টের বোতাম খুলে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে ঝপঝপ পেচ্ছাব করতে লাগল। ভোঁদাদের মুখ মাথা লক্ষ্য করে পেচ্ছাব করল। একবার করে আশ মিটল না, দুবার তিনবার করে ঘুরে ঘুরে এসে বাবুদের ছেলেরা প্যাণ্টের বোতাম খুলছিল। যেন ভারি আমোদের খেলা একটা।

এসব দেখে শুনে এবার বেশ জোরে, শব্দ করে হাসতে ইচ্ছে হল ভোঁদা বেন্দা নান্নু ঘেন্নুর। হাসলো না যদিও। হেসে করত কি। তা বলে কি মনের দুঃখে তারা কাঁদল। কেঁদেই বা হত কি। যা হবার তা হল। বরং ওই যে বলা হয়েছে, মস্ত একটা লাভ হল তাদের। তারা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। যেন একজন আর একজনকে প্রশ্ন করল, এই জন্যই কি বাবুরা যখন দামি গাড়ি চড়ে বেড়ান, তাদের দেখে আমাদের এত ভাল লাগে! সেজেগুজে গিন্নিরা যখন বেরোন, তাদের ছোঁবার জন্য, কাছে ঘেঁষবার জন্য আমাদের এত আকুলি-বিকুলি! আর তাদের ইস্কুলে পড়া ফুলের মতন ফুটফুটে ছেলেমেয়েরা! সোনার চাঁদদের চোখ ভরে দেখতে আমাদের কত সাধ হয়। কথা বলিস না কেন বেন্দা? ভোঁদা উত্তর দে! ভোঁদা হুদা বেন্দা ঘেন্নু—কারো মুখে রা নেই। তারা টের পেল লুচি মাংসের ক্ষুধাটা একদম চলে গেছে। কাজেই বাড়ির পেছনে আর দাঁড়িয়ে থাকার দরকার পড়ে না। বাড়ির পেছন ছেড়ে সদর ঘুরে তারা রাস্তায় উঠে এল। তবে কিনা ওখান থেকে সরে আসার সময় আর একটা বড় ঘটনা ঘটে গেল। চাকরদের কেউ উপর থেকে হুড়হুড় করে দু'গামলা গরম জল ছেড়ে দেয়। কারো গায়ে লাগল না। পড়ল লালুর পিঠে। গরম ছ্যাঁকা লেগে লালু ভয়ানক জোরে কাঁইকুঁই করে উঠল। কিন্তু সঙ্গীরা চুপ দেখে তখুনি লালু চুপ করে যায়। বুঝল এখানে কাঁদাকাটি করে কিছু হবে না। রাস্তায় উঠে এসে, ভোঁদাদের দেখাদেখি, কুকুর হলেও সব বোঝে লালু, দাঁত বের করে সকলের সঙ্গে হি-হি হাসতে লাগল। ভোঁদা বেন্দা নেন্নু ঘেন্নুর মতন সে-ও যে আয়নার ওপিঠ—নোংরা দিকটা দেখে এল। এক ছুটে তারা তাদের জায়গায় ফিরে এল। বিগড়ান গাড়ি পাশে রেখে বাবু রাস্তার মাঝখানে খোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের দেখে বাবুর মুখে হাসি ফুটল। কোথায় ছিলি সব বাছারা এতক্ষণ। তোদের পথ চেয়ে চেয়ে বিকেল হয়ে গেল। কালো কুতকুতে শরীরের ভোমরার ঝাঁক গাড়িটাকে তখুনি ঘিরে ফেলল। বাবু নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকেন। দশটা হাতের ঠেলায় গাড়ি গড়গড়িয়ে চলল।

তোরা কথা বল। তোরা গান গা। অন্য দিন তাই করিস না! গাড়িতে বসে বাবু আহ্লাদের স্বরে বলেন।

কিন্তু কথা বলার সময় কই। গান গাইবে তারা কখন। সেই যে হাসি শুরু হয়েছে এখনো অনর্গল হি-হি হাসছে।

কি হল আজ তোদের! বাবু জানলার বাইরে গলা বাড়িয়ে দেন। তার মনে হল গাড়িটা যেন বেশি জোরে ছুটছে। বেশি জোরে জোরে ওরা ঠেলছে আজ।

রোদ কমে গেছে। এখন ঘর বাড়ি গাছগাছালির ছায়া বেশি। ছায়া ধরে ধরে গাড়ি ছুটছে। পাখিদের কিচিরমিচির বাড়ছে। আস্তে আস্তে! বাবু ভয় পান। আগে আগে লেজ তুলে লালু দৌড়য়। লালুর পিছে পিছে গাড়ি নিয়ে দেবশিশুরা হুড়মুড় ছুটছে।

আরে গ্যারেজ এসে গেল দেখ দেখছি। বাবু ব্যস্ত হয়ে ভিতর থেকে চেঁচান। হুঁ গ্যারেজ এসে গেল। গ্যারেজ পিছনে পড়ে থাকে। তারা খিকখিক হাসে। আমার বাড়ি এসে গেল। এসে গেল। এই শোন! দাঁড়া। বাবু ক্রমাগত চেঁচান। তারা কান দেয় না। দাঁড়ায় না। বাবুর বাড়ি পিছনে ফেলে গাড়ি নিয়ে ছুটছে। তোরা আমায় কোথায় নিয়ে চললি? আর্তনাদ করে ওঠেন বাবু। কোথায় গিয়ে তোরা থামবি শুনি?

লালু যেখানে নিয়ে যায়। লালু যেখানে গিয়ে থামবে। হেসে উত্তর করে তারা। হেসে কুটি কুটি সব।

তোদের মতলবটা কি। এই ইতরের দল! ইতরের দল কথা বলে না। সরু লিকলিকে হাত পা, বকের ঠ্যাং-এর মতন শিরদাঁড়া। একরত্তি এক একটা শরীরে যেন এখন অসুরের বল জেগেছে। ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়িটা ঠেলে ঠেলে চলেছে। যেন একটা খেলা। যেন গাড়িটা তাদের হাতের খেলনা। তছনছ ভেঙে গুঁড়িয়ে তবে ছাড়বে। নাকি রাস্তার ওধারে খাদের ভিতর ফেলে দেবার মতলব। এই এই। বাবু লাফিয়ে গাড়ি থেকে বেরোতে চান। তার আগেই কুকুরটা একলাফে মস্তবড় খাদ ডিঙোয়। আর গাড়িটা গড়াতে গড়াতে শেষটায় প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের গুঁড়িতে ঠেকে ঝনঝন শব্দ করে থেমে যায়। তার মানে উইণ্ডসীলের কাচ ভাঙল, বনেট দুমড়ে মুচড়ে গেল, বাবুর কপাল ফেটে রক্ত বেরোল। রুমাল চাপা দিয়ে তিনি গাড়ি থেকে নামেন। অ্যাঁ, বাবু হাতপা ছুঁড়ে গর্জাতে থাকেন। শুয়ারের

ঝাঁক। ভিখিরের ছাওয়ালরা! তোরা সাপের পাঁচ পা দেখেছিস! তাই না? তোদের পুলিশে ধরিয়ে দেব।

তারা দাঁড়িয়ে থাকে। শব্দ করে না। ভয় পেয়ে ছুটে পালায় না।

কি হয়েছিল শুনি? খিদে পেয়েছিল? মাথা গরম হল কেন তোদের আজ?

বাবু চেঁচাতে থাকেন।

ড্যাবড্যাব চোখে একটু সময় তারা বাবুকে দেখল। তারপর হাউহাউ করে একসঙ্গে কেঁদে ফেলল। লালুও ঘেউ-ঘেউ করছিল। তারও চোখ বেয়ে টপটপ জল পড়ছে।

মহড়া

টাকা গোনার শব্দ? কোন টাকা? কাগজের টাকা! কয়েন! উঁহু, রুপোর টাকা এখন চোখে পড়ে না। চোখে পড়লই বা। ঐ ভারি মুদ্রা মানুষ আজ বয়ে বেড়াতে রাজী নয়। সর্বত্র কাগজ। নোট।

তা বলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোক দেখিয়ে কেউ টাকা গোনে কি? মানুষ অতি চতুর। গোপনে সে কড়ি রাখে, গোপনে তা গোনে। হ্যাঁ, পকেটে টাকা রেখে দরকার হলে রাস্তায় চলতে চলতেও সে গোনে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে চুপিচুপি গোনে। অবশ্যই কাগজের টাকা। অন্ধকার পকেটের গহ্বরে দু আঙুলে সে নোটের ভাঁজ ওল্টায় আর গুনে গুনে চলে। তার অঙ্গুলি সঞ্চালনের দরুন কাগজের টাকার একটা মসৃণ খসখস শব্দ হতে পারে বৈকি। সেই শব্দ আমি আপনি শুনতে পাই না। রাস্তার দশরকম গোলমালে তা চাপা পড়ে যায়। কেবল মানুষটার ঠোঁট নড়ে। দেখে আমরা অনুমান করতে পারি লুকিয়ে লুকিয়ে সে কিছু গুনছে। টাকা।

কিন্তু অনেক সময় আবার গোলমালও হয়ে যায়। আমরাই গোলমাল করে ফেলি। ভাবি, ভদ্রলোক বুঝি মন্ত্রতন্ত্র আওড়াচ্ছে। হরিনাম জপছে। কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম?

এইরকম চিত্ততোষকে দেখে আমাদের গোলমাল হয়। রাস্তা দিয়ে যখন সে হাঁটে তার দু পকেটে হাতদুটো ঢোকান থাকে আর অনর্গল তার ঠোঁট নড়তে থাকে। ওপর নিচে দু ঠোঁটই সমানে নড়ছে।

আগে এই জিনিস আমাদের চোখে পড়ত না। অবশ্য এ-ও সত্য, তখন রাস্তায় চলতে ফিরতে সে ঠোঁট নাড়াত কি না তা আমাদের চোখে পড়ার কথা ছিল না। তার গৌরকান্তি অত্যুজ্জ্বল মুখমণ্ডল কালো ভেলভেটসদৃশ নধর দাড়িগোঁফে আবৃত থাকত। তবে এমনও হতে পারে হাঁটতে হাঁটতে সেদিন চিত্ততোষ হয়তো আদৌ ঠোঁট নাড়ত না।

এখানে বলে রাখা ভাল, সেটা ছিল তার সেলিবেসির জীবন। ঘরে বউ আসেনি। কিন্তু গৃহিণী আসার পর থেকে আমরা দেখছি চিত্ততোষের ঠোঁট চিবুক ও গণ্ডদেশের ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাজি উধাও হয়েছে। আমরা অনুমান করলাম আটাশ বছরের যুবক স্বামীর শ্মশ্রুগোঁফ অর্ধাঙ্গিনী পছন্দ করেন না। আর সেদিন থেকে যেন দেখছি রাস্তায় চলতে ফিরতে পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে চিত্ততোষ অনর্গল ঠোঁট নাড়ছে। মন্ত্র জপছে? কৃষ্ণের একশ আটটা নাম? না কি নোটের গোছা পকেটে রেখে মনে মনে গুনছে? অনেক কিছু আমরা চিন্তা করি।

এখন গ্রীষ্মের বিকেল। আষাঢ় শুরু হয়েছে যদিও। বর্ষা কোথায়? মেঘ-বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। সারাদিন গরম হলকা বইছে। বাতাসে আগুন। সুতরাং বলা ভালো নিদাঘের দাপট এখনও চলছে। শনিবারের অফিস সকাল সকাল ছুটি হয়েছে। এসময় লড়াই করে ভিড়ের ট্রাম-বাস ধরার ঝক্কি পোহায় না বুদ্ধিমান চিত্ততোষ। হেঁটে বাড়ি ফেরে। সবটা বৌবাজার হাঁটে। তারপর আমহার্স্ট স্ট্রীটের অর্ধেকটা। না অর্ধেকের বেশি। তারপর সুকিয়া স্ট্রীট। সুকিয়া স্ট্রীটের সিকি অংশ হাঁটবার পর বাঁয়ে বাঁক নিয়ে একটা ছোট্ট গলিতে ঢুকেই তার বাড়ি। সেকেলে চেহারার দোতলা বাড়ির ওপরের দো কামরা ফ্ল্যাট। শুকনো মটরশুঁটির মতন দরজা জানালার রং। অপরাজিতা রঙের পর্দা। সাউথে এসব ফ্যাশন চলে না। চলে কী? কিন্তু করবে কি। বিয়ের পর দক্ষিণে ঘর না পেয়ে চিত্ততোষ উত্তরে এসে ঠাঁই নিয়েছে। তবু তো ঘর। একখানি বাসা। মন্দের ভাল।

গলিটা খুবই নির্জন। বিশেষ এ সময়। শনিবারের বিকেলে। এদিক ওদিক তাকালে মনে হবে চারদিকের ঘরবাড়ি ফাঁকা। মনে হবে বেবাক বউ ঝি গিন্নি-বান্নী সিনেমা কি 'থেটার' দেখতে চলে গেছে। মার্কেটিং-এ বেরিয়েছে। বাচ্চা কাচ্চা মেয়ে ও ছেলের দল পার্কে বা খেলার মাঠে ছড়িয়ে আছে। এবং কোনো বাড়ির কোনো পুরুষই এখন পর্যন্ত ঘরে ফেরেনি।

ব্যাতিক্রম চিত্ততোষ। হঠাৎ এই শূন্যতার মধ্যে এসে নিজেকে ভারি

উপহাসাস্পদ ঠেকতে পারত তার। কিন্তু এই নিয়ে মোটে সে মাথা ঘামায় না। অফিস সেরে আর কোথাও না গিয়ে নিজের ঘরে ফিরছে। তার দরকার এখন ঘরে ফেরা। ব্যস, এর ওপর কথা চলে না। অন্তত চিত্ততোষের তাই ধারণা।

হ্যাঁ, তবে সে জানে তার গিন্নী এখন ঘরে নেই। দরজায় তালা ঝুলিয়ে তিনি সিনেমা থিয়েটার দেখতে বা মার্কেটিং-এ বেরিয়েছেন। তা বেরোক। তাঁকে আটকাবে কে। পৃথিবীতে কেউ কাউকে আটকাতে পারে না। পারা উচিত নয়। এই যে যেখানে অন্য সব বাড়ির কর্তারা এ-সময় ঘরে ফেরার নামও করে না, ছুটির পরেও অফিসে থেকে ওভারটাইম খাটে বা খেলা দেখতে মাঠে যায় অথবা বন্ধুবান্ধব নিয়ে চায়ের দোকানে আড্ডা মারে বা অতিরিক্ত রোজগারের ধান্দায় এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে, সেখানে চিত্ততোষ যে তড়িঘড়ি ঘরে ফিরল কেউ কি তাকে আটকাতে পারল।

এক নিশ্বাসে খাড়া খাড়া তেরটা সিঁড়ি ভেঙে চিত্ততোষ দোতলায় উঠে এল। পকেট থেকে ডুপ্লিকেট চাবি বের করে তালা খুলল। আশ্চর্য, তখনও তার ঠোঁট নড়ছে, হরিনাম জপছে। ঠিক এই মুহূর্তে দৃশ্যটা দেখলে আপনাদের সন্দেহ হত, তবে কি চিত্ততোষ টাকা গুনছে না।

এখন আর পকেটে হাত নেই, দু আঙুলে নোটের তাড়া উল্টে উল্টে বিড়বিড়িয়ে গুনে যাবার প্রশ্ন ওঠে না। তালা খুলতে তার দু হাতের দশটা আঙুলই ব্যস্ত। তালাটা মাঝে মাঝে গোলমাল করে কিনা।

ভিতরে ঢুকে দেখা যায়, গা থেকে জামাটা আলগা করে সে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে দিল। এবার প্যাণ্ট খুলবে। তার আগে প্যাণ্টের পকেট থেকে যে সব জিনিস বের করে সে টেবিলে রাখল তার মধ্যে নোটের গোছা বলতে কিছু নেই। কিছু খুচরো পয়সা। নস্যির কৌটো। অফিসে যাবার সময় বাসের টিকিট কেটেছিল—সেই বাসি টিকিটখানা। আর নস্যির রঙে রঞ্জিত তার ময়লা কুঁচকোনো রুমাল। এ থেকে একটা জিনিস বোঝা যায়। চিত্ততোষ কি রকম অন্যমনস্ক। বাসের ঐ টিকিট তার কোন কাজে লাগত যে সেটা পকেটে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং যত্ন করে টেবিলে রাখল। প্যাণ্ট ছেড়ে দেওয়ালের হুকে ঝুলিয়ে দিয়ে জাঙিয়া গেঞ্জি গায়ে সে বাথরুমে ঢোকে।

যদি আপনারা কেউ এ সময়কার দৃশ্যটাও দেখতেন তাজ্জব বনতেন। চিত্ততোষ তখনও ঠোঁট নাড়ছে। অমিতা শখ করে বাথরুমের দেওয়ালে একটা আড়াই ফুট তিন ফুট আরশি টাঙিয়েছে। আরশির সামনে দাঁড়িয়ে চিত্ততোষ

বিড়বিড় করছে। হরিনাম জপছে। হরিনাম একটা কথার কথা। আমাদের বাইরের লোকের রথো অনুমান। আজকের কোনো যুবক নামটাম জপে না। আমেরিকা হলে কথা ছিল। সুতরাং আমাদের মনে হতে পারে যেহেতু চিত্ততোষ এখন টাকা গুনছে না, হরিনাম জপছে না, তবে বোধ করি ওটা তার মুদ্রাদোষ। মনে মনে কিছু বলার মতন অহরহ ঠোঁট নাড়া। কিন্তু তাই বা হয় কি করে! চিত্ততোষ অমিতার আরশির মধ্যে মুখ দেখছে, সুতরাং নিজের ঐ বিচ্ছিরি ঠোঁট নাড়া তার চোখে পড়বেই। এবং এটা সবাই জানে এই অবস্থায় মুদ্রাদোষের রোগীদের অঙ্গভঙ্গি অন্তত কিছুক্ষণের জন্য থেমে যায়। যার পা নাড়াবার রোগ থাকে সে আর পা নাড়ায় না। চোখ মটকাবার অসুখ থাকলে সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। নিজের চোখে নিজের এই অকারণ অঙ্গভঙ্গি খারাপ লাগে। লজ্জা পায়। কিন্তু আরশির ভিতর তাকিয়ে চিত্ততোষ তার এই অহেতুক ঠোঁট নাড়া দেখতে পেয়েও যখন জিনিসটা বন্ধ করছে না, তখন পরিষ্কার বোঝা গেল এটা ঠিক তথাকথিত মুদ্রাদোষের পর্যায়ে পড়ে না। তা হলে? বরং আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে আরও বেশি করে ঠোঁট নাড়ছে সে।

কাজেই আমার বক্তব্য, বাথরুমের স্যাঁৎসেঁতে পরিবেশের মধ্যে একা চুপ করে দাঁড়িয়ে মন্ত্র জপবার মতন বিড়বিড় করছে—এ ছবি আপনাদের কারো চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেতেন—অন্তত গত কয়েকমাস ধরে আমিও যা আশঙ্কা করছি। চিত্ততোষ একটা কিছু গুরুতর ফন্দি আঁটছে মনে মনে। একটা প্ল্যান তার মাথায় ঘুরছে। এবং মনে হয় মগজের সে গাঢ় গূঢ় অন্ধকার রক্তযন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ—মুহুর্মুহু ঠোঁট নাড়া। অফিসে কাজ করতে করতে তাকে তাই করতে দেখা গেছে। লাঞ্চ আওয়ারে ক্যান্টিনে বসে চা খাবার খেতে খেতেও ঐ এক অবস্থা। চিত্ততোষ বিড়বিড়িয়ে কিছু যেন বলছিল। অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার পথেও তাই দেখলাম। এখন বাথরুমে।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—তা হলে, তা হলে কি তার মাথায় সর্বদা অফিসের চিন্তা। ইনক্রিমেণ্টের ভাবনা ভাবছে? কি করে একটা ভাল প্রমোশন বাগাবে মনে মনে তার অন্ধিসন্ধি খুঁজছে? না আমি হলপ করে বলতে পারি চিত্ততোষের পরম শত্রুও বলবে না যে আর দশটি চাকুরিজীবী বাঙালীর মতন তার অফিসগত প্রাণ। ইনক্রিমেণ্টের জন্য, প্রমোশনের জন্য, চোখে ঘুম নেই। তা হলে চিত্ততোষকে অন্যরকম দেখতাম আমরা। আর দশজন চাকুরিজীবী যা করে সেও তাই করত। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টায়

রোজ অফিসে পৌঁছে হাজিরা খাতায় নাম সই করত। করছে কি সে? পাঁচ দশ পনেরো বিশ মিনিট—কোনোদিন তো আধঘণ্টা লেট করে অফিসে গিয়ে হাজির হয়। সেদিন আর হাজিরা খাতায় নাম সই করা হয় না। খাতা বড় সাহেবের কামরায় চলে যায়। তা ছাড়া অফিসে কি সারাদিন সে ঘাড় গুঁজে থাকে? মোটেই না। কাজ করতে করতে কতবার যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। সামনে ফাইলপত্তর খোলা, হাতে কলম রয়েছে, অথচ তার চোখ দেওয়ালের দিকে, একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে অনর্গল ঠোঁট নাড়ছে। কিছু বলছে নিজের মনে। কী বলছে? কোন মতলব মাথায়? তবেই বুঝুন একমাত্র অফিস যাদের ধ্যান প্রাণ সেই দলে চিত্ততোষকে ফেলা যায় না। তা হলে কি একবেলা লেট করে অফিসে এসে আর একবেলা পাঁচ দশ পনেরো মিনিট—কোনোদিন আধঘণ্টা আগেই ফাইলপত্তর গুটিয়ে পকেটে কলম গুঁজে যেন কত কাজ বাইরে পড়ে আছে, হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসত। প্রমোশন-প্রার্থী ইনক্রিমেণ্ট-প্রত্যাশী কর্মচারীরা ছুটির পরেও অফিসে থেকে যায়। যেন কাজ শেষ করার পরেও কাজ করছে। বড় সাহেব, মেজ সাহেব, ছোট সাহেবকে খুশী করতে তারা দরকার হলে এক দেড়ঘণ্টা বিনা মজুরিতে ওভারটাইম খাটতে আপত্তি করে না। আর চিত্ততোষ? ততক্ষণে দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে বৌবাজারের ফুটপাত ধরে হাঁটছে, তার যেন টাকা গুনছে না কি মন্ত্র আওড়াচ্ছে অথবা যেন একটা মতলব আঁটছে। হুঁ, যেভাবে ঠোঁট নড়ছে তার! কিন্তু কিসের মতলব। পাওনাদারকে কি করে ঠকাবে তার জল্পনা? না, চিত্ততোষের কোনো পাওনাদার নেই। বিয়ের আগে যদি বা এদিক ওদিক কিছু ধারটার জমত, এখন মাসের প্রথম দিকে সব সাফ হয়ে যায়। গিন্নী এসে এই নিয়ম করেছে। অমিতা ধার দেনা পছন্দ করে না। গয়নার টাকা, মুদির পাওনা, ইলেকট্রিক বিল, লন্ড্রীর বিল, সব এক ধার থেকে মিটিয়ে দেওয়া হয়। চিত্ততোষের মাইনের টাকা ঘরে আনার সঙ্গে সঙ্গে সব পরিষ্কার। অমিতা বলে, ধার দেনা হল আবর্জনা জঞ্জাল। জমতে দিতে নেই। চিত্ততোষের মুখের দিকে তাকিয়েও পৃথিবীর মানুষ এখন সেটা টের পায়। ধার দেনার মতন তার মুখের দাড়ি গোঁফের আবর্জনা গিন্নী এসে নির্মূল করিয়ে ছেড়েছে। এক কথায় অমিতা তার এই ছোট্ট সংসারটিকে ঝকমকে রাখতে চায়। প্রশংসনীয় বইকি।

তা হলে? পাওনাদারের চিন্তা নেই। তবে কি নিয়ে চিত্ততোষের মনের মধ্যে তুমুল আন্দোলন। পাগলের মতন বিড়বিড় করে কী বলছে এত।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে সে পোশাক পরল। এখন আর প্যান্ট শার্ট না। পাজামা পাঞ্জাবি। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে বিকেলে তাই সে পরে। খুচরো পয়সাগুলি টেবিল থেকে তুলে আবার পকেটে ঢোকাল। সেই সঙ্গে নাস্তির কৌটো ও দাগ ধরা রুমাল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে পাল্লা দুটো টেনে সেই ডুপ্লিকেট চাবি ঘুরিয়ে আবার দোরে তালা ঝুলিয়ে দিল। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে রাস্তার প্রগাঢ় শূন্যতা আবার তাকে ঘিরে ধরল। অস্বস্তি বোধ করল সে। যে জন্য এক মিনিটও সেখানে অপেক্ষা না করে দু পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল। তার ঠোঁট নাড়াও সমানে চলতে লাগল।

এই রকম। প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

এসব দেখে আপনাদের হঠাৎ মনে হতে পারে তা হলে বোধ করি চিত্ততোষ কারো কাছে বড়রকম কিছু টাকাকড়ি পায়। অর্থাৎ চিত্ততোষ এখানে পাওনাদার। কাউকে কোনো সময় এক থোক টাকা ধার দিয়েছিল। এখন সেই টাকা আদায় হচ্ছে না। তাই তার মনে সর্বদা অস্থিরতা অশান্তি। কি করে টাকাটা ফিরিয়ে আনবে ভেবে আকুল। মনে মনে এখন ঐ এক জিনিস জপছে।

পাগল! আপনাদের তা হলে জানা নেই। এক সঙ্গে এক থোক টাকা কাউকে ধার দেবার মতন রোজগার তার কোনোদিন ছিল না। এখনও নেই। এই তো বিয়ের বছরখানেক আগে অফিসের মাইনেটা একটু যা ভদ্ররকম হয়েছে। অমিতা এই সংসারে পা রেখেই বুঝতে পেরেছিল অতি সীমায়িত আয় ও সীমায়িত ব্যয়ের ভিত্তিতে মহাশয়টির বেঁচে থাকা। কিন্তু এই করেও সব দিক কুলোতে পারছেন না। তাই মুদিদোকানে ধার, গয়লা দুধের টাকা পায়, ইলেকট্রিক বিল জমেছে, দু মাসের লনড্রীর বিল জমেছে অ্যাতো। দেখে শুনে অমিতার খয়েরী রং চোখের তারা স্থির হয়ে যায়। এবং তক্ষুনি মাথা নেড়ে বলেছিল, না না, এসব ধারদেনা পরিষ্কার না করলে মুশকিল আছে। উই ঢিবি একদিন পর্বত হবে। পরে হাজার কোদাল শাবল চালিয়ে ডিনামাইট ফাটিয়েও এই পাহাড় সরানো যাবে না। শেষ পর্যন্ত ঐ পাহাড়ের চাপে চিত্ততোষ মরবে, অমিতাকেও মারবে। দরকার কি জেনেশুনে ঐ পথে পা বাড়াবার। কাপড় বুঝে জামার ছাঁট কাটতে হয়। আয় বুঝে ব্যয়। ঋণ করে ঘি খাওয়ার দিন চলে গেছে। দাম দিতে পার না, দুধ বন্ধ থাক। লনড্রীতে জামা-কাপড় না পাঠিয়ে বাড়িতে কাচলে অনেক পয়সার সাশ্রয় হয়। মাসে দু কেজি তেল, দু ডজন ডিমের জায়গায় এক কেজি তেল এক ডজন ডিম খেলে মুদিখানায় ধার হবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাজেই চিত্ততোষ কাউকে টাকাকড়ি ধার দিয়েছিল—অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আরও কথা আছে। টাকা ধার দিয়ে তা উশুল করতে পারছে না, আর সেই জ্বালা বুকে নিয়ে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে সে বিড়বিড় করছে, ঠোঁট নাড়াচ্ছে—এ জিনিস কি একদিন অমিতার চোখে পড়ত না। কচি খুকী নয় সে। খর দৃষ্টি। কতটা পানে কতটা চুন আছে, খসলেই বা কতটুকুন, টের পেতে কিছু ন মাস ছ মাস লাগত না তার। বিয়ের পরদিনই জিনিসটা চোখে পড়ত অমিতার। তখন সে ছেড়ে কথা কইত না। মশায়ের কী হয়েছে শুনতে পারি কি। মনে হয় সাংঘাতিক ভাবনা মাথায়। আর তার ধাক্কা এসে লাগছে মনে তাই সারাক্ষণ বিড়বিড় করে কিছু বলা হচ্ছে। আমাকে সব খুলে বলতে দোষ আছে কিছু?

তা হলে? তবে তো আমাদের ধরে নিতে হয়, অমিতার সামনে, সেই বিয়ের প্রথম রাত থেকে চিত্ততোষ একবার ঠোঁট নাড়ায় না। গালা আঁটা খামের মুখের মতন তার দুই ঠোঁট সেঁটে থাকে। একবারও ফাঁক হয় না।

একটা কথা বটে। আমার কিন্তু এতকাল খেয়াল হয়নি। আপনাদের কাছে স্বীকার করতে দোষ নেই—চিত্ততোষকে আমি কম করেও এ পর্যন্ত কয়েক শ বার দেখেছি। অমিতাদেবীকেও কম দেখা হল না। কিন্তু তাদের দুজনকে এক সঙ্গে কোনোদিন আমি দেখিনি। আমার তরফ থেকে এটা সঙ্কোচ বলতে পারেন, ভদ্রতা রক্ষা বলতে পারেন, তাঁরা স্বামী স্ত্রী যখন একত্র হন সাংসারিক কথাবার্তা বলেন, খাওয়া-দাওয়া করেন বিশ্রম্ভালাপ—

আমি সেখানে উপস্থিত থাকি না। সুতরাং অর্ধাঙ্গিনীর সামনে চিত্ততোষের ঠোঁট নড়ে কিনা আজও আমার অজানা থেকে গেছে।

দেখুন দেখুন। কী সাংঘাতিক বিপজ্জনক কাজ করছে সে। এ সময় শহরের রাস্তাঘাট কী ভয়াবহ মূর্তি ধরে। সন্ধ্যাবাতি লাগার সময়। উত্তাল ট্রাফিক। ডাইনে বাঁয়ে ঝড়ের বেগে গাড়ি ঘোড়া ছুটছে। চিত্ততোষের ভ্রূক্ষেপ নেই। ঠোঁট নাড়াচ্ছে আর গভীরভাবে কি সব চিন্তা করছে। ঐ অবস্থায় রাস্তা ক্রশ করছে। যেন এটা তার ফ্ল্যাটের সামনের সরু বারান্দা বা যেন তার ঘরের লাগোয়া ছোট্ট বাথরুম। যেখানে চোখ বুজে সে হাঁটে আর ভাবে আর ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করে নিজের মনে কিছু বকে। যে-কোনো মুহূর্তে একটা লরী তাকে চাপা দিতে পারে। বাস এসে ঘাড়ে উঠতে পারে, একটা ট্যাক্সি গুঁতো মেরে তাকে মাঝ রাস্তায় ফেলে দিতে কতক্ষণ। ট্রামের তলায় পড়ে তার দু'পা

দুটো হাত বা মুণ্ডসুদ্ধ গলাটা ঘ্যাঁচ করে আলগা হয়ে যেতে এক থেকে দেড় সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগবে না।

রাস্তার মানুষ বড় বড় চোখ করে তাকে দেখছে আর এসব চিন্তা করছে। কিন্তু তারা অবাক হয়ে দেখল, সম্ভাবিত সবকটা অ্যাকসিডেন্টকে কাঁচকলা দেখিয়ে অম্লানবদনে চিত্ততোষ ওপারের ফুটপাথে উঠে গেল।

তা রাস্তার মানুষ এসব ভাবতে পারে, মনে মনে চিত্ততোষকে বাহবা দিতে পারে। তাদের ভাবনার সঙ্গে আমার আপনার ভাবনা একখাতে না-ও বইতে পারে।

কি বলেন ? আমরা যদি বলি যে, একটাও অ্যাকসিডেন্ট বরাতে জুটল না বলে চিত্ততোষ ওদিকে ফুটপাথে উঠে মন খারাপ করল, তবে খুব ভুল করব।

জানি তখনি আপনারা সমস্বরে বলে বসবেন, তবে কি চিত্ততোষের মনে গভীর কোনো বেদনা বড়রকম, একটা দুঃখ আছে ? আমি বলব, হ্যাঁ, তাই। তা না হলে কলকাতার ভরসন্ধ্যার গাড়িঘোড়া বোঝাই এ-হেন ভয়ংকর ভিড়ের রাস্তায় এত অন্যমনস্ক হয়ে কেউ হাঁটাচলা করে ? একটা আত্মহত্যার প্রবণতা তার মধ্যে লুকিয়ে আছে।

কারণ একটু আগে যা যা বললাম, আপনারা শুনেছেন। তার পাওনাদার নেই, যে পাওনা মেটাতে পারছে না বলে দারুণ দুশ্চিন্তায় দিশেহারা হয়ে বেকুবের মতন রাস্তা পার হবে। সে নিজেও কারো কাছে টাকাকড়ি পায় না যে সে সব আদায় হচ্ছে না দেখে দুঃসহ উদ্বেগ অশান্তি ভিতরে নিয়ে মনে মনে উক্ত অধমর্ণের মুণ্ডপাত করতে করতে চলন্ত ট্যাক্সি লরী ট্রাম বাসের দিকে নজর না রেখে অন্ধের মতন হাঁটবে।

উঁহু, হাজার বার করে হরিনাম জপে খামকা শক্তি ক্ষয় করার মতন নির্বোধ সে নয়।

আর মোটে কয়েক আনা খুচরো পয়সা পকেটে নিয়ে বার বার করে কেউ সেগুলি গোনে না। যদি কেউ গোনে বুঝতে হবে তার মাথায় ছিট আছে। পাগল সে।

হ্যাঁ, দুঃখ। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কোন জাতের দুঃখ তার বুকে বাসা বেঁধে আছে, কিসের মনোবেদনা নিয়ে সে পুড়ছে।

আসুন, চিত্ততোষের গতিবিধি আর একটু লক্ষ্য করা যাক। ওদিকের ফুটপাথে এখনও সে দাঁড়িয়ে। তেমনি উদ্বিগ্ন চিন্তাক্লিষ্ট চেহারা। চৈত্রের হাওয়া লাগা বাঁশপাতার মতন তার অধরোষ্ঠ কাঁপছে।

কি ব্যাপার। হাতছানি দিয়ে কাকে ডাকল সে। চিনাবাদাম। আশ্চর্য কি। অফিসে লাঞ্চের সময় দুখানা টোস্ট দিয়ে এক কাপ চা—ওই তো খাওয়া হয়েছিল। তারপর কতটা সময় গেছে। বাড়ি ফিরে আর জলযোগ হয়নি। গিন্নী বাড়ি নেই। কে সব করে টরে দেয়, নিজের হাতে শুধু চা করারও ঝামেলা অনেক। তাই বোধ করি মুখ হাত ধুয়ে জামা-কাপড় বদলে চিত্ততোষ শুকনো মুখে বাড়ি থেকে আবার বেরিয়ে আসে। এখন হয়তো দুটো বাদাম চিবোবার ইচ্ছা।

কি হবে। খুব খিটিমিটি করছে চিত্ততোষ? তাই তো, সিকিটা ঘষা, বাদাম-ওয়ালা নিতে চাইছে না।

ওকি। সঙ্গে সঙ্গে চিত্ততোষ উত্তেজিত হয়ে লোকটার গালে চড় কষিয়ে দিল। ছোটলোক। ফেরিওয়ালার আক্কেল আর কত হবে—লাথি মেরে তোমাকে শালা···চিত্ততোষ গায়ের জোরে চেল্লায়।

এই—এই। করেন কি মশাই। দু তিনজন পথচারী ঘুরে দাঁড়িয়ে চিত্ততোষকে ধরে ফেলে।

আমার সিকি অচল বলছে, চিত্ততোষ বলল। হ্যাঁ, সিকিটা একটু ঘষা। পথচারীদের একজন এক পলক সিকিটা দেখে বলল, ও যদি এটা নিতে আপত্তি করে আপনি আর একটা পাল্টে দিন। নয়তো তার বাদাম ফিরিয়ে দিন। তা বলে নিরীহ গরীব পেয়ে মারধর করবেন—ছি ছি, শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে আপনাকে মনে হয়!

রাস্তার আরও লোক এসে জোটে। চাপে পড়ে চিত্ততোষ ঘষা সিকি পাল্টে দিতে বাধ্য হয়। বাদামওয়ালা চলে যায়। হাঙ্গামা মিটিয়ে পথচারীরা যে যার পথে এগোয়।

আর আমরা কী দেখছি? ক্রুদ্ধ বিকৃত চেহারা করে চিত্ততোষ একভাবে দাঁড়িয়ে। উত্তেজনায় সে কাঁপছে। তার দুই ঠোঁট ঘনঘন নড়ছে।

এর দ্বারা কী বোঝা গেল আপনারা চিন্তা করেছেন কি? হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। একটা চাপা আক্রোশ, একটা প্রতিহিংসার জন্ম চিত্ততোষের মধ্যে জেগে আছে। বাদামওয়ালা উপলক্ষমাত্র। ঘষা সিকি নিতে বেচারা আপত্তি করেছিল। তা বলে এমন বাবুদের মতন জ্বলে উঠে চিত্ততোষ তাকে চড় কষাবে, লাথি তুলবে।

তার অর্থ, একটু আগে যা বললাম, চিত্ততোষের মনে একটা বেশ ভালরকম দুঃখ, অভিমান তো আছেই—এখন বোঝা গেল দুঃখের সঙ্গে রাগ হিংসা ঈর্ষা এবং

কাউকে আঘাত করার একটা প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে পৃথিবীতে বেঁচে আছে। ভিতরের ঐ চাপা উত্তেজনার ঢেউ ক্রমাগত তার মগজে এসে ধাক্কা মারছে, ঠোঁটে বাড়ি খাচ্ছে, মানে, দুই ঠোঁট সারাক্ষণ এমন কাঁপছে, নড়ছে। না, এত সামান্য কারণে রাস্তার ফেরিওয়ালাকে কেউ মারতে যায় না।

এবার দেখুন আর দাঁড়িয়ে নেই হাঁটছে সে। হাতের বাদামের ঠোঙাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। একটা বাদাম মুখে তুলল না। ঘেন্না? হবে। রাগ ঘেন্না আক্রোশ নিয়ে তার দু চোখ এখন জবাফুলের মতন লাল। লাল চোখ ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখছে সে। যেন বাদামওয়ালাকে খুঁজছে। না কি যারা তার আক্রমণের হাত থেকে লোকটাকে বাঁচিয়েছিল সেই পথচারীদের হাতের কাছে সে পেতে চাইছে। তার চোখ মুখের অবস্থা উদ্‌ভ্রান্ত, তাকানো দেখে তাই মনে হয়। যেন পৃথিবীর সব মানুষকে খুন করতে পারলে সে এখন সুখী হয়। গোটা পৃথিবীর ওপর সে ক্রুদ্ধ, বীতশ্রদ্ধ। ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে।

ওদিকে হাঙ্গামা মিটিয়ে দিয়ে পথচারীদের সবাই কিছু দূরে সরে পড়েনি। দু একজন তখনও তাকে দেখছিল, তার পিছু পিছু হাঁটছিল। শুনুন তারা কী বলাবলি করছে।

মনে হয় ঘরে অশান্তি বাবুর, একজন মন্তব্য করল, গিন্নীর মন পাচ্ছেন না। স্ত্রীর কাছে যেটি পাবার তা আদায় করতে পারছেন না।

আর একজন সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল। বলল, উল্টোটাও হতে পারে। গিন্নী যা চাইছেন, বাবু তা দিতে পারছেন না। ঘরের লোকের পাওনা মেটাতে না পারলে খিটিমিটি লেগেই থাকে।

দুটোই সম্ভব। প্রথম জন বলল, তাই বাবু অনবরত ঠোঁট নাড়েন আর মনে মনে বলেন, এভাবে বেঁচে থেকে লাভ কি?

তবু বেঁচে থাকতে হয়। দু নম্বর পথচারী চোখ পাকিয়ে উত্তর করল, ইচ্ছে করলেই কি আর গাড়িঘোড়ার নিচে ঝাঁপ দেওয়া যায়। প্রাণের মায়া বড়ো মায়া। আর তা পারেন না বলে বাবুর অমন খিটমিটে মেজাজ। তুচ্ছ কারণে চটে যান। দেখলেন তো বাদামওয়ালার সঙ্গে কী কাণ্ডটাই না বাধিয়ে তুলেছিল।

হুঁ, আক্রোশ। ঘরের আক্রোশ বাইরে মেটাতে চাইছেন বাবু।

ঐ দেখুন পকেটে হাত ঢুকিয়ে পয়সা গুনছেন।

তা গুনবেন, আশ্চর্য কি। রোজগার করে এনে কর্তা বোধ করি সবটাই

গিন্নীর হাতে তুলে দেন। আর গিন্নী গুনে গুনে বাবুর হাত খরচের পয়সা দেন।

যা বলেছেন। তৃতীয় পথচারী হাসল। তাই তো বাবু হাঁটেন আর বিড়বিড় করে পয়সার হিসেব করেন। ঐ দিয়ে চা চপ খাবেন কি মুড়ি বাদাম-ভাজা—না কি এই পয়সায় সিগারেট কিনবেন অথবা মুচি ডেকে চটিটা ঠিক করাবেন, একটা স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেছে।

হি-হি দু নম্বর পথচারী হাসল। হাসল অন্য পথচারীরাও। তারপর নিজের পথে তারা চলে গেল।

শুনলেন তো সব। আপনারা কি কথাগুলি মেনে নিচ্ছেন। আমি কিন্তু এসব কথায় সায় দিতে পারি না। আজকালকার যুবক। লেখাপড়া জানে, চাকরি করে। সে কিনা ঘরের ঐ এক বউকে নিয়ে বিব্রত ব্যতিব্যস্ত বিমর্ষ উৎকণ্ঠিত অথবা রাগান্বিত ঈর্ষান্বিত হয়ে দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে ক্রমাগত ঠোঁট নেড়ে পাগলের মতন আবোল-তাবোল বকবে আর রাস্তায় ঘুরবে—এ হয় না। গাড়িঘোড়া বোঝাই ভিড়ের রাস্তার সম্ভাবিত সব কটা অ্যাকসিডেন্টকে কাঁচকলা দেখাবার মতন এখনকার যে কোন তরুণ-স্বামী তরুণী-গিন্নীকে কাঁচকলা দেখিয়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে দিব্যি ঘোরে।

দেখুন দেখুন। আবার কি কাণ্ড করছে চিত্ততোষ। একটা দোকানে ঢুকে পড়ল। কিসের দোকান বলুন তো? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। যাত্রা থিয়েটারের সাজ-পোশাক বেচে ওরা। ঐ দেখুন অন্য কোনো পোশাক না, একজোড়া গোঁফদাড়ি মুখে এঁটে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিত্ততোষ ট্রায়াল দিচ্ছে।

তবে কি নকল গোঁফদাড়ি কিনবে সে।

মনে হয়, পকেটে হাত ঢুকিয়েছে যখন—

কিন্তু তার ঠোঁট নড়ছে কোথায়, পয়সার হিসাব করছে কি?

দেখুন, আপনাদের বলেছি: ঝোপঝাড়ের ভেতর একটা খরগোশের নড়াচড়া বোঝা যায়। গোঁফদাড়ির আড়ালে মানুষের ঠোঁট নাড়া বোঝা যায় না। চিত্ততোষ এখন গোঁফদাড়ি পরেছে। হিংস্র হয়ে উঠেছে সে—বেহিসাবী। মনে হয় তার ঠোঁট আর নড়ছে না।

হুঁ তা হবে। সামান্য মশা মাছিটা মারতে আমাদের ঠোঁট মুখ শক্ত হয়ে ওঠে।

কেমন হাসি

আমার চতুর্দিকে উত্তপ্ত রৌদ্র। চৈত্রের দুপুর। যার তেজের সঙ্গে কবিরা অহরহ খর তরবারির তুলনা করেন। আর আমি কিনা অনর্গল হাসছি। আমার মাথার ওপর অনন্ত নীল নভোমণ্ডল। পায়ের নিচে গড়ের মাঠের গাদা গাদা শুকনো ঘাস। এই অবস্থায় শহীদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে আমি হেসে বাঁচি না। হাসতে হাসতে আমার দুপাশের পাঁজরা ঝন্‌ঝন্‌ করছে, পেটে খিল ধরছে। কখনো চোখে জল আসছে, আর সেই জলে চোখের কোণের পিচুটি গলে ধুয়ে গাল বেয়ে চিবুকের দাড়ির কাছে এসে ঝুলছে।

তাই তো, সংসারে অনেক রকম হাসি আছে। চিকন হাসি, মুচকি হাসি, মদির হাসি, মোহন হাসি, শোভন হাসি। তা ছাড়া দেঁতো হাসি, তেতো হাসির নাম শুনেছি। এসব হাসি শুধু চোখে দেখার। নিতান্তই ভিজ্যুয়ল ব্যাপার। কানে শোনার হাসিও আছে। শুনলে কানে তালা লাগে, কানের পর্দা ফেটে যায়। হৃৎপিণ্ড ধড়াস ধড়াস করে। যেমন অট্টহাসি বাজখাঁই হাসি। আবার শুনি বাঁদরের মতন খিচখিচ করেও কেউ হাসতে পারে, ভাল্লুকের মতন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হাসে। আমার এসব কথা শুনলে অনেকেই ভাববে আমি বুঝি হাসি নিয়ে রিসার্চ করছি। অনেকটা তাই। যেমন এখন এই প্রচণ্ড গরমের দুপুরে পিতলের খাড়া পিলসুজের মতন মেরুদাঁড়া টানটান করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ করে চৈত্রের বাতাসে দামামা বাজিয়ে আমি হা-হা হা-হা হাসছি।

টের পাই শহীদ মিনারের ওপাশে সরু চিলতে ছায়ায় আইসক্রীমের গাড়ি থামিয়ে গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে লোকটা গোল গোল চোখে আমাকে দেখছে। ভাবছে, নিশ্চয় পাগল ছাগল। না হলে এমন একা একা কেউ হাসে! বা এ-ও মনে করতে পারে লটারি জিতে আমি অনেক টাকা পেয়েছি। বা আখের গুছোব বলে এইমাত্র কারো মাথায় বাড়ি দিয়ে এসেছি! বা বৌয়ের চোখে ধুলো দিয়ে কোনো কু-মতলব হাসিল করতে যাচ্ছি। হাসি হাসি। হাসতে হাসতে হাঁস শব্দটা মনে আসে। হংস। পরমহংস! ব্রহ্মানন্দে মগ্ন পরম যোগীপুরুষ? না, এতটা উচ্চ চিন্তা আমার মাথায় নেই। বড়জোর

সোনার ডিমপাড়া হাঁসের কথা ভাবতে পারি। হাসির সঙ্গে ফাঁসী কথাটার চমৎকার মিল। অবাক হবার আছে কি। শহীদ মিনারের পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে আমি। এখান থেকে উঁকি দিলে বি বি ডি বাগ দেখা যায়। কর্নেল সিম্পসনকে খুন করা দীনেশ গুপ্তর ফাঁসী হয়েছিল। এখান থেকে উঁকি দিলে চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রীটের মোড়। টেগার্টের বদলে মিঃ ডে-কে খুন করে গোপীনাথের ফাঁসী হয়েছিল। ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে তারা জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন।

না, এতবড় জীবনের কথা কি ভাবতে পারি! একফোঁটা মানুষ আমি, এইটুকুন প্রাণ। এই শহরের হাজার হাঙ্গামা হুজ্জত দলবাজি গলাবাজি মারামারি খুনোখুনি ভিড় ও ভেজালের আবহাওয়ায় আমার বড় হওয়া, বেড়ে ওঠা। লোহালক্কড় বোঝাই গুদোমের নেংটি ইঁদুর যেমন করে বাড়ে বড় হয়। কিন্তু তাই তো সব নয়। আবার অনেক হাঙ্গামা হুজ্জত বোমা ছোঁড়াছুঁড়ি টেবিল চেয়ার ভাঙাভাঙি গণ টোকাটুকির আবহাওয়ায় খানিকটা লেখাপড়া শিখে একটা ডিগ্রী বাগিয়েছি। না, ডিগ্রীও শেষ কথা নয়। বিস্তর হাঁটাহাঁটি ধরাধরি অনুনয়বিনয় হতাশা দীর্ঘশ্বাস বিনিদ্র রাত্রি জাগরণ ও দশদিকে দশহাজার দরখাস্ত প্রেরণ এবং তারপর কুড়ি দুকুড়ি ইণ্টারভিউএর বৈতরণী অতিক্রমণের পর আমার একটা চাকরি জুটেছিল। সুতরাং এই ছোট মাথায় শহীদের জীবন, দেশের ভাবনা, দশের চিন্তা একদম আসে না। কাজেই ফাঁসীর কথা থাক। আপাতত ঠা-ঠা রোদ্দুর মাথায় নিয়ে ময়দানে দাঁড়িয়ে অনর্গল হাসছি। সেই সঙ্গে আর পাঁচটা মানুষের হরেকরকম হাসির কথা ভাবছি। হুঁ, হাসি নিয়ে আমার গবেষণা। আমার বৌ কেমন করে হাসে, আমার অফিসের বড় সাহেব কেমন হাসে, বড় সাহেবের টাইপিসট লায়লা কেমন করে হাসে ও কতভাবে হাসে।

এখন আমি বাতাসে আওয়াজ তুলে হা-হা হাসছি। সেদিন কিন্তু আমার বি বি ডি বাগ অফিসের বড় সাহেবের কামরায় পুশিংডোর ঠেলে ঝড়ের মতন ভিতরে ঢুকে এমন হাসতে পারিনি। ইচ্ছে ছিল হাওয়ায় তুফান তুলে সাহেবের ঘর কাঁপিয়ে একটা অট্টহাসি হাসব। পারিনি। হাসিটা গলার মধ্যে আটকে গিয়ে চড়ক মেলার ডুগডুগির মতন বাজতে লাগল।

বলেছি, কিছু হাসি চোখে দেখার, কিছু কানে শোনার। মুখার্জির (বড় সাহেব) ঘরে আমার হাসাটা কানে শোনার মতন ছিল। যেমন আজ সকালে আমার বেলেঘাটা চাউলপট্টি রোডের বাসায় মধুমিতার (আমার গিন্নী)হাসি, চোখে

দেখার তো বটেই, কানে শোনার মতনও ছিল। এমন কি হাসিটা আঙুল দিয়ে ছোঁয়া গেছে। যেমন লায়লার হাসি। উঁহু, আমার বি বি ডি বাগ অফিসের লায়লা নয়। ফটিকচাঁদ মিত্তির লেনের নগেন কোবরেজের মেয়ে লায়লা। ওপাড়ার বাটারফ্লাই ক্লাবের অ্যানুয়েল ফাংশনে বিসর্জন নাটকে অপর্ণার রোলে অভিনয় করতে নেমে পার্ট ভুলে গিয়ে লায়লা স্টেজের ওপর হেসে ফেলেছিল। তারপর স্টেজ থেকে নেমে গ্রীনরুমে ঢুকে অঝোরে কান্না। কান্নার আগে লায়লার হাসি দেখার মতন ছিল। অবিশ্যি সেটা কোন জাতের হাসি বুঝতে পারিনি। বলেছি সংসারে অনেকরকম হাসি মানুষ হাসে। শোভন হাসি লাজুক হাসি গোমড়া হাসি। লায়লার সেদিনের হাসির আমি কোন নামকরণ করতে পারিনি। যেমন আর একদিন। বাটারফ্লাই ক্লাবের অ্যানুয়েল স্পোর্টসে হার্ডল রেসে নেমে দু পা ছুটেই দুম করে আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে লায়লা খিলখিল হাসছিল। তারপর মাঠ ছেড়ে তক্ষুনি উঠে এসে ক্লাবের টেণ্টে ঢুকে ঝরঝর কান্না। বুঝুন।

সেদিন অবশ্য লায়লা আজকের মতন ছিমছাম তন্বী ছিল না। এমন সুকেশিনীও হয়ে ওঠেনি। দেখতাম ফ্রকপরা ঢ্যাপসা শরীর। একমাথা লাল রুক্ষ চুল। থপথপে ঢ্যাপসা শরীর নিয়ে লায়লা যে রেসে ছুটতে পারবে না—আমি আগেই জানতাম। হয়েছিলও তাই। আমিও সেদিন ফটিকচাঁদ মিত্তির লেনের ছেলে ছিলাম কিনা। বাটারফ্লাই ক্লাবের মেম্বার ছিলাম। লায়লার অনেক কিছু দেখার সুযোগ হয়েছিল। যে কোন ব্যাপারে হেরে গিয়ে সে হেসেছে, তারপর কেঁদেছে। যেমন সেবার হায়ারসেকেনডারী পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্ট বেরোবার দিন গেজেটে নাম খুঁজে না পেয়ে আমাদের ক্লাবঘরে বসে সকলের সামনে খুব কতক্ষণ হাসল। শুনেছি পরে বাড়ি গিয়ে মাটিতে গড়িয়ে মেয়ের মহাকান্না। কান্নার আগে লায়লার সেসব হাসি নিয়ে আমি মাথা ঘামাতাম না। আসলে হাসিগুলি দুর্বোধ ছিল। যে জন্য একটা হাসিরও নাম দিতে পারিনি। কিন্তু তার এদিকের হাসিগুলি বুঝতে পারি। জলের মতন পরিষ্কার। এদিকে মানে কি, বছর পাঁচেক আগে আমি ফটিকচাঁদ মিত্তির লেন ছেড়েছি। লায়লার সঙ্গে দেখা হচ্ছিল না। ওর হাসি এবং হাসির পরে কান্না একরকম ছিল কিনা খোঁজ নেইনি। আমি আপাতত বেলেঘাটা চাউল পট্টি রোডের বাসিন্দা। ইদানীং মধুমিতা আমার ঘর আলো করে এসেছে। অফিসে সাতদিনের ছুটি নিয়ে এই তো সেদিন দীঘার সমুদ্র সৈকতে হনিমুন করে এলাম। কলকাতায় ফিরে অফিসে জয়েন করে আমার চক্ষুস্থির। দু থেকে তিনমিনিট সময় লেগেছিল মেয়েটিকে চিনতে। একটা

টাইপরাইটার সামনে নিয়ে বসে আছে। উঁহু ঢেপসা ফাঁপা শরীর নেই। অঘ্রানের লাউ ডাঁটার মতন নধর আঁটোসাটো লম্বা কাঠামো। নারকেল ছোবড়ার মতন ঝুরঝুরে লাল চুলের বদলে শ্রাবণের ঘন মেঘের মতন স্তূপস্তূপ কালো চুল মাথায়। পাঁচ বছরে এত পরিবর্তন! এবং আস্তে আস্তে দেখলাম অনেক দিন থেকেই বদলে গেছে নগেন কোবরেজের মেয়ে। লায়লা জানত একান্ত করে ওটা ওরই অফিস। পরিচিত কেউ ছিল না তো। হঠাৎ আমাকে দেখে ভ্রূ চোখ কপালে তুলল। তারপর যেন চিনল। তার পর আমার চোখে চোখ রেখে, কি বলব, একটা লোভন-হাসি হাসল। প্রত্যুত্তরে আমিও ঠোঁটের আগায় হাসলাম। ছুটির পর বাসায় ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আবার ঠিক সেই হাসিটা দুই ঠোঁটের মাঝখানে ফুটিয়ে তুলি। অর্থাৎ হাসিটা কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে সেটাই আমার দ্রষ্টব্য ছিল। দেখলাম ওটার নাম দেখন-হাসি। অর্থাৎ অনেকদিন পর তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি—লায়লাকে বোঝাতে গিয়ে তখন অফিসে আমি এই হাসি হেসেছিলাম। হাসিটা ভালই হয়েছিল।

জামাকাপড় ছাড়া নেই, মুখ হাত ধোয়া নেই, চা-জলখাবার খাওয়া নেই—ঘরে ঢুকেই ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আমি হাসছি। দেখে মধুমিতা অবাক। কি ব্যাপার? দু পা সামনে এসে গিন্নী প্রশ্ন করল। আমি লায়লার কথা বললাম। বোকা মেয়েটা আমাদের অফিসে ঢুকেছে। শুনে গিন্নী আড়ষ্ট হয়ে গেল। লায়লাকে সে কোনোদিন চোখে দেখেনি। কিন্তু লায়লার সব বোকামির গল্প সে শুনেছিল। স্টেজে নেমে পার্ট ভুলে গিয়ে ওই মেয়ে কেমন করে হাসত, পরে গ্রীনরুমে ঢুকে কাঁদত, হার্ডল-রেসে ছুটতে গিয়ে আছাড় খেয়ে তার হি-হি হাসি, তারপর মাঠ ছেড়ে উঠে এসে কান্না। পরীক্ষায় ফেল করে হাসি, পরে কান্না। দীঘার ঝাউবনে বসে গিন্নীর গায়ে গা ঠেকিয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে আর দশরকম গল্পের সঙ্গে লায়লার গল্পও করেছি। শুনে মধুমিতা হেসে কুটিকুটি হত।

সেই লায়লা আমার অফিসে ঢুকেছে শুনে গিন্নী প্রথমটা আড়ষ্ট, তারপর আতঙ্কিত হয়ে উঠল। স্বাভাবিক। চিন্তা করলাম। ফটিকচাঁদ মিত্তির লেনের মেয়ে লায়লা। আমিও ও পাড়ায় ছিলাম। কুড়িবছর সেখানে কাটিয়ে এসেছি। লায়লার মত আমিও বাটারফ্লাই ক্লাবের মেম্বার ছিলাম।

একসঙ্গে খেলাধুলা করেছি, একসঙ্গে থিয়েটার। সেই মেয়ে আমার অফিসে আমার পাশে বসে কাজ করবে এ তো ভাল কথা নয়।

আমি মধুমিতাকে বোঝাই, বোকা অপদার্থ—অকর্মার ঢেঁকি। ওর দৌড়

তুমি জান। কোনোদিন কোন কাজে নেমে শেষ রক্ষা করতে পারেনি। থিয়েটার খেলাধুলা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা—সব ব্যাপারে ফেল করেছে। সুতরাং অফিসের কাজকর্ম কতটা চালাতে পারবে ও, একবার চিন্তা কর—চালাতে পারবেই না।

কি কাজ ?

টাইপ করা—টাইপিস্ট ও। বললাম।

হায়ার-সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় ফেল করা মেয়ে মধুমিতা বলল, ওই বিদ্যা নিয়ে কি করে সে তোমাদের এতবড় অফিসে ঢুকল ?

পরের বছর পাস করেছিল, বললাম, সম্ভবত সেবার ভাল করে টুকতে পেরেছিল।

আমার কথা শুনে গিন্নী হাসল না। বলল, তা না হয় টুকে পাস করল, তা বলে এদিনে একটা চাকরি বাগানো তো চাট্টিখানি কথা নয়।

সম্ভবত পেছনে মামার জোর ছিল, উত্তর করলাম। গুম হয়ে থেকে একটু ভাবল মধুমিতা। তারপর বলল, পেছনে মামার জোর থাক কি মেসোর জোর —কাজ চালাতে না পারলে অফিসে চাকরি রাখা ওর পক্ষে মুশকিল হবে। সত্যি কিনা ?

—একশবার। তৎক্ষণাৎ একটা মিষ্টি হাসি গিন্নীকে উপহার দিলাম। বললাম, আমাদের মুখার্জির অর্থাৎ বড়সাহেবের কেমন একখানা কড়া মেজাজ তোমাকে অনেকদিন বলেছি। কত হুঁশিয়ার হয়ে সারাক্ষণ কাজকর্ম করতে হয় আমাদের। কাজে ভুল করলে রক্ষা নেই। পরদিনই চাকরি নট।

এবং যা আশঙ্কা করেছিলাম। ভুল ভুল। রোজ লায়লা টাইপ করতে ভুল করছে। বড়সাহেবের চিঠিপত্র দেখেশুনে ঠিকঠাক করে দিতে হয় আমাকে। তারপর টাইপিস্টকে দিয়ে সব টাইপ করিয়ে সাহেবের ঘরে নিয়ে যাই। সাহেব সই করে দিলে সেগুলি ডেস্পাচে পাঠাই। কিন্তু কি বলব, এক একটা চিঠি টাইপ করে লায়লা যখন আমার টেবিলে পাঠায়—দেখে আমার মাথা খারাপ হতে বাকি থাকে। আটটা দশটা করে ভুল। তক্ষুনি কাছে ডেকে আঙুল দিয়ে তাকে ভুলগুলি দেখাই। দেখার সঙ্গে সঙ্গে টুসটুসে গোলাপী জিভটা আধখানা বের করে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে লায়লা। তারপর কালো ডাগর চোখ তুলে মিটিমিটি হাসে। এমন সুন্দর করে হাসা অনেকদিন দেখিনি। এই বোধ করি মদির হাসি, ভাবলাম। মনমজানো হাসি। তৎক্ষণাৎ ফটিকচাঁদ মিস্তির লেনের কথা মনে

পড়ল। উঁহু, এমন তো কথা ছিল না। এই ভুল সেই ভুল করার পর তুমি আগে হাসবে, তারপর কাঁদবে। এখন সেসব কিছুই দেখছি না। আমার দিকে মুখ তুলে মন-মজানো হাসিটা সে হেসেই চলেছে। আমি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিই। তখন চিন্তা করি, অনেক কিছু ওর বদলে গেছে। চুল চেহারা পোশাক। পিটপিটে চোখ দুটি এখন দীঘির মতন বিশাল হয়েছে। মেনিকিউর করা হাতের ম্যাড়মেড়ে ফ্যাকাসে নখ পলার টুকটুকে রং ধরেছে কাজেই হাসির ধরন-ধারণও পাল্টে গেছে। হাসির পর হাসিই আসছে। কান্নার ছিটেফোঁটা নেই।

যাই হোক, ওই মদির হাসি আমাকে কাবু করতে পারল না। বেশ কড়া করে বললাম, রোজ এমন ভুল টাইপ করলে এখানে তোমার চাকরি রাখা দায় হবে। আমার কথা শুনে লায়লা তখন ঠোঁটে না হেসে চোখে হাসতে লাগল। চোখে হাসা কথাটা আগে কেবল শুনতাম, এখন চাক্ষুষ দেখছি। আমার বকুনি খেয়ে, কি বলব, লায়লার চোখ রোদ লাগা দীঘির জলের মত ঝলমল করছিল। অর্থাৎ চাকরি থাকল কি গেল তা নিয়ে যেন তার মোটে মাথাব্যথা নেই। বরং কাজে ভুল করেছে বলে আমি যে কড়া কথা শোনাচ্ছি, তাই দেখে সে কৌতুকবোধ করছে। এবং ঝকমকে চোখে তাকিয়ে থেকে আমাকে বোঝাতে চাইছে—এত সুন্দর শরীর সুন্দর মুখের মেয়েকে কেউ কড়া কথা শোনায় তার ধারণা ছিল না। আমাকে দিয়ে এই জিনিস প্রথম দেখে তার ভিতর থেকে একটা আহ্লাদ উপচে পড়ছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে একটা অসম্ভব কিছুকে আমি সম্ভব করে তুলেছি।

যেন হেরে গিয়ে চুপ করে থাকি। ঘাড় গুঁজে ভুলগুলি সংশোধন করতে থাকি। তার পর একটা একটা করে চিঠিগুলি ওর হাতে ফিরিয়ে দেই। লায়লা নতুন করে সব টাইপ করে আমার টেবিলে এনে জড় করে। তখন সাড়ে পাঁচটা বাজে। সাহেবকে দিয়ে সই করিয়ে এনে একটা চিঠিও ডেস্পাচে পাঠাবার সময় থাকে না। তবু যা-হোক করে সামলে সুমলে নেই, আর মনে মনে বলি, যদি সাহেব এসব জানতে পারে, নির্ঘাত আমার কৈফিয়ৎ তলব করবে। তখন কি আমি বলব যে এই টাইপিস্টকে দিয়ে কাজ চলবে না সাহেব—নতুন টাইপিস্ট নাও? পরদিন থেকে যে লায়লা বেকার হবে। তারপর কোথায় চাকরি পাবে! মামার জোর মেসোর জোর—সে তো আমার ও মধুমিতার মনগড়া কথা।

এদিকে রোজ গিন্নী আমার বাড়ি ফেরার পথ চেয়ে বসে থাকে।

কি হল! আজ কটা ভুল করল? ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রশ্ন।

একগাদা, গাল ছড়িয়ে হেসে উত্তর করি। শুনে মধুমিতার মুখে তৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ে। ওটাকে আজও কেন তাড়িয়ে দিচ্ছে না তোমার সাহেব ?

দেবে ঠিকই, একটা দেঁতো হাসি হেসে বলি, দু একটা দিন সবুর কর।

দু একদিন না। পরদিনই ব্যাপারটা ঘটে। তার মানে পরশু বিকেল। বিষ্যুৎবারের বারবেলায়।

সকালের দিকেই একসঙ্গে তিনটে চিঠি লায়লাকে টাইপ করতে দিই। লাঞ্চের আগে শেষ করতে হবে। পই পই করে বলে দিলাম, জরুরী চিঠি, আজকের ডাকে না পাঠালে নয়।

মিষ্টি হেসে দুবার ঘাড় নাড়ল লায়লা। কিন্তু কোথায়। লাঞ্চের আগে একটা চিঠিও টাইপ করা শেষ হয় না। যেন এক একটা চিঠি টাইপ করার পর পাঁচটা সাতটা করে ভুল থেকে যাচ্ছে, যেন নিজেই ভুলগুলি ধরতে পেরে আবার মেশিনে কাগজ চড়িয়ে নতুন করে টাইপ করছে। দেখতে দেখতে লাঞ্চ আওয়ার এসে যায়। আমার চোখের সামনে দিয়ে মুখার্জি হোটেলে খানা খেতে গটগট করে বেরিয়ে গেল।

কি হল ! শেষ করতে পারলে ? আমার টেবিল থেকে গলা বাড়িয়ে শুধাই। লায়লা তখন ঠোঁটের কোণায় চমৎকার চিকন হাসি হাসল। হয়ে যাবে, আজকের ডাকেই পাঠাতে পারবেন। এত চিন্তা করছেন কেন ? আমার দিকে চোখ না ফিরিয়ে সে উত্তর করল। খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে নিচে নেমে যাই। রাস্তায় দাঁড়িয়ে নুন মাখান বাতাবী লেবু ও শসা দিয়ে টিফিন করি। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে খানিকটা পায়চারি। তারপর ঘড়ি দেখে ওপরে উঠে আসি। সিঁড়ির গোড়ায় সাদা গাড়ি দেখে টের পাই খানা খেয়ে সাহেব ফিরেছে। চেয়ার টেনে টেবিলে বসতে গিয়ে এদিক ওদিক তাকাই। লায়লাকে দেখছি না। আধখানা চিঠি টাইপ হয়ে মেশিনের মাথায় ঝুলছে। বাকি কাগজগুলি পাশের সবুজ বাস্কেটে ফ্যানের হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে।

তারপর ? মধুমিতা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে ঘটনার আদ্যন্ত গিন্নীকে খুঁটিয়ে বলছিলাম।

তারপর আর কি, বললাম, দুটো বাজে, আড়াইটে বাজে—তিনটে বাজল, লায়লার দেখা নেই। ছোকরা বেয়ারাটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করি দিদিমণি কোথায় ? দিদিমণি বাথরুমে গেছে। উত্তর শুনে চোখ কপালে ওঠে। অ্যাঁ, বেলা তিনটে থেকে একটা মানুষ বাথরুমে বসে আছে ! বুঝলাম সেদিনকার

মতন নগেন কোবরেজের মেয়ে পালিয়েছে। ফ্রেঞ্চ লীভ? এখন উপায়? মাথাটা গরম হয়ে গেল। ছোঁ মেরে ওর বাস্কেটের সব কাগজপত্র তুলে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম। মুখার্জিকে বলে আজই একটা হেস্তনেস্ত করতে হয়। এই টাইপিস্টকে শিগগির তাড়াও সাহেব, নয়তো অফিস ডুববে। সাহেবের এয়ারকনডিশন ঘরের কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়াই।

কেন! মধুমিতা ভুরু কুঁচকোল। ভেতরে ঢুকতে সাহস পেলে না?

দুটো হাসি শুনলাম তখন সাহেবের ঘরে। দুরকম হাসি। গিন্নীর চোখে চোখ রেখে বললাম, কাজেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটা অবিকল ছুঁচোর মতন কিচকিচে গলার হাসি।

আর একটা?

যেন শুকনো ময়দার ডেলা হড়হড় করে গলা দিয়ে বেরোচ্ছে—এমন মোটা হাসি।

ওটা মুখার্জির, মধুমিতা বলল, তোমার সাহেবের গলা। আর ছুঁচোর হাসিটা তোমাদের টাইপিস্ট লাবলা ঠাকরুণের।

তাই বুঝি? বড় বড় চোখ করে গিন্নীর মুখ দেখি।

হ্যাঁ গো মশাই, তাই। ছুঁড়ি ঠিক বুঝে গিয়েছিল, এত ভুলচুক করে চাকরি রাখা যাবে না। তুমি একদিন সাহেবের কাছে কমপ্লেন করবে! টের পেয়ে আগেভাগেই মুখার্জিকে হাত করে ফেলেছে, সাহেবের মন মজিয়েছে। তাই বাথরুমের নাম করে তিন ঘণ্টা ওঘরে বসে গল্প করে।

আমি চুপ।

তারপর, তুমি কি করলে? মধুমিতা চোখা চোখে আমাকে দেখল। হাবার মতন দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলে?

না না। দুটো হাসি শুনে আমার বেদম হাসি পাচ্ছিল। পেট ফেটে যায়। পুশিং ডোর ঠেলে সড়াৎ করে ভেতরে ঢুকে পড়ি। ইচ্ছে ছিল মুখার্জির ঘর কাঁপিয়ে প্রচণ্ড শব্দ করে হাসব। হল না। গলার কাছে আটকে থেকে হাসিটা ডুগডুগির মতন বাজতে লাগল।

তারপর? সাহেব নিশ্চয় চটে গেল!

উঁহু, আমায় দেখে মুখের গর্তটা গোল করে আরো বেশি হাসছিল। হাসতে হাসতে বলল, আপনি দেখছি গাধার মতন হাসছেন সুব্রতবাবু।

তুমি তখন কী বললে? মধুমিতা চোখ দুটো বড় করল।

আমিও ছেড়ে কথা কইনি। আপনি স্যার ভল্লুকের মতন হাসছেন। বললাম।

এই রে। সাহস তো তোমার কম না। যেন গিন্নী খুশি হল। তারপর?

মুখার্জি তখন আড়চোখে লায়লাকে দেখল। মুখার্জির পিঠে হাত রেখে মুখার্জির চেয়ারের হাতলের ওপর ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে লায়লা গাঙুলী হাসছিল। আমাকে দেখে নেমে দাঁড়াল। মুখার্জি আমার চোখে চোখ রেখে বলল, মিস গাঙুলীর হাসিটা আপনার কিরকম লাগল শুনি?

চমৎকার! বললাম, অবিকল ছুঁচোর মতন।

এই রে! মধুমিতা আবার চোখ পাকাল। লায়লা চটে গেল না তোমার কথা শুনে?

উঁহু, মুখটা আরো বেশি ছুঁচোর মতন করে হাসতে লাগল। মুখার্জিও হাসছিল। তৎক্ষণাৎ চোখের ইশারায় একটা চেয়ার দেখিয়ে আমাকে বসতে বলল। আমি বসলাম। লায়লাও আর একটা চেয়ারে বসল। কলিং বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডেকে মুখার্জি কফি কাজুবাদাম আনাল। তিনজনে গল্প করতে করতে খেলাম।

তারপর?

ছুটি হতে বাড়ি চলে এলাম।

মধুমিতা তখন খোঁৎ করে নাকে হাসল। এমন করে কোনদিন তাকে হাসতে দেখিনি। হাসিটা রহস্যের মতন ঠেকল। আমার দিকে তাকাল না সে। ছাদের দিকে চোখ তুলে বলল, এটা আমি সন্দেহ করছিলাম। অফিসে বসে তোমরা কাজ করছ না—তুমি, তোমার সাহেব। একটা মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি করছ। না হলে ওই অকর্মার ঢেঁকিকে ওখানে পুষছ! অফিস থাকল কি ডুবল তাতে তোমার বা তোমার মুখার্জি সাহেবের কিছু আসে যায় না। যায় কোম্পানির যাবে।

কথাটা কি ঠিক হল? আস্তে, বললাম।

একশবার ঠিক হয়েছে। গিন্নী আর হাসল না। ফোঁস করে নাকের একটা শব্দ করল। বলল, এমন একটা বিচ্ছিরি রাগারাগি ব্যাপার ঘটল, আর তিনজনে মিলে কিনা হেসে গল্প করে কফি কাজুবাদাম, খাওয়া হল। ব্যাস সব মিটমাট হয়ে গেল।

আমি চুপ।

তোমরা তিনটি এক গাঙের মাছ জুটেছ ওখানে। বদের শিরোমণি। রাগে কাঁপতে কাঁপতে মধুমিতা সামনে থেকে সরে গেল।

তারপর রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে হুসহাস কান্না, বিলাপ। আমার মরে যেতে ইচ্ছা করছে, বেঁচে থেকে লাভ কি, আমি সুইসাইড করব ইত্যাদি। কাঠ হয়ে বিছানার একপাশে শুয়ে থেকে রাত কাটাই। ভাবি, গিন্নীর ঐ কান্নার সঙ্গে তখনকার অদ্ভুত নাকী হাসিটার যোগ আছে। যেমন কান্নার আগে লায়লা একদা হাসত।

পরদিন, মানে গতকাল অফিসে যাইনি। ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি সর্দি কাশি মাথা কনকন গা-হাত-পা ব্যথা। মধুমিতা আমার সঙ্গে একটাও কথা কইছিল না। আজ সকালে উঠে যদিও রান্নাবান্না করেছে। আমিও দাড়ি কামিয়ে চান করে ভাত খেয়ে যথারীতি অফিসে বেরোব—অফিসের পিওন বাড়িতে চিঠি নিয়ে হাজির। কার চিঠি? খাতায় সই করে খামের মুখ ছিঁড়ে দেখি সাহেবের চিঠি। তলায় মুখার্জির সবুজ কালির জমকালো সই। কি ব্যাপার? ও মাসের পয়লা থেকে আমাকে আর অফিসে যেতে হবে না। আজ মাসের ত্রিশ। তক্ষুনি গিন্নী ছুটে এসে হাতের জল হলুদের দাগ আঁচলে মুছে চিঠিটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে এক শ্বাসে পড়ে ফেলে। তারপর আমাকে সেটা ফিরিয়ে দেয়। দিয়ে খিলখিল হাসে। খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে, এই আমি চাইছিলাম—আঃ, আজ থেকে আমি নিশ্চিন্তি। বোকা হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি। হাসতে হাসতে গিন্নী হাততালি দিয়ে নাচতে শুরু করল। তখন আমিও হাসি। কারণ দেখলাম মধুমিতার জলতরঙ্গ হাসির সঙ্গে মেঘতরঙ্গ নাচের সঙ্গে তাল দিয়ে দিয়ে বাড়িভাড়া রেশন হরিণঘাটার দুধ ইলেকট্রিক বিল মুদিখানা ধোবাখানা কাগজওয়ালা মায় মোড়ের সিগারেটের দোকান হাততালি দিয়ে নাচতে আরম্ভ করেছে, হাসতে আরম্ভ করেছে। সব কটা হাসি আমি চোখে দেখছিলাম কানে শুনছিলাম আঙুল দিয়ে ছুঁতে পারছিলাম। তখন নাচতে নাচতে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি। তারপর সেই কখন থেকে চৈত্রের খরায় ময়দানে দাঁড়িয়ে পাঁজরা ঝাঁঝরা করে হা-হা-হা-হা হাসছি।

হার

আবার শব্দটা শুনল সে। বাইরে, ঠিক তার জানালার নিচে, অতসী ঝোপের কাছে একটা কালো পাথর আছে। সেই পাথরের বুক থেকে শব্দ উঠে আসছে। একটা না, অনেকগুলি শব্দ, ছোট ছোট, একটার পিঠে আর একটা, যেন চমৎকার মিল রেখে ছন্দ রেখে কেউ একটা শব্দের কবিতা তৈরী করছে, আর সেই কবিতা তার কানে ভেসে আসছে।

ঘরে আলো জ্বলছে। জানালাটা বন্ধ। বন্ধ করে দিতে হয়েছে তাকে। তাই কল্পনার চোখে উঠোনটা দেখছিল সে। বাইরেটা এতক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। খুব অন্ধকার কি, এই তো সন্ধ্যা হয়েছে, তা হলেও সে এখানে বসে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, অতসী গাছগুলির কাছে, পাখির পালকের মতন শব্দ না করে একটু একটু করে অন্ধকার ঝরে পড়ছে, সকলের আগে কালো পাথরটা অন্ধকারে ডুবে গেছে, তারপর অতসী ঝোপের চারদিকের বাঁশের বেড়া, তারপর—

আর জলের ওপর, সন্ধ্যার অন্ধকারে কালো জলের বুকে যেমন একটি পদ্ম ভাসে, বাতাসে একটু একটু নড়ে, তেমনি তার জানালার ঠিক নিচে অন্ধকার পাথরটার কাছে অতসীবন ঘেঁষে একটি মানুষ নড়ছে, কাঁপছে। কাঠ কাটার সময় পিঠ নড়বে মাথা কাঁপবে কোমরে ঝাঁকুনি লাগবে জানা কথা।

তার ভয়ানক ইচ্ছা করছিল জানালার পাল্লা দুটো ফাঁক করে উঁকি দিয়ে অন্ধকারে ফুলের মতন, আলোর পিণ্ডের মতন কিছু একটা একবার দেখে নেয়। শুধু কল্পনায় কতক্ষণ ভাল লাগে।

কিন্তু উপায় নেই। কটমট করে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আর একজন যে এদিকে তাকাচ্ছে পরিষ্কার সে টের পাচ্ছিল। হ্যাঁ, ঘাড় ঘুরিয়ে এদিকে তাকাচ্ছিল আর থেকে থেকে উপদেশামৃত বর্ষণ করছিল পঞ্চাশোত্তর মানুষটি। গুরুগম্ভীর গলার স্বর হিমাদ্রিবাবুর। তার পিতৃদেব। কিন্তু এ সময় কোনদিনই তিনি ঘরে থাকেন না। বড় নালার ধারে জগদীশবাবুর বৈঠকখানায় রোজ সন্ধ্যায় দাবার আড্ডা বসে। কাজ থেকে বাড়ি ফিরে অথবা

কোন কোনদিন বাড়িও ফেরা হয় না—ঘরে ফেরার আগেই রাস্তায় জগদীশবাবুর বৈঠকখানায় ঢুকে হিমাদ্রি দাবার আড্ডায় বসে যান। খেলা শেষ করে ঘরে ফিরতে রাত দশটা এগারোটা বাজে। এই নিয়ে বাবাকে কতদিন কথা শুনিয়েছে সে : 'একে তো ডেইলী প্যাসেঞ্জারী করছ, সকাল আটটায় ছাইভস্ম মুখে গুঁজে চাকরি করতে ছুটছ কোলকাতা। তা না হয় বুঝলাম, ধবধবে গোবিন্দপুর এসে বাড়ি করেছ, ডেইলী প্যাসেঞ্জারী করা ছাড়া উপায় কি, কিন্তু সময় মত ঘরে ফিরে একটু বিশ্রাম করবে তো, জলটল খাবে—সারাদিন খাটুনি —না, রাস্তায় আসতে আসতে অমনি বসে গেলে দাবা খেলতে, কিসের জামা-কাপড় ছাড়া, বিশ্রাম করা মুখ হাত ধোয়া ; এদিকে আমি তোমার জন্য চিঁড়ে ভিজিয়ে রাখি কলা এনে রাখি—উপদেশও বটে শাসনও বটে। ছেলের বকুনি খেয়ে হিমাদ্রি সলজ্জ হেসে সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়েন, 'না না, আর এমন হবে না নীলু—কাল থেকে আর ওখানে—'

কিন্তু দেখা গেছে, পরদিনও একই অবস্থা। ক্লান্ত ধূসর মানুষটির ঘরে ফিরতে রাত এগারোটা বেজে গেল। আর তখন রাগ করে ছেলে বলল, 'চিতায় না ওঠা পর্যন্ত তোমার এই রোগ সারবে না, এই পাজী নেশা—সারাদিন ঘাড় গুঁজে অফিসে কলম পেষা, তারপর আবার কিনা সেই ঘাড় গুঁজে একগাদা মানুষের নিশ্বাসের মধ্যে বসে দাবার চাল নিয়ে মাথা ঘামানো, না একটু খোলা হাওয়া গায়ে লাগানো, না নিরিবিলি বসে একটু বিশ্রাম করা, ডায়বেটিজে ধরবে তোমাকে, প্রেসারের দোষ তো রয়েছেই, এমন খিটখিটে শরীর, টি বি হবে না তোমার তাই বা কে জানে—'

'না, কাল থেকে আর নয়—' হিমাদ্রি ঘাড় নেড়ে তৎক্ষণাৎ শপথ করেছেন এবং পরদিন আবার ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন থেকে নেমে ঘরে না ফিরে সোজা ঢুকে পড়েছেন। জগদীশের বৈঠকখানায়। ভয়ানক ঘিঞ্জি ভিতরটা। তার ওপর মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে একটা হারিকেন জেলে একগাদা মানুষ বসে আছে দাবার ছক ঘিরে। তারা অবিশ্রাম কাশছে হাসছে, তর্ক করছে, যুদ্ধ করছে—চালে ভুল হলে এক একদিন তো হাতাহাতি আরম্ভ হয়ে যায়। আর মুহুর্মুহু কাঠি জেলে বিড়ি ধরানো, ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার, যদি হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ সেখানে উঁকি দিয়েছে তো তার দম বন্ধ হয়ে এসেছে। এমন কতদিন হয়েছে নীলাদ্রির। বাবাকে খুঁজতে—খোঁজা আর কি—জানা কথা হিমাদ্রি ট্রেন থেকে নেমেই বড় নালার ধারের আমতলায় সেই নরকের আসরে ভিড়ে

গেছেন—তাই ফুটবল খেলা সেরে তাঁকে ঘরে ডেকে নিয়ে যেতে প্রায়ই নীলাদ্রিকে জগদীশের সেই টালির ঘরটার দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরে উঁকি দিতে হয়েছে। এতগুলি মাথার মধ্যে বাবার ছোট রোগা মাথাটা কোনদিকে লুকিয়ে আছে খুঁজে নিতে অত্যন্ত বেগ পেতে হয়েছে তাকে, আর যেন তখন বিড়ির ধোঁয়া ঘামের গন্ধ গরম শ্বাস প্রশ্বাসের একটা অস্বস্তিকর হল্কা এসে নীলাদ্রির নাক মুখ চেপে ধরেছে, তার চোখ জ্বালা করে উঠেছে, মাথাটাও ঝিমঝিম করতে আরম্ভ করেছে। বাবাকে দেখা পাওয়ার পর সে কিন্তু আর চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে না থেকে তৎক্ষণাৎ বাইরে ঘাসের ওপর নেমে এসে আগে খানিকটা খোলা বাতাস নাক দিয়ে টেনে নিয়েছে তারপর চেঁচিয়ে 'বাবা' 'বাবা' করে ডেকেছে। ভিতর থেকে হিমাদ্রিও 'হুঁ' 'হ্যাঁ' 'এই যে' 'যাই যাচ্ছি' ইত্যাদি বলে সাড়া দিয়েছেন কিন্তু উঠে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার নামও করেননি। ঘরে ফিরেছেন সেই রাত দশটা এগারোটা বাজিয়ে। একদিনও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি।

তাই ভাবছে এখন নীলাদ্রি। টেবিলে হারিকেনটা জ্বলছে। সামনে ফিজিক্স বইয়ের পাতা খোলা। কিন্তু বইয়ের পৃষ্ঠায় চোখ দুটো ধরে রাখলেও পাঠ্য বিষয়ের দিকে কিছুতেই মনঃসংযোগ করতে পারছে না সে। তার কান দুটো এই দুদিনে অত্যন্ত ধারালো হয়ে উঠেছে, কানের পর্দা দুটো তেজী হয়ে উঠেছে। জানালার বাইরে অন্ধকার পাথরের বুক থেকে উঠে আসা মৃদু অথচ কবিতার মতন সুন্দর শব্দটা যেমন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে সে তেমনি ঘরের ভিতর পিতৃদেবের গুরুগম্ভীর গলার উপদেশবলীও শুনে যাচ্ছিল। ছাত্রানাং অধ্যয়নম তপঃ—এখন শুধু লেখাপড়া নিয়েই তুমি থাকবে, এই তোমার তপস্যা, এই তোমার সাধনা—অন্য কোন কিছুর দিকে মন দেওয়া—'

কথাগুলি শুনতে শুনতে সে ঘেমে উঠছিল। এই জন্যই বুঝি সন্ধ্যাবাতি লাগার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে হিমাদ্রি চোখ ঘুরিয়ে সকলের আগে দেখে নিয়েছেন পুবের জানালাটা খোলা কি বন্ধ। নীলাদ্রি অবশ্য জানালা বন্ধ করে পড়তে বসেছে, কালও বন্ধ রেখেছিল, কিন্তু পরশু খোলা ছিল। হিমাদ্রি মাথা নেড়েছিলেন: 'না, ওটা বন্ধ করে দাও নীলু, জানালাটা বন্ধ রাখাই ভাল। তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, কঠিন কঠিন বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করছ, তাও আবার সামনে এগজামিন—কাজেই তোমার এখন কতটা একাগ্রতা কতটা নিষ্ঠা নিয়ে পড়াশুনা করা দরকার, আমাকে নিশ্চয় আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। অনার্স পেতে হলে—'

আর অধিক বুঝিয়ে বলতে হয়নি নীলাদ্রীকে। তার আগেই সে বুঝে গিয়েছিল। নিঃশব্দে জানালার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিয়েছিল। কি জানি যদি দমকা হাওয়ায় ভেজানো পাল্লা খুলে যায়, তাই পরক্ষণে ছিটকিনিটাও তুলে দিয়েছিল সে। হিমাদ্রি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

শাস্ত্রের কথা—প্রাপ্তেতু ষোড়শবর্ষে—ষোল বছর কেন, উনিশে পা দিয়েছে ছেলে, বি এসসি পড়ছে—পড়াশোনায় ভাল, বরাবর ভাল রেজাল্ট করে এসেছে, কিন্তু তা হলেও তো তরুণ যুবক, ঘরে পা দিয়েই ছেলেকে যে অবস্থায় (টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে খোলা জানলাটার দিকে চোখ রেখে) বসে থাকতে দেখেছিলেন তাতে হিমাদ্রি অতিমাত্রায় শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। এবং রুষ্টও হয়েছিলেন কম না। কিন্তু সেই জন্য তিনি চোখ গরম করেননি বা গলার স্বরে খুব একটা বিরক্তিও প্রকাশ করেননি—বরং শান্ত থেকে মিষ্টি কথায় তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। মিত্রের মতন আচরণ করেছিলেন হিমাদ্রি। তাতে সুফলই পেয়েছিলেন। 'দক্ষিণের দুটো জানালা তো খোলাই রয়েছে'—জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে ছেলেকে তিনি আরও বুঝিয়েছিলেন, 'আমাদের এ-ঘরের দরজা দুটোও বড় মাপের, কাজেই ওদিকের ওই একটা জানালা বন্ধ থাকলেও বিশেষ অসুবিধা হবার কথা নয়—ভেতরে যথেষ্ট হাওয়া খেলে।'

মাঠে খেলাধুলা করে এসেছিল নীলাদ্রি। প্রচুর ঘাম ছিল। তা-ও তো রোজ যেমন করে, খেলার পর খুব সাবান টাবান মেখে স্নান করেছিল। তাতে ঘাম নিঃসরণের মাত্রা আরও বেড়ে গিয়েছিল। ঘাম রুখতে শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রচুর পাউডারও ছড়িয়ে দিয়েছিল সে। হয়তো ঘরে ঢুকে হিমাদ্রি সর্বাগ্রে এটাই লক্ষ্য করেছিলেন। যৌবনদীপ্ত সুঠাম গৌর দেহে কত না পাউডারের ছড়াছড়ি। যেন একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়েছিল হিমাদ্রির।

না, বাবার কথা মতন পুবের জানালা বন্ধ করে দিয়ে নীলাদ্রি সেদিন অতঃপর কোন্ জানালা দিয়ে ঘরে হাওয়া ঢুকবে সে কথা মোটেই চিন্তা করছিল না। অবাক হয়ে হিমাদ্রির অসময়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনের কথাই সে ভাবছিল। আগের দিনও এমন হয়েছে। দাবা খেলার নেশাটা রাতারাতি বাবা বর্জন করতে পারলেন। প্রথমে নীলাদ্রি মনে করেছিল জামা কাপড় ছেড়ে একটু জলটল খেয়ে পরে হয়তো তিনি বড় নালার ধারের সেই টিনের ঘরের আড্ডার দিকে পা বাড়াবেন, নীলাদ্রি তাই করতে বলেছিল। কিন্তু তা হল না। দক্ষিণের জানালার পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে তিনি সকালের খবর কাগজখানা উল্টে

পাল্টে দেখতে লাগলেন। পরদিনও কর্মস্থল থেকে ফিরে এসে হিমাদ্রি ঘরে বসেই কাটালেন। সেই জানালা। দক্ষিণমুখো। ওখানেই হিমাদ্রির খাট। অর্থাৎ চেয়ারে না বসে ইচ্ছা করলে খাটে শুয়ে বসেও তিনি বাইরেটা দেখতে পারেন, ফুরফুরে হাওয়া গায়ে মুখে লাগাতে পারেন। এবং ওদিকের দুটো জানালা খুলে রাখলে নীলাদ্রির পড়ার টেবিলের কাছের জানালাটা অনায়াসে বন্ধ রাখা চলে—ঘরে হাওয়া চলাচলে কোন বিঘ্ন ঘটে না।

সত্যি, হাওয়া নয়, হিমাদ্রির বিস্ময়কর পরিবর্তন নীলাদ্রিকে ভাবিয়ে তুলেছে। দাবার আড্ডা তো ছেড়েছেনই, যে মানুষ চৌদ্দ বছরে গায়ে সাবান মাখত না চুল কাটত না দাড়ি কামাত না, সেই মানুষ কদিন ধরে রোজ সাবান মেখে স্নান করছে দাড়ি কামাচ্ছে এবং বেশ ভাল করে চুলটিও ছেঁটে ফেলেছে। আর জামাকাপড়। নীলাদ্রি বলে বলে হয়রান হত, কিছুতেই ময়লা গেঞ্জিটা শার্টটা বাবার গা থেকে খসাতে পারত না। আজ, এই চার ছ'দিনের মধ্যে পোশাক-আসাকের ব্যাপারে ভদ্রলোক কী ভীষণ খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছেন। যেন রোজই ধোপদুরস্ত কিছু গায়ে না চড়াতে পারলে অস্বস্তিবোধ করেন। অথচ নীলাদ্রি কতদিন চিন্তা করত, এমন ময়লা পোশাক পরে বাবা এত বড় একটা অফিসে চাকরি করতে যান কি করে—তা-ও তো সাধারণ পোস্ট নয়—বড়বাবু, বড় সাহেবের ঘরে মুহুর্মুহু যাঁর ডাক পড়ে—ময়লা জামা জুতো দেখে সাহেব কি চটেমটে বাবাকে কড়া কিছু শুনিয়ে দেন না? তারপর নীলাদ্রি ভেবেছে, হয়তো সাহেব এইজন্য কিছু বলেন না, একটানা তেত্রিশ বছরের সার্ভিস বাবার, হিমাদ্রি ঘোষালের একনিষ্ঠ সেবার কথা চিন্তা করে সাহেব নিশ্চয় তাঁকে ক্ষমা করেন। তা বড় সাহেব না হয় ক্ষমা করলেন, কিন্তু অফিসের অন্য কর্মচারীরা কী ভাবে—বাইরের আর পাঁচটা মানুষ হিমাদ্রিবাবুর পোশাকের দিকে তাকিয়ে কী সব বলাবলি করে চিন্তা করে নীলাদ্রি ভয়ানক সঙ্কুচিত হয়ে পড়ত।

এখন কেতাদুরস্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরোন বাবা। আবার যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন ধোয়া গেঞ্জিটি ইস্ত্রি করা পায়জামাটি পরে থাকা চাই। স্নানের সময় ভাল তেল সাবান, স্নানের পর আরশি চিরুনি, স্নানের আগে দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম—সব হাতের কাছে রেডি না থাকলে হিমাদ্রি হুলুস্থূল বাধিয়ে দেন—চাকরবাকর তো বটেই, নীলাদ্রিকেও কম গালাগাল খেতে হয় না। তা না হয় খেল, ঘরে মা নেই, বছর দুই আগে তিনি স্বর্গে গেছেন, নীলাদ্রির ভাইবোন কেউ নেই, কাজেই বাবার সুখ-সুবিধার দিকে তাকে চোখ রাখতেই হবে। রেখেছেও সে,

বড় হয়েছে, নিজের কর্তব্য সম্পর্কে খুবই সচেতন। কিন্তু অন্য সুখ-সুবিধা যেমন হোক, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রসাধন ইত্যাদির ব্যাপারে হিমাদ্রি আজ তাঁর এই বাহান্ন বছর বয়সে উনিশ বছরের যুবক নীলাদ্রিকেও বুঝি হারিয়ে দিতে চাইছেন। রঙিন রুমাল টাই ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছেন। সাদা টুইলে আর মন উঠছে না, এক জোড়া টেরিলিনের শার্ট তৈরী করিয়ে এনেছেন। মান্ধাতা আমলের মেটে রঙের ফ্রেম পাল্টে কালো মোটা শেল্‌এর চশমা পরেছেন। প্যাণ্টের সঙ্গে সরু মাথার জুতো। তাঁর টেবিলে ধুলো ময়লায় মাখামাখি হয়ে এক খণ্ড ভগবদ্গীতা এক শিশি হজমী বড়ি একটা দাঁত ভাঙা চিরুনি ও কিছু শুকনা নিমের দাঁতন-কাঠি বছরের পর বছর পড়ে থাকতে দেখা গেছে। আজ হঠাৎ সেখানে দামী আয়না চিরুনি স্নো পাউডার সুগন্ধ তেলের শিশি দেখা গেল। নীলাদ্রি যেমন অবাক হল তেমনি ভিতরে ভিতরে খুশিও হল এবং একটু হাসল।

তা না হয় বুড়ো বয়সে বাবার বাবুগিরি করার শখ জেগেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি নীলাদ্রির ব্যাপারে এতটা সচেতন হয়ে উঠলেন কেন। তার পড়াশোনা চলাফেরা খাওয়া ঘুম হাঁটা হাসি—যেন সবকিছুর মধ্যে কিছু না কিছু দোষ ত্রুটি খুঁজে পাচ্ছেন হিমাদ্রি এবং এইজন্য তাঁর দুশ্চিন্তারও যেন শেষ নেই। ছেলেকে সংশোধন করতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাই দুবেলা উপদেশ। একবার সকালে ঘুম থেকে উঠে। যতক্ষণ না অফিসে বেরোন। আর একবার আরম্ভ হয় বিকেলে, বাড়ি ফিরে এবং সেই উপদেশ রাত্রে শোয়া পর্যন্ত অবিশ্রাম চলতে থাকবে। অবশ্য সবই নীলাদ্রির ভবিষ্যৎকে কেন্দ্র করে। তাকে বড় হতে হবে মানুষ হতে হবে। দশজনের একজন হতে হলে এখন থেকে তার এই করা উচিত, এভাবে চলা উচিত, এই এই নিয়মগুলি না মেনে চললে জীবনে অশেষ দুর্গতি ভোগ করতে হবে এবং সব উপদেশের সার কথা হল 'ছাত্রজীবন বড়ই কঠিন সময়। লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র স্বাস্থ্য মন ঠিক এসময়ে গড়ে না উঠলে—' ইত্যাদি।

যেন ইদানীং, এই কদিনে হিমাদ্রি ছেলেকে চিনতে আরম্ভ করেছেন। যেন নীলাদ্রিও বাবাকে বুঝতে আরম্ভ করেছে। যেন আগে এ জিনিসের তেমন দরকার পড়ত না। যদি একজন আর একজনের কাছে কিছুটা অস্পষ্ট দুর্বোধ্যও থেকে যেত তো এই নিয়ে তারা বিশেষ মাথা ঘামাত না। এখন দুজনেই মাথা ঘামাবার প্রয়োজনবোধ করছে। একজনের দিকে আর একজনের প্রখর দৃষ্টি। তাই কি?

হয়তো তাই। বাড়িতে নূতন মানুষ এসেছে। এই জন্যই কি ছেলের পড়াশোনা চরিত্র-গঠন সংযম শিক্ষা স্বাস্থ্য নিয়ে এত কথা বলতে আরম্ভ করেছেন হিমাদ্রি।

এবং নীলাদ্রিও চুপ থেকে দেখছে, বাবা বদলে গেছেন, দাবা খেলার নেশাটা একেবারে চলে গেছে, সেজেগুজে কাজে বেরোন এবং যতক্ষণ বাড়িতে তখনও পারপাটি পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে ভালবাসছেন।

কলকাতা থেকে বেশ কিছুটা দূরে বলে সস্তায় জমিটা পেয়েছিলেন হিমাদ্রি। আট কাঠার একটা প্লট। নিজেদের শোবার বসবার ঘর, রান্নাঘর, স্নানের জায়গা, পায়খানা এবং ছোটখাট একখানা বাগানের মতন করেও অতিরিক্ত একফালি জমি বেঁচে যাবার পর হিমাদ্রি আর একখানা ঘর তুলে ফেললেন। এটারও টালির ছাদ। সঙ্গে বাথরুম এবং রান্নার জায়গা রয়েছে। যদি ভাড়া দেওয়া যায় তো মাস মাস কিছু আসবে, এই মতলব নিয়েই ঘরখানা তৈরী করা। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য হিমাদ্রির আশা পূর্ণ হয়নি। মাস তিন চার খালি পড়ে থাকার পর সম্প্রতি ওই ঘরে মানুষ এসেছে। মাত্র দুটি প্রাণী। মা আর মেয়ে। ভদ্রলোকের নাকি ঘোরাঘুরির চাকরি। আজ বারাসত কাল জলপাইগুড়ি পরশু বর্ধমান, আর একদিন এক ধাক্কায় আসাম—সেটা ডিব্রুগড় হবে কি সদিয়া আগে থাকতে বলা মুশকিল।

কাজেই ভদ্রমহিলা স্থিতি চাইছেন, অন্তত কিছুদিন এক জায়গায় বিশ্রাম। একটা আকাশের নিচে থেকে সূর্যোদয় দেখবেন সূর্যাস্ত দেখবেন, পাখির ডাক শুনবেন, রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে টিপটিপ শিশির পড়ার শব্দ। সারাজীবন কত 'বিছানা বাঁধ আর ট্রেনে চাপ' করা যায়। হিমাদ্রির বেগুন ক্ষেত ঝিঙে মাচা দেখে মহিলা খুশি হলেন, হাঁস মুরগি দেখে মুগ্ধ হলেন। টালির ঘরটা তাঁর মনে ধরে গেল।

সাঁইত্রিশ আটত্রিশ বয়স হবে, হিমাদ্রি অনুমান করল, মেয়ের সতেরো আঠারো। এবং মাথায় দুটিতে সমান। এবং দুজনই অপূর্ব সুন্দরী। দীর্ঘ সুছাঁদ গড়ন। তাই মনে হয় দুটি গোলগাল ভরা ভরা মুখ তো নয়, যেন লম্বা ডাঁটার মাথায় দুটি সূর্যমুখী ফুল ফুটে রয়েছে। দপদপ করছে গায়ের রং। হঠাৎ তাকালে চোখ ঝলসে যায়, মনে হয় একটু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মাথা ঝিমঝিম করবে।'

অবশ্য দুদিন দেখে দেখে চোখ দুটো সয়ে গেল, কিন্তু আশঙ্কা বেড়ে গেল হিমাদ্রির। একটি যৌবন যদি স্থির প্রশান্ত, আর একটি যৌবন চঞ্চল অস্থির।

তাই তো হবে, আঠারো ও আটত্রিশে যে অনেক ব্যবধান, অনেক সূর্যোদয় হয়েছে মাঝখানে, অনেক সূর্যমুখী ফুটেছে। ফুটেছে ঝরেছে আবার ফুটেছে। তাই বহু ফোটার আনন্দ নিয়ে একজন যদি মগ্ন মৌন পরিতৃপ্ত গম্ভীর আর একটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে কেবল নূতন ফুটে ওঠার আবেগ অস্থিরতা কম্পন শিহরণ।

সব নূতনই বুঝি এমন। চঞ্চল অশান্ত। বসন্তের নূতন পাতা, শেষ গ্রীষ্মের প্রথম মেঘ, যৌবনোদ্গতা হরিণী। সারাক্ষণ ছুটেও যার ক্লান্তি নেই অবসাদ নেই। ছুটতে ছুটতে কোথায় যাবে শেষ পর্যন্ত দিশা হারিয়ে ফেলে।

এই জন্যই হিমাদ্রির বেশি ভয়।

দুদিন নীলাদ্রিকে ডেকে ঘরে নিয়ে এসেছে।

এর মধ্যেই একদিন দেখা গেছে ডালপালা ও ঝুড়ি ঝুড়ি সবুজ পাতার ভিতর কখনও গলা কখনও মাথাটা গলিয়ে দিয়ে দু হাতে টেনে টেনে কাঁচা আতাগুলি ছিঁড়ছে ও টুপটাপ আর একজনের কোঁচড়ের মধ্যে ফেলছে।

অর্থাৎ একজনকে সন্তুষ্ট করতে গাছের কাঁচা ফল নষ্ট করতেও ছেলে ইতস্তত করছিল না।

কাল কি করেছিল। সেদিন আর বাড়ির সামনের দিকের বাগানে নয়। নীলাদ্রি বুঝে গিয়েছিল বাবা এখন প্রত্যহ সন্ধ্যা লাগতে বাড়ি ফিরছে। তাই দুটিতে চলে গিয়েছিল পিছনে। ওদের টালির ঘরটার ওপাশটায়। তুলসী আর বাসকের জঙ্গলে ভরে আছে জায়গাটা। কী খেলা! এর-নামই কি প্রথম যৌবনের লীলা চাপল্য। যেভাবেই হোক, উঠোনে পা দিয়েই হিমাদ্রি টের পেয়েছিল। হয়তো একটা চাপা হাসি তখন কানে এসেছিল। পা টিপে টিপে খানিক দূর অগ্রসর হবার পর দৃশ্যটা তাঁর চোখে পড়ে। অন্ধকার ঝোপের ভিতর দুটি আবছা মূর্তি। খেলাটা প্রথম বুঝতে পারেনি হিমাদ্রি। স্থির হয়ে একটু সময় দাঁড়িয়ে থাকার পর অবশ্য ব্যাপারটা আর বুঝতে কষ্ট হয়নি। নীলাদ্রি হাত বাড়িয়ে খপ করে একটা জোনাকি পোকা ধরছে, আর একজন সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে সেই সবুজ আগুনের ফুলকি তুলে নিয়ে কখনও মাথার চুলে কখনও শাড়ির ভাঁজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে খিলখিল করে হাসছে। যেন পোকার ফুল দিয়ে অঙ্গ সাজিয়ে যুবতীর পুলকের সীমা নেই। আর এ-কাজে হিমাদ্রি-নন্দনের কী অসীম উৎসাহ।

কান দুটো গরম হয়ে গিয়েছিল হিমাদ্রির। ছেলেমানুষী বলে জিনিসটা

উড়িয়ে দিতে পারত যদি তুটির বয়স দশ থেকে বারোর মধ্যে হত, কিন্তু এখানে তা নয়।

কিন্তু তখনই কোনরকম হাঁক ডাক বা চিৎকার করা যুক্তিসঙ্গত মনে করল না হিমাদ্রি। তেমনি পা টিপে টিপে ঘরে ফিরে এল। বলেছিল পরে, নীলাদ্রি যখন ঘরে এসেছে। তাও পড়াশোনার কথাই বেশি বলেছিল ছেলেকে, প্রসঙ্গক্রমে ছাত্রজীবনের সংযম রক্ষা ও চরিত্র গঠন সম্পর্কে কিছু কিছু উপদেশ। না, বাসক ঝোপের অন্ধকারে খেলার কথাটা হিমাদ্রি সরাসরি উল্লেখ করেনি। সেটা তা হলে আঙুল দিয়ে আগুন দেখিয়ে দেওয়ার মতন হত। তাতে ফল উল্টো হত। যাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছিল তার ভিতরের আগুন আরও দাউ-দাউ করে উঠত। হিমাদ্রিও একদিন উনিশ বছরের যুবক ছিল।

আজ অবশ্য নীলাদ্রিকে সন্ধ্যার পর আর বাইরে দেখা যায়নি। তা হলেও যেভাবে ওদিকের জানালাটা খুলে রেখে গায়ে পাউডার ছড়াচ্ছিল। ঘরে ঢোকার সময় হিমাদ্রি আর একটি চঞ্চল প্রাণীকে দেখে এসেছিল। ঠিক নীলাদ্রির জানালার নিচে বেণী তুলিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে কয়লা ধরাবার কাঠ কাঠছিল। যেন হিমাদ্রির এত বড় উঠোনে কাঠ কাটার আর জায়গা ছিল না। বেছে বেছে তার ঘরের জানালার ধারের ওই কালো পাথরটা। কিন্তু ভিতরের ক্রোধ ও বিরক্তি হিমাদ্রি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেনি। ঠাণ্ডা গলায় ছেলেকে জানালা বন্ধ করে এগজামিনের পড়া তৈরী করতে উপদেশ দিয়েছিল। বাইরে শব্দ হচ্ছে, কোন রকম শব্দ বা গোলমাল কানে এলে যে পড়াশোনায় ব্যাঘাত জন্মে ছেলেকে তা-ও বুঝিয়েছিল।

নীলাদ্রি বুঝতে পারছিল বৈকি। তাই এক কান দিয়ে সে যেমন পিতৃদেবের উপদেশ শুনছিল তেমনি আর এক কান খাড়া রেখে কাঠ কাটার শব্দ শুনছিল। তার দু কানই অত্যন্ত ধারালো হয়ে উঠেছিল।

হ্যাঁ, তার কান এবং বাবার নাক। হিমাদ্রির ঘ্রাণেন্দ্রিয় এই কদিনে যে প্রবল হয়ে উঠেছে নীলাদ্রি বেশ টের পাচ্ছিল। স্বাভাবিক। এখানে আসার পরদিনই ভদ্রমহিলা পুঁইচচ্চড়ি রান্না করে একবাটি এ ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ বাড়িওয়ালাকে ভেট দিয়েছিলেন। পরম তৃপ্তির সঙ্গে হিমাদ্রি ব্যঞ্জনটি খেয়েছিলেন এবং যেন সেদিন বিকেলেই ওঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পঞ্চমুখে মহিলার রান্নার প্রশংসা করে এসেছিলেন। প্রশংসা শুনে হেমনলিনী নিশ্চয় খুশি হয়েছিলেন। তারপর থেকে প্রায় রোজই আলু পটলের ডালনাটা ঝিঙে-পোস্তর তরকারিটা

কুমড়োর ঘণ্টটা—নিদেন কলমি শাকটা করলা ভাজাটা আসছে। মাছ মাংস না। এদিনে মাছ মাংস কটা মানুষই বা খেতে পারে। আর সাধারণ জিনিসই যদি হাতের গুণে এমন সুখাদ্যে পরিণত হয় তো মাছ মাংসের দরকারই-বা কি।

তাই দেখা যাচ্ছে, টালির ঘরে দুবেলা রান্না চাপলে এ ঘরে হিমাদ্রি জোরে জোরে শ্বাস টানেন এবং বিড়বিড় করে বলেন, ভারি চমৎকার গন্ধ আসছে। যেন চমৎকার গন্ধটা আর একটু বেশি করে পাবার লোভে দক্ষিণের জানালা দুটো খুলে রাখেন। রান্নার গন্ধ যেমন পাওয়া যায় তেমনি রাঁধুনীকেও সেখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। এই জন্যই বুঝি হিমাদ্রি দুবেলাই সেজেগুজে জানালার ধারে বসে থাকেন। দাবার আড্ডার কথা আজ ভুলেও বাবার মনে পড়ে না। তাই তিনি যখন চরিত্র সংযম সুনীতি নিয়ে উপদেশের পর উপদেশ দিতে থাকেন তখন নীলাদ্রি লুকিয়ে লুকিয়ে হাসে।

'কলেজে যাওনি?'

'মাথাটা টিপটিপ করছে।' নীলাদ্রি অল্প হাসল। কিন্তু কাবেরী হাসল না। মুখখানা শুকনো দেখাচ্ছে। আগের দিনও নীলাদ্রি কলেজ থেকে পালিয়ে এসেছিল। বলেছিল, গা ম্যাজ ম্যাজ করছে। কিন্তু কেন পালিয়ে এসেছিল বুঝতে কাবেরীর কষ্ট হয়নি। তাই ফিক করে হেসে ফেলেছিল। আজ সে ভয়ানক গম্ভীর।

পেয়ারা তলার ছায়ায় এসে দু'জন দাঁড়িয়েছে। ভাদ্রের গনগনে দুপুর চারদিক চুপচাপ। কাকটিও ডাকছে না। গাছের পাতাগুলি নিথর।

'মা কি করছে?' ফিসফিসে গলায় নীলাদ্রি প্রশ্ন করল।

'ঘুমোচ্ছে।' কাবেরী চোখ ঘুরিয়ে একবার তাদের টালির ঘরটা দেখল। তারপর আবার চুপ করে রইল।

'এত গম্ভীর কেন, ভীষণ শুকনো দেখাচ্ছে!' কাবেরীর একটা হাত মুঠোর মধ্যে তুলে নিল নীলাদ্রি।

'মনটা ভাল না।' কাবেরী ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল।

'কি হয়েছে শুনি?' তার হাতে মৃদু চাপ দিল নীলাদ্রি। সারাক্ষণ রৌদ্র লাগা শিশিরের মতন যার চোখের তারা ঝলমল করছে, ফোটা ফুলের মতন সারা মুখে হাসি লেগে আছে তাকে আজ এমন বিমর্ষ নিস্তেজ ফ্যাকাসে দেখে নীলাদ্রি বিচলিত হল। এমনটা সে আশা করেনি। কলেজ কামাই করেও কিছু ফল হল

না। এত যার মন খারাপ তার সঙ্গে কী নিয়েই বা গল্প করবে, কতক্ষণ গল্প করবে! 'মা বকেছেন বুঝি?'

কাবেরী মাথা নাড়ল।

'কি করেছিলে—ঘরের কাজকর্ম কিছু ফেলে রেখেছিলে?' নীলাদ্রি ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করল।।

কাবেরী এবার লম্বা নিশ্বাস ফেলল। নীলাদ্রির চোখের ভিতর তাকাল। তারপর চুপ করে রইল।

'তা মা বকেছেন বলে এত মন খারাপ করার কি আছে।' সান্ত্বনার গলায় নীলাদ্রি বলল, 'বাবা মা যতদিন আছেন বকবেনই, দরকারেও তাদের বকুনি খেতে হয় অদরকারেও খেতে হয়। আমার পড়াশোনা নিয়ে বাবা কি আমায় কম বকেন, কম কথা শোনান রাতদিন—কই আমি তো মোটেই মন খারাপ করি না। এক কান দিয়ে শুনি আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।' যেন নীলাদ্রি হি হি করে হাসবার একটা সুন্দর ভঙ্গি করল।

'তা নয়।' কাবেরী এবারও গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। 'পড়াশোনার জন্য বকুনি খাওয়া বা ঘরের কাজ নিয়ে বকুনি খাওয়া এক জিনিস—'

'তবে কি নিয়ে তোমার মা বকেছিল শুনি!' নীলাদ্রির চোখ দুটো হঠাৎ ছোট হয়ে গেল। সারা মুখে একটা চিন্তার ছাপ জাগল। যেন উত্তরটা শুনতে শ্বাস বন্ধ করে রাখল সে।

'কাল সন্ধেবেলা ওদিকের ঝোপের ভিতর দাঁড়িয়ে আমরা দুজন জোনাকি ধরেছিলাম—তাই।' কাবেরীর গলার স্বর অভিমানে থমথম করছিল।

'কিন্তু তিনি তো তখন ঘরে বসে আটা মাখছিলেন, কখন দেখলেন আমাদের?' নীলাদ্রি রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'মা দেখতে পায়নি—তোমার বাবা দেখে ফেলেছিলেন।'

'হুঁ তারপর?' নীলাদ্রির মুখের পেশী শক্ত হয়ে উঠল।

'আজ সকালে তাই নিয়ে তোমার বাবা অফিসে বেরুবার মুখে মার কাছে নালিশ করে গেলেন—তুমি তখন বাড়ি ছিলে না।'

'না, ওপাড়ার পরেশের কাছে আমি একটা বই আনতে গিয়েছিলাম।' একটু সময় চুপ করে রইল নীলাদ্রি। যেন কি চিন্তা করল। তারপর হাতের মুঠ দুটো শক্ত করে ফেলল। 'বুঝলে—' যেন এবার দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলছিল সে, 'বুড়ো আমার পেছনে ভীষণ লেগেছে, আমার পেছনে তোমার

পেছনে, যতক্ষণ ঘরে আছে—এখন তো দুবেলা ঘর ছেড়ে কোথাও নড়ছেই না, সারাক্ষণ আমাকে জানালাটা বন্ধ রাখতে বলছে, পাছে আমি তোমাকে দেখে ফেলি, তুমি আমায় দেখে ফেল। উঃ, এক এক সময় যা রাগ হয় লোকটার ওপর!'

'আর মা, আমার মা-ই কি কম হিংসে করছে আমাকে—তোমার সঙ্গে কখনো কথা বলছি কি তোমাদের ঘরের দিকে তাকাচ্ছি দেখলে যেন তার গা-জ্বালা আরম্ভ হয়—বুড়ীর মুখ দেখলেই আমি বুঝতে পারি।'

নীলাদ্রি চুপ করে রইল।

এত মন খারাপ থাকা সত্ত্বেও কাবেরীর ঠোঁটের কোণায় আস্তে আস্তে একটা বাঁকা হাসি উঁকি দিল।

'অথচ তারা দুজন বেশ কথাটা যা বলছে কিন্তু—তোমার বাবা তো ফাঁক পেলেই আমাদের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়—মার সঙ্গে রীতিমত গল্প জুড়ে দেয়।'

'আমার চোখ আছে, সবই দেখছি—তোমার মা একটা কিছু রান্না করলেই বাটি ভরে বাবাকে এনে দিয়ে যাচ্ছে, রোজ এই কাণ্ডটা করছে, আমি বলব, এই ক'দিনেই দু'জনের মধ্যে পীরিত বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছে। তুমি কি জিনিসটা অস্বীকার করছ?'

'মোটেই না।' কাবেরীর নাকের ছিদ্র দুটো ফুলে উঠল, মার বকুনি খেয়ে তার ভিতরে যে যথেষ্ট রাগ জমে আছে বোঝা গেল। 'তোমার বাবা যতক্ষণ ঘরে থাকে, দক্ষিণের ওই জানালাটা দিয়ে আমাদের রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে থাকে, মাকে দেখে, আর মা-ও এমন, তখন কিছুতেই ওই জায়গাটি ছেড়ে নড়বে না, আমাকে কিছুতেই রান্নাঘরে ঢুকতে দেবে না।'

নীলাদ্রি একটা শুকনো হাসি হাসল।

'সবই লক্ষ্য করছি—রীতিমত জামাইবাবুটি সেজে আমার পিতৃদেব এখন ওই জানালাটির ধারে বসে থাকেন, অথচ তোমাদের আসার আগে মহারাজের গায়ের গন্ধে ভূত পালাত, জীবনে কোনদিন গায়ে সাবান মেখে দেখেনি, চুল কাটত না, দাঁড়ি কামাত না—আর ময়লা কুটকুটে জামা কাপড়, ওই নিয়েই অফিস করেছে, হাট বাজার করেছে, দাবা খেলেছে—দাবার আড্ডা থেকে রাত এগারোটার আগে একদিনও ঘরে ফেরার নাম করত না—আজ তোমরাও এ-বাড়ি এসেছ, রাতারাতি মানুষটা বদলে গেল—এখন বাবুর সাজসজ্জার বাহার কত—ডেইলী সাবান মেখে স্নান করা চাই।'

'আর আমার মা! কোনদিন পায়ে আলতা পরতে দেখিনি। এখানে এসে জিনিসটা নতুন দেখছি, অথচ বাবা কত বলত, কিছুতেই রাজী করাতে পারত না, আলতা পরার কথা উঠলেই মা ভুরু কুঁচকে বলত এখন এ-সব কেন, সন্তানের মা হলে মেয়েদের এসব মানায় না। এখন? কেবল কি আলতা, কাল বিকেলে দেখি চোখে কাজল পরেছে—আমার এমন হাসি পাচ্ছিল, বুড়ো বয়সে মহিলা, এসব আরম্ভ করেছেন কী, ফাঁক পেলেই আমার পাউডারের কৌটো খুলে গলায় পিঠে এত এত পাউডার ঢালছে।'

শুকনো হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে নীলাদ্রির মুখের পেশী আবার কঠিন হয়ে উঠল।

'আর আমরা একটু কথা বলেছি কি একত্র হয়েছি দেখলেই দুজন রেগে তেতে আগুন—এদিকে দুটিতে দিব্যি তলে তলে প্রেমের খেলা চালাচ্ছে।'

'উঃ আজ আমায় মা কী না বলল, এমন মেয়ে পেটে ধরাই অন্যায় হয়েছে, আঁতুড়ে নুন খাইয়ে মেরে ফেলা উচিত ছিল, পরের ছেলেকে নষ্ট করছি, ভাল ছেলেটার মাথা খাচ্ছি'—কাবেরীর দু চোখ ছলছল করে উঠল।

'সব ওই আমাদের ঘরের বুড়োটার জন্যে—যা তা লাগিয়েছে তোমার মার কানে—যেটুকু দেখেছে তার শতগুণ বাড়িয়ে বলেছে।' নীলাদ্রি হাতের মুঠ শক্ত করল। 'যদি বেশি বাড়াবাড়ি করো তো আমিও দেখে নেব।'

'আমি চুপ করে থাকব না—মা যদি আমার সঙ্গে এমন হিংসুটেপনা করতে থাকে তো আমিও এর শোধ তুলব—সহজে ছেড়ে দেব না।' উত্তেজনায় কাবেরীর বেণী খুলে গেল, পিঠময় কালো চুলের ঢল নামল। অপলক চোখে তাকিয়ে ছিল নীলাদ্রি। রৌদ্রে পৃথিবী ঝিমঝিম করছিল। কাকটাও শব্দ করছিল না।

হিমাদ্রি খেতে বসেছে। চৌকাঠের কাছে হেমনলিনী দাঁড়িয়ে। মোটা ফরসা ধবধবে শরীর। মনে হচ্ছিল জায়গাটা আলো করে রেখেছে। আর সেই সুবৃহৎ আলোর তুলনায় হিমাদ্রির পাতের কাছে হারিকেন বাতিটাকে মনে হচ্ছিল একটা পোকা টিমটিম করে জ্বলছে। উপমাটা মনে হতে হিমাদ্রি ঘাড় তুলে চাঁদের মতন উজ্জ্বল উন্নত সুন্দর মানুষটিকে আর একবার দেখল, কুণ্ঠিত গলায় বলল, 'ইস্ কত দিয়েছেন—এত খাওয়া যায়!'

'কিছুই দেওয়া হয়নি, কী দিয়েছি আপনাকে, একটুখানি তরকারি।' মন্থর গলায় হেমনলিনী হাসল।

'না, না, অনেকটা।' থালার পাশে নামিয়ে রাখা বাটিটা এক নজর দেখে হিমাদ্রিও হাসল। 'আপনি বললে কি হবে, মনে হয় যা রান্না করেছেন, তার প্রায় সবটাই আমার জন্যে নিয়ে এসেছেন।'

'ছি ছি, কথা শোন।' হেমনলিনী চৌকাঠ ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। 'মাছ না মাংস না, একটুখানি ধোঁকার ডালনা, তা-ও আপনার চোখে বেশি ঠেকছে।'

'ধোঁকার ডালনাই অমৃত—আপনার যা রান্নার হাত।' ঘাড় গুঁজে বাটি থেকে তরকারি তুলে হিমাদ্রি মুখে দিল। 'হাত তো নয়—যেন চিনি দিয়ে গড়া কিছু—'

'তবেই হয়েছে।' চোখ বড় করল হেমনলিনী, ভ্রূভঙ্গি করল। 'চিনির হাতের জ্বালা আছে, সময় সময় পিঁপড়ের কামড় খেতে হয়।'

মৃদু হেসে হিমাদ্রি ভাতের গরাস চিবোতে লাগল।

'খোকা কোথায়?' খাটো গলায় হেমনলিনী প্রশ্ন করল। 'ওঘরে পড়া শুনছি না যেন।'

'ধ্যান করছে হয়তো।' হিমাদ্রি জলের গেলাসের জন্য হাত বাড়াল। 'কদিন ধরে দেখছি সামনে বই খুলে রেখে চুপ করে মাঝে মাঝে একটা কিছুর ধ্যান করছে।'

'আজ যেন কলেজ কামাই করল দেখলাম!' মৃদু গলায় হেম বলল এবং একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে হিমাদ্রির দিকে তাকাল।

'আমি শুনেছি। অফিস থেকে এসে ভোলার মুখে শুনলাম। বাবুর মাথার যন্ত্রণা হয়েছিল।' হিমাদ্রি ভাতের থালার ওপর ঝুঁকে পড়ল। ভোলা তাঁর চাকরের নাম। হেমনলিনী চুপ করে রইল।

'মেয়ে কি করছে।' হিমাদ্রি হঠাৎ চোখ তুলে প্রশ্ন করল। 'শব্দটব্দ পাচ্ছি না যেন?'

'অভিমান করেছে। সন্ধ্যা থেকে বিছানা নিয়েছে। বলছে, খাবে না, খিদে নেই।'

'কিছু বলেছিলেন নাকি?'

'কি আর বলব—তেমন করে কি মেয়েকে কিছু বলা যায়, বলার আগেই তো রাগের জ্বালায় ফোঁস ফোঁস করতে আরম্ভ করে।'

'মুশকিল!' হিমাদ্রি ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। 'আমারও ঐ একই বিপদ, এই তো বয়েস ছেলের, রক্ত গরম, সারাক্ষণ টগবগ করে ফুটছে, চঞ্চল অশান্ত মন—বেশি কিছু বলতে গেলে কখন কি করে বসে—বুঝতে পাচ্ছেন না?'

মাছি

ঘূর্ণি হাওয়ার মতন খবরটা ছড়িয়ে পড়ল।

মাছি এসেছে। মাছি ফিরে এসেছে। মাছি আবার এসেছে মানুষকে জ্বালিয়ে মারতে।

পাড়াটা সচকিত হয়ে উঠল। আবার উপদ্রব, দস্যিপনা।

খবরের সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ংকর দুষ্টু চেহারা সকলের চোখের সামনে ভেসে উঠল। ছোট্ট একটা মুখ। মাথাভর্তি লালচে শুকনো খাড়া খাড়া চুল। তেল নেই চিরুনি পড়ে না। কিন্তু তার জন্য কি? সারাদিন ধুলোমাটি বালিকাঁকর ছানাছানি। নয়তো কাদামাটি। কাদাগোলা জল। কখনো তা মানুষের গায়ে এসে ছিটকে পড়ছে, কখনো নিজের গায়ে উঠছে, গায়ে মাথায় মুখে। ভূত সেজে মানুষকে ভূতের ভয় দেখাবার খেলা।

তবু যদি একটা খেলা নিয়ে সে ঠাণ্ডা থাকল।

হাজারটা খেলা তার মাথার ভিতর সারাক্ষণ বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে। রেন্-পাইপের মুখে পর পর কয়েকটা থান ইঁট ঢুকিয়ে রাখার খেলা, ঢিল মেরে জানালার কাচ ফাটিয়ে দেওয়ার খেলা, বাগানের ফুল চুরি করে সেই সঙ্গে গাছটি উপড়ে রেখে আসার খেলা, গাড়ি আসছে—রাস্তার ওপর সার করে ইঁট বিছিয়ে দাও। গাড়িটা ওপরের দিকে উঠে যাবে, নয়তো আচমকা ব্রেক কষে গুলি খাওয়া বাঘের মতন ঘোঁৎ করে উঠবে। এমন মজার খেলা দুটো আছে নাকি।

কিন্তু সব খেলাই দুদিন। তারপর পুরোনো হয়ে যায়। নূতন খেলা চাই, নূতন খেলা দেখাও।

অন্ধ ভিখিরি লাঠি ঠুক্‌ঠুক করে এক জায়গায় ঘুরছে। পথ ঠিক করতে পারছে না। হাত ধরে তাকে খানাখন্দ নর্দমায় নামিয়ে দাও, ময়লা জলে চুবোনি খেয়ে উঠুক। কুকুরটার ল্যাজের সঙ্গে এক ছড়া কালি পটকা বেঁধে আগুন ধরিয়ে দাও। ঠাস্ ঠাস্ করে পটকা ফুটবে আর কাঁইকাঁই আওয়াজ করে বাছাধন কুকুর কেমন দৌড়াতে আরম্ভ করে একবার তাকিয়ে দেখ। এই খেলার তুলনা হয় না যে। ঘুড়ির বদলে এক ডজন গঙ্গাফড়িং বেঁধে দাও না লাটাইয়ের সুতোর আগায়। কেমন সাঁইসাঁই করে ফড়িং-ঘুড়ি আকাশে উড়ে যায় পরখ করতে দোষ কি।

বানরের মতন পিটপিট করছে চোখ ছুটো। একটা দুষ্টামি হজম করতে না করতে আর একটা দুষ্টামি মাথায় এসেছে। রৌদ্রে ঘুরে ঘুরে মুখপোড়া বানরের চেহারা ধরেছে। ঘামের ফোঁটা ঝুলছে ভুরুতে। জুলপি বেয়ে কালি গোলা জলের মতন ময়লা ঘামের স্রোত নেমে আসছে। তাই তো, মাছির বিশ্রাম কোথায়।

রোজ স্কুল পালাচ্ছে। কোন গাছে পাখির ছানা দেখে এসেছে। দুপুরের গনগনে রোদ মাথায় নিয়ে পাখির ছানা চুরি করতে গাছে উঠছে। বাগানের পেয়ারা ডাঁশা হয়েছে, কাঁটাঝোপ ভেঙে পিছনের পাঁচিল ডিঙিয়ে বাগানে ঢুকছে।

স্কুলে মাস্টারমশায়ের হাতে বেদম মার খায়, বাড়িতে বাবা মারছে মা মারছে; দিনরাত তাদের বকুনি দাঁত খিচুনি অভিসম্পাত, হ্যাঁ অভিসম্পাতও দিচ্ছে তাঁরা, এমন বাঁদর ছেলে বেঁচে থেকে লাভ কি, মরে যাক, তাদের হাড় জুড়োবে, পাড়ার মানুষ হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। চব্বিশ ঘণ্টা মানুষ এসে বাড়িতে নালিশ করবে, মাছি এই করেছে, মাছি এই করল। লজ্জায় আশুবাবু, আশুবাবুর স্ত্রী মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারেন না।

তাই তো, কত ভালোমানুষ আশুবাবু নিজে, তাঁর স্ত্রী। কত ভদ্র অমায়িক তাঁদের ব্যবহার। তাঁদের ছেলে—একটি তো সন্তান, এমন বিচ্ছু ডানপিটে বদমাশ—এক ফোঁটা একটা মানুষ, কত বয়স হবে। বারো? তেরো? হাড় কালি করে দিচ্ছে ভদ্রলোকের, তাঁর স্ত্রীর। সব মানুষ কিছু ভদ্র না অমায়িক না, মুখচোরা লাজুকও না। তা ছাড়া কতদিন উৎপাত সহ্য করবে তারা, আর উৎপাত তো একটা না, নিত্য নূতন দুষ্টামি ছেলের মাথায়। কাজেই তারা হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছে। ছেলেকে শাসন করুন, ছেলেকে সামলান। এক রত্তি ছেলেকে কণ্ট্রোল করতে পারছেন না, আশ্চর্য তো! ভাত বন্ধ করে দিন না, হাত পা বেঁধে খাটের তলায় ফেলে রাখুন। কেউ কেউ আরো বেশি উগ্র প্রখর মারমূর্তি হয়ে ছুটে আসছে। হ্যাঁ আপনার ছেলে, ঐটুকুন দুধের বাচ্চার পেটে এত শয়তানি! আমাদের ছেলে এমন করলে কেটে জলে ভাসিয়ে দিতাম; না, আমাদের ছেলেকে এতটা বড় হতেও দিতাম না, আঁতুড়ে মেরে ফেলতাম। জানেন, কাল জগদীশবাবুর গ্যারেজের পিছনে লুকিয়ে আপনার নন্দন বিড়ি খাচ্ছিল। উঃ, এই ছেলে পাড়ায় থাকলে আর দশটা ছেলের মাথা খাবে।

তাই তো, আর একজন সায় দিয়েছে, ছোট ছেলেরা অতশত বোঝে না,

তাদের বুঝবার ক্ষমতা নাই, এক জায়গায় থাকলে মিশবেই, একত্র খেলাধুলাও করবে, কিন্তু যা দেখছি শুনছি, এই ছেলের সঙ্গে আর পাঁচটি ছেলেকে মিশতে দেওয়া বিপজ্জনক। কোমলমতি শিশু সব, তাদের মন এখনও কাদার মতো নরম, চোখের সামনে যা দেখবে তাই শিখবে, খারাপটাই তাড়াতাড়ি শেখে এই বয়সে, চট করে মনের ওপর খারাপ ছাপ পড়ে যায়। অথচ এখন সৎ জিনিস সুন্দর জিনিস শেখার সময় তাদের।

ছেলের জন্য বাইরে মুখ দেখানো মুশকিল হয়ে পড়েছিল আশুবাবুর। তিনি কি এখান থেকে সরে যাবেন, পাড়ার পাঁচজনের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে অন্য জায়গায় চলে যাবেন? নিজের সন্তান, ফেলবেন কোথায়, কাজেই চেষ্টাচরিত্র করে অন্য কোন অঞ্চলে বাড়িটাড়ি দেখে তাঁকেই—এখানেও তো ভাড়া বাড়িতেই আছেন—

পাড়ার মানুষ নিজেদের রকে বসে বৈঠকখানায় বসে আলোচনা করছিল। এমন দিনে অভাবিত ঘটনা ঘটল।

আশুবাবু যেমন ছিলেন থেকে গেলেন, তাঁর স্ত্রীও থাকলেন। ছেলেটিকে দেখা গেল না।

মাছি নাই। কোথায় তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোথায় গেল আপনার ছেলে? কেউ কেউ প্রশ্ন করল। বিনীত হেসে আশুবাবু উত্তর করলেন, তার মামার কাছে। কোথায় থাকে মামা? বদলীর চাকরি, কখনো রাঁচি কখনো দেরাদুন, কিছু ঠিক থাকে না।

কিন্তু একটা জিনিস ঠিক থেকে গেল। এক মাস কাটল, দু মাস কাটল—ছ মাস, পুরো একটা বছর কেটে গেল। মাছি ফিরে এল না। আর দেখা গেল না সেই বিচ্ছু বদমাশ ছেলেটাকে। 'গাছের বানর' 'ক্ষুদে শয়তান' 'হাড়বজ্জাত'—অনেক নামকরণ হয়েছিল ওইটুকুন ছেলের।

কদিন কেমন খালি খালি লাগল পাড়ার রাস্তা রক মাঠ বাগান। সব ছেলেকে দেখা যায়, তারা খেলাধুলা করছে, হৈ-হৈ করছে ছুটোছুটি করছে, যেমন আগে করত, কিন্তু একটি মুখ আর দেখা যায় না। একজন অনুপস্থিত।

এই অনুপস্থিতিটা চোখে লাগার মতন, মনে রাখার মতন।

মাছি নাই, তার অর্থ আর ঝগড়াঝাটি মারামারি কান্নাকাটি নাই, নালিশ নাই, অভিভাবকদের ছুটোছুটি নাই, অভিযোগ নাই।

মাছি নাই, তার অর্থ বাগানের ফুল বাগানে ফুটছে, সেখানেই ঝরছে।

গাছের ডাঁশা পেয়ারা পেকে সাদা হয়ে যায় তারপর যদি সেগুলি গাছ থেকে পাড়া হয়—নয়তো কাকে বাদুড়ে খায়। গাছের ডালগুলি এখন অক্ষত, একটা পাতা পর্যন্ত ছেঁড়ে না কেউ। বৃষ্টি হলে ছাদের জল গলগল করে নীচে নেমে আসে। ইঁট ঢুকিয়ে পাইপের মুখ কেউ বন্ধ করে রাখে না। ট্যাক্সি প্রাইভেট লরি সোঁ করে রাস্তা পার হয়—রাস্তার মাঝখানে ইঁট সাজিয়ে রাখা হয় না। তেমনি প্রত্যেকটা বাড়ির দরজা জানালার কাঁচ অটুট অক্ষত থেকে যাচ্ছে। অন্ধ ভিখিরি লাঠি ঠুকে ঠুকে শেষ পর্যন্ত নিজেই নিজের পথ ঠিক করে নেয় তাকে খানা নর্দমায় নামতে হয় না। কুকুরগুলি নির্বিবাদে ঘোরাফেরা করে, পাখির ছানাগুলি আস্তে আস্তে বড় হয়ে হয়ে একদিন পাখি হয়ে দিব্যি আকাশে উড়ে যায়, অসময়ে তাদের প্রাণসংহার করতে তাদের বাসায় কেউ এখন হাত বাড়ায় না। বাচ্চা না ফুটতে পাখির ডিম নষ্ট হয়েছে কত!

এখন সব ঠাণ্ডা, সবাই নিশ্চিন্ত। কারণ, সেই দুষ্টু ছেলেটা চলে গেছে। ফড়িং প্রজাপতির ঝাঁক মনের আনন্দে নেচে বেড়ায়। তাদের সুতো দিয়ে বাঁধতে কেউ পিছনে ধাওয়া করে না।

মাছির অন্তর্ধানটা বড় বেশি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে মানুষের চোখে এবং মনে লেগে রইল। এক বছর দু বছর তিন বছর—তার পর অবশ্য আস্তে আস্তে দুষ্টু ডানপিটে ছেলেটাকে তারা ভুলে গেল। মানুষের স্মৃতিশক্তি বড দুর্বল। 'মাছি' শব্দটাই আর কারো মুখে শোনা যেত না। অনেকদিন শোনা যায় নি।

কিন্তু আবার শোনা যাচ্ছে। মাছি ফিরে এসেছে। হুড়মুড় করে সব কিছু মনে পড়ে গেল সকলের। তাদের চোখের সামনে সেই মুখটা ভেসে উঠল। বানরের মতন পিটপিট করছে দুটো চোখ। লাল খাড়া খাড়া চুল মাথায়। একটা দুষ্টামি হজম করতে না করতে আর একটা দুষ্টামির জন্য তৈরী হচ্ছে। ইঁদুরের মতন ছোট ছোট দাঁতগুলি দিয়ে আবার কোন্ ছেলেকে কামড়ে দেবে, বিড়ালের মতন ধারালো ক্ষুদে নখ দিয়ে কোন্ মেয়েকে আঁচড়ে দেবে। খেলার সাথীদের হামেশা জখম করার নেশাও তো তার কম না—ওটাও তার একটা খেলা।

সবচেয়ে বেশি চিন্তান্বিত হলেন ভূদেববাবু।

আশুবাবুর নিকটতম প্রতিবেশী ব্যারিস্টার মানুষ।

কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরেই তিনি খবরটা শুনলেন। তাও স্বয়ং গিন্নীর মুখে।

ফাল্গুনের বিকেল। চমৎকার আকাশ। ফুরফুরে হাওয়া। দেহমন আপনা থেকেই সজীব হয়ে ওঠে।

তাঁর বাগানে হেনা ফুটেছে, বকুল বেল দু'একদিনের মধ্যেই ফুটতে আরম্ভ করবে। ওদিকটায় অশোক কৃষ্ণচূড়ার লাল দেখা দিতে শুরু করেছে।

দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে ভূদেব মুগ্ধনেত্রে বাগান দেখছিলেন, ধরাচূড়া ছাড়ছিলেন। হেনার গন্ধমিশ্রিত মলয়ানিল একটু সময়ের জন্য তাঁকে কেমন বিবশ বিমনা করে তুলেছিল। বুঝি যৌবনের কথা মনে পড়ছিল তাঁর।

এমন সময় গিন্নী এসে ভিতরে ঢুকলেন।

'শুনেছ খবর ?'

'কি !' চমকে উঠে তিনি স্ত্রীর মুখ দেখলেন।

'মাছি এসেছে।'

'কোথাকার মাছি, কিসের মাছি ! ভূদেববাবুর মুখটা হাঁ হয়ে গেল।

গিন্নী হেসে ফেললেন।

'আমাদের আশুবাবুর ছেলে চন্দন—মাছি তো তোমাদের দেওয়া নাম এখন মনে পড়ছে ?'

ভূদেববাবুর মুখটা কালো হয়ে গেল। এতক্ষণের সমস্ত প্রফুল্লতা দপ্ করে নিভে গেল। অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি।

'হুঁ, মনে পড়ছে। উঃ, সেই দুষ্টুটা ফিরে এসেছে, বানরমুখো বিচ্ছু—আবার জালাতে শুরু করবে, আবার তার হাজারটা উপদ্রব—'

গিন্নী বাধা দিলেন, শব্দ করে হাসলেন।

'তুমি বলছ কী, সেই দুষ্টু বিচ্ছু ছেলে কি আর আছে সে, কত বড় ছেলে হয়েছে, কী সুন্দর দেখতে হয়েছে এখন।'

কিন্তু ভূদেববাবু, সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। সর্বাগ্রে মেয়েকে মনে পড়ল তাঁর। জলিকে। গুরুগম্ভীর গলায় তিনি ডাকলেন, 'জলি।'

জলি এসে ভিতরে ঢুকল। আঠারো বছরের মেয়ে। ভূদেব তাঁর অনুসন্ধানী চোখ দুটো মেয়ের ফুলের মতন সুন্দর কোমল মুখখানার দিকে তুলে ধরলেন। থুতনির নিচের কালো সূক্ষ্ম দাগটা আজও থেকে গেছে, আজও ভাল করে মিলিয়ে গেল না। মেয়ের মুখ দেখা শেষ করে ভূদেব কটমট করে স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

'আশুর ছেলের অত্যাচার উপদ্রবগুলো বোধ করি আমাকেই সবচেয়ে বেশি

সহ্য করতে হত। পাশাপাশি বাড়ি। কাজেই আমার বাগানে ঢুকে ফুল চুরি করা ফল চুরি করা গাছের ডালপালা ভেঙে দেওয়ার সুবিধা তার সবচেয়ে বেশি ছিল, ঢিল ছুঁড়ে রোজ একটা করে জানালার কাঁচ ভাঙা, পায়রার বাচ্চা চুরি করা, আমার গ্যারেজের দরজায় রাজ্যের আবর্জনা জড়ো করে রাখা, ইটপাথর ঢুকিয়ে রেন-পাইপের মুখ বন্ধ করে দেওয়া—'

'তোমার সব মনে আছে দেখছি।' প্রীতিলতা এবার টেনে টেনে হাসছিলেন।

'কেন থাকবে না মনে। উফ্, কী শয়তান ছেলে। আমার জলির কী করেছিল! ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিল। থুতনি কেটে গিয়ে রক্তে রক্তময়—এখনো দাগটা রয়ে গেছে।' উত্তেজিত হাত বাড়িয়ে ভূদেব মেয়ের চিবুক স্পর্শ করলেন। 'স্টীচ্ করতে হয়েছিল—তুমি কি ভুলে গেছ—তোর মনে পড়ে না?'

বাবার চোখের দিকে তাকাল না জলি, সলজ্জ হেসে মাটির দিকে চোখ নামাল।

'ওর কি মনে আছে—ন' দশ বছর তো খুবই হবে, কত দিন আগের কথা—তা অবশ্য ছেলেবেলার এক একটা কথা খুব মনে থাকে, আবার অনেক কথাই মনে থাকে না। হুঁ এক সঙ্গে খেলাধুলা করেছে ছুটিতে, ঝগড়াঝাটি মারামারি কম করেছে কি।' সস্নেহ চোখে এক নজরে মেয়েকে দেখে প্রীতিলতা স্বামীর দিকে তাকালেন। 'যাক গে, শোন, আমি চন্দনকে একটু চা খেতে ডেকেছি—কতদিন পর এল।'

ভূদেব একটা ঘন নিশ্বাস ফেললেন। কথা বললেন না। মেয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'দেরাদুনে মামার কাছে আছে। গেল বার বি এস সি পাস করেছে। মেডিকেল পড়ছে।'

কিন্তু ভূদেব আর স্ত্রীর কথা শুনতে অপেক্ষা করলেন না। তোয়ালে কাঁধে ফেলে বাথরুমের দিকে চলে গেলেন।

জলযোগ সেরে রোজ যেমন বেরোন, ক্লাবে যাবার জন্য ভূদেব তৈরী হচ্ছিলেন। একুশ বাইশ বছরের সুদর্শন একটি যুবককে সঙ্গে নিয়ে গিন্নী ভিতরে ঢুকলেন।

'চন্দন এসেছে—তোমার মেসোমশায়কে প্রণাম কর চন্দন।'

ভূদেববাবুর পা ছুঁয়ে চন্দন প্রণাম করল। ভূদেব একবার মাত্র চোখ তুলে যুবকটিকে দেখলেন। সতেজ লাবণ্যমণ্ডিত চেহারা। টানা টানা চোখ। ব্যাক ব্রাশ করা চুল। ভুরু দুটিতে বুদ্ধির ছাপ, প্রতিভার ইঙ্গিত। সাদা লিনেনের জামা, হাল্কা নীল রঙের ট্রাউজার পরনে। অত্যন্ত ছিমছাম পরিপাটি একটি মানুষ।

'ভাল আছ?' অন্যদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে ভূদেব প্রশ্ন করলেন। ঐ একটা কথাই বললেন।

'হ্যাঁ, মেসোমশায়।' ঈষৎ হেসে চন্দন ঘাড় কাত করল। প্রীতিলতা দাঁড়িয়ে থেকে ঠোঁট টিপে হাসছিলেন। 'এসো, এ ঘরে এসো চন্দন।' ছেলেটিকে নিয়ে গিন্নী পাশের ঘরে চলে গেলেন। ভূদেব হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

কিন্তু তিনি বিস্মিত হলেন। বিমূঢ় হলেন। সম্পূর্ণ অন্য মূর্তি। কোথায় গেল সেই মুখপোড়া বানর। দুষ্টামি ভরা পিটপিটে চোখ। লাল চুল। বিচ্ছু, শয়তান লক্ষ্মীছাড়া ছেলে। বয়স তাকে বদলে দিয়েছে? যৌবন তাকে এমন সুশ্রী শান্ত ভদ্র করে দিয়েছে। যৌবনের এত জাদু! যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল ভূদেববাবুর। এত দুষ্টামি, এত চাপল্য বাঁদরামির ছিটেফোঁটাও আর তার মধ্যে অবশিষ্ট নাই? সব কর্পূরের মতন উড়ে গেছে! একটা বিরাট প্রশ্ন তাঁর দুই ভুরুর মাঝখানে ঝুলে রইল। ক্লাবে যাবার রাস্তায় এবং ক্লাব থেকে ফেরার সময়ও ভূদেব মাছির কথা ভাবলেন।

প্রায় রাত এগারোটায় তিনি বাড়ি ফিরলেন। যেমন রোজ ফেরেন। চাকর সিঁড়ির আলো জেলে দিল। তিনি দোতলায় উঠলেন। প্রীতিলতা শুয়েছিলো। যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। প্রসন্ন ফোলা ফোলা মুখখানা নিয়ে স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'জলি কোথায়?'

'খুব সম্ভব পড়ার ঘরে—পড়ছে।'

'এখনো পড়ছে—অনেক রাত হল যে। ভূদেব একটু বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

'এই তো আধঘণ্টা আগে পড়তে বসেছে—চন্দন এতক্ষণ ছিল না কিনা।' প্রীতিলতা আলস্যভঙ্গের হাই তুললেন। গল্পটল্প করল দুজন। আমিও অবশ্য মাঝে মাঝে কাছে ছিলাম।'

'ও!' অস্ফুট একটা শব্দ করলেন ভূদেব—যেন তারপর কি প্রশ্ন করবেন ভেবে না পেয়ে স্ত্রীর চোখ দুটো দেখলেন।

'রাত নটা সাড়ে নটা পর্যন্ত তো ওরা বাগানেই কাটিয়ে এল। রাতটাও খুব চমৎকার করেছে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না।'

'হুঁ, ফাল্গুন মাস।' ভূদেব ঘাড় নাড়লেন। 'তারপর ?'

প্রীতিলতা হাসলেন।

'সেই বাগানে গিয়ে দুজনের ছুটোছুটি—এই ফুলতোলা সেই ফুলের কলি ছেঁড়া—যেমন ছেলেবেলায় করেছে।'

'আচ্ছা!' যেন জিনিসটা উপভোগ করার জন্য ভূদেব প্রকাণ্ড একটা ঢোক গিললেন।

'আমি তো দুজনের কাণ্ডকারখানা দেখে মনে মনে হেসে বাঁচিনে—যেন চন্দন আবার সেই ডানপিটে দুষ্ট মাছি হয়ে গেছে।'

'কিরকম ?' চোখ দুটো গোল করে ফেললেন ভূদেববাবু।

'হুট করে গাছে উঠে পড়ল। জলিকে চাঁপা ফুল পেড়ে দেবে।'

'ঐ পোশাকে! এমন চমৎকার ট্রাউজার শার্ট নিয়ে গাছে উঠল ছেলে ?' ভূদেব আর একটা বড ঢোক গিললেন।

'তোমার যেমন বুদ্ধি।' প্রীতি ঠোঁট বেঁকালেন। ট্রাউজারের নি৻ আণ্ডার-ওয়্যার ছিল না ? শার্টের নিচে গেঞ্জি ছিল না ওর ?'

'হুঁ, তারপর।' যেন এখন জিনিসটা বুঝতে পেরে ভূদেব শান্ত হলেন। 'গাছে উঠল। তারপর ?'

প্রীতিলতা এবার আর ঠোঁট বেঁকালেন না, ভুরু বেঁকিয়ে স্বামীর চোখে চোখ রেখে হাসলেন।

'আজকালকার ছেলে মেয়ে তো। গাছ থেকে নেমে আমার সামনেই চন্দন চাঁপা ফুলের একটা মালা তৈরী করল। জলি সেটা খোঁপায় জড়াল।'

ভূদেববাবু হঠাৎ কথা বললেন না। মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে চুপ করে রইলেন।

'নাও, জামা-কাপড় ছাড়, খাবে অনেক রাত হল।'

'হ্যাঁ খাব।' ভূদেব মুখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। 'জলি খেয়েছে ?'

'না, এইবেলা খাবে।'

'আচ্ছা আমি ডাকছি—আমার সঙ্গে বসে খাবে—জলি!' ডাকতে ডাকতে ভূদেব মেয়ের পড়ার ঘরের দিকে ছুটে গেলেন। এক সেকেণ্ড পর মুখ শুকনো করে ফিরে এলেন।

'কি হল?'

'আলোটা নেবানো, দোরটা ভেজানো দেখলাম।'

'কেন প্রীতিলতা অবাক হলেন। ঘুমিয়ে পড়ল!'

ভূদেব মাথা নাড়লেন।

'মনে হয় না।' এদিক ওদিক তাকালেন তিনি। তারপর স্ত্রীর কানের কাছে গলা বাড়িয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'একটা কান্নার ফোঁপানি শুনলাম—যেন কাঁদছে মেয়ে।'

'ধেৎ, কাঁদবে কেন।' চমকে উঠতে গিয়ে প্রীতিলতা হাসলেন। কান্নার হয়েছে কি।'

'তা আমি কি করে বলব, আমি কি বাড়ি ছিলাম।' চাপা গর্জন করে উঠলেন ভূদেব। 'তোমরা ছিলে, তুমি ছিলে, কি হয়েছে না হয়েছে তুমি বলতে পার।' এক সেকেণ্ড চুপ থেকে ভূদেব আবার বললেন, 'যেমন ডানপিটে বাঁদর—চিরকাল যা করে এসেছে, হয়তো খেলতে খেলতে মেয়েটাকে আঘাত করেছে, হাতটা মুচড়ে দিতে পারে, চুল টেনে ধরেছিল হয়তো—'

'তোমার যেমন বুদ্ধি!' প্রীতিলতা ঠোঁট বেঁকালেন, এই বয়সে এসব করে নাকি কেউ, দুজনেই বড় হয়েছে—তবে হ্যাঁ, জলির মনে লাগতে পারে এমন কোন কথাটথা যদি চন্দন—'

'ঐ একই কথা হল।' স্ত্রীকে শেষ করতে দিলেন না ভূদেব। ভেংচি কাটার মতন মুখ করে বললেন, 'আঘাত দিয়েছে আমার মেয়েকে। খেলতে গিয়ে খেলার সাথীকে আঘাত করার ঝোঁকটা ঠিক রয়ে গেছে ওতেই তার আনন্দ—আমি এক ফোঁটা বিশ্বাস করতে পারি না মাছিকে—আশুর ছেলেকে।'

'যাক, ওদের ব্যাপার ওরা বুঝবে—আমি তুমি মাথা ঘামিয়ে করব কি, তুমি কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধোও, আমি মেয়েকে ডাকছি—' প্রীতি বেরিয়ে গেলেন।

বিড়বিড় করে ভূদেব কি বললেন বোঝা গেল গেল না।

ওয়াং ও খেলাঘরে আমরা

এমন হাসপাতাল আছে? আছে। জানালা গলিয়ে শুক্লা পঞ্চমীর পাতলা জ্যোৎস্না এসে রোগীদের বেড্-এ লুটোপুটি খায়। বাইরের ঝাউবনের সোঁ সোঁ শব্দ শোনা যায়। চৈত্রের শুকনো হাওয়ার হা-হা। সেই সঙ্গে ফিনাইল লাইজল ডেটলের চড়া গন্ধ চাপা দিয়ে কোথা থেকে ঝলক দিয়ে হাস্নুহানার শৌখীন সুবাস ভেসে এসে রোগীদের ভয়ানক সুখী বিলাসী করে তোলে। আলস্যে হাই ওঠে তাদের। তারা তখন, চুল থাকুক না থাকুক, চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ায়। অসুখে ভুগে সবাই প্রায় নেড়া হয়ে গেছে। তা হলেও সুখের অভ্যাস সহজে ছাড়া যায় না। নেড়া মাথায় তারা চিরুনি বুলোয়। এবং বালিশের তলা থেকে হাত-আরশিখানা টেনে নিয়ে যে যার মুখ দেখে চোখ দেখে, হাঁ করে দাঁত দেখে। যাদের দাঁত নেই তারা আলজিভ দেখে ও সেই সঙ্গে গলনালীর অন্ধকার সুড়ঙ্গ। সন্ধ্যাটা এভাবে কাটে।

সন্ধ্যাটা মোটামুটি ভাল কাটে। একটু পরে দুধ পাউরুটি আসে। দুধ পাউরুটি খেয়ে চুপচাপ বসে থাকে কেউ। অনেকে শুয়ে পড়ে। বিশ্রাম। সারাদিনই বিশ্রাম। তা হলেও এ বিশ্রাম অন্যরকম।

দুপুরটা নির্মম। ঝাঁঝাঁ রোদ নিয়ে চরাচর পুড়তে থাকে। আমরা রোগীরা ভিতরে বসে রোদের তেজ টের পাই। বারান্দার রেলিং-এ এক ঝাঁক কাক সার বেঁধে বসে থাকে। কা-কা ডাকে। শুনে গা ছমছম করে। কেননা আর কোনো শব্দ থাকে না তখন। আর ঠিক এমন সময় রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে শরীরটা গলিয়ে নিয়ে ওটা বারান্দায় উঠে আসে। তারপর গুটিগুটি ভিতরে চলে আসে। এবং এসেই ম্যাঁও করে একটা ডাক দেয়। যেন রোগীদের জানান দেওয়া 'আমি এসে গেছি।' বাস্, তারপর চুপ। গুরুগম্ভীর চালে কিছুক্ষণ এই বিছানা সেই বিছানার কাছে ঘুরঘুর করবে। তারপর একসময় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে সামনের নোংরা ঠ্যাংটা তুলে ভোঁতা নাক ও থুতনটা এবার ঘষবে। তারপর ঘাড় সোজা করে হিঙ্গুলের মতন রক্তবর্ণ চোখ দুটো রোগীদের মুখের দিকে তুলে ধরবে। দেখে আমাদের হৃৎপিণ্ড কেঁপে ওঠে। বেড়ালের এত লাল চোখ কে কবে দেখেছে। আর তাকানোটাও এত খারাপ।

মনে হয় যেন এই শয়তান জ্যোতিষ জানে। রোগীদের মুখ দেখে কপাল দেখে কিছু পড়ে ফেলল। কী পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা হৈহৈ করে উঠি। যে যার বিছানায় বসে থেকে হাত-পা ছুঁড়ি। হিস্-হিস্, আপদ দূর হ। সমস্বরে সবাই চেঁচাই। তখন লেজ গুটিয়ে তেমনি গুরুগম্ভীর চালে ওটা বেরিয়ে যায়। যেন আজ তেমন সুবিধা হল না। কাল আবার আসবে। এবং পরদিন দুপুরে ঠিক আসেও। রোজ আসছে। এমন ক্লান্তিকর।

কিন্তু ভাদ্রের থমথমে মেঘলা দুপুর তার চেয়েও ভয়াবহ। যদি রোদের ছিটেফোঁটা না থাকে বা যদি সেই সঙ্গে পৃথিবীর যাবতীয় শব্দ থেমে থাকে। এবং যদি বাতাসও নড়াচড়া না করে। তখন রেলিং-এ কাকগুলি থাকে না। বেড়ালটাও আসে না। অন্য এক জগৎ মনে হয় সেদিন। মনে হয় প্রাক প্যালিওজয়িক যুগের নিষ্প্রাণ ধূসর কাদা থিকথিকে পৃথিবীতে কেউ একটা হাসপাতাল গড়ে রেখেছে। তার ভিতরে আমরা ভয়ানকরকম রুগ্ন পাংশুমুখ অসহায় মানুষগুলি হাঁ করে বসে আছি। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। ভেবে ভেবে আমাদের শ্বাস ভারি হয়ে আসে। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বেড্-এর পাশে দাঁড় করান অক্সিজেন সিলিণ্ডারের চাবি ঘুরিয়ে রবারের নলটা নাকে পরে নিই। শ্বাস-প্রশ্বাস কিছুটা স্বাভাবিক হয়।

কিন্তু যদি সন্ধ্যার দিকে দ্রামদ্রাম বাজ পড়ে, বিদ্যুৎ চমকায়, হাসপাতাল-কম্পাউণ্ডে দেবদারু ঝাউয়েরা পাগলের মতন মাথা ঝাঁকায় ও শনশন শব্দ করে এবং ইলেকট্রিক ফেল্ করে—হাসপাতালেও লোড-শেডিং হয়—তখন মনে হয় কি প্রলয়ের রক্তসন্ধ্যার সেই জরাব্যাধি আচ্ছন্ন পৃথিবী। আজকের রূপরস গন্ধ গানের উজ্জ্বল ঝলমলে পৃথিবী নয় এটা। হাসপাতালে আছি বলে কি আমরা রোগীরা রূপরস গন্ধ ও গানের পৃথিবী ভুলে গেছি। কেউ ভোলে না। তাই সৃষ্টির নিদানকাল আসন্ন ভেবে সকলের মুখ চুন হয়ে যায়। পরদিন সকাল না হওয়া তক ভয় কাটে না। ভোরের রৌদ্র-নীল শান্ত আকাশ দেখে তবে বুক ঠাণ্ডা হয়। বগল থেকে থার্মোমিটার নামিয়ে রেখে দুধ পাউরুটি ডিম দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে ভিটামিন বড়ি মুখে ফেলে যে যার বিছানায় সুখে আসীন থাকি।

এভাবে আমাদের গ্রীষ্ম কাটে, বর্ষা শীত, শীতের শেষ বসন্ত। সাইক্লিক অর্ডারে আবার গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত আসে। বারুইপুরের স্কুল-মাস্টার বগলা দত্ত, উত্তরপাড়ার উকিল কাশী মিত্তির, বারাসতের বসির মিঞা, খাস কলকাতার রাধাবাজারের ঘড়ির দোকানের মালিক নগেন পোদ্দার এবং আরও

কতজন আছে এখানে। দর্জিপাড়ার কবিরাজ ভূতু সেন আছে। বালিগঞ্জ ডোভার লেন থেকে এসেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মচারী কৃষ্ণ আয়ার। চারদিকের আরও অনেক পেসেণ্ট। ডোমজুড়ের পরেশ বাকুলী। মুড়াগাছার জোতদার মহিম হালদার। কৃষ্ণনগর কলেজের প্রফেসার সুধীর সেন। ঘাটশীলার কেদার পাণ্ডে। হাসপাতালের তিনটে ব্লক রোগীতে ঠাসা। রোজ কত গণ্ডা ভর্তি হতে এসে ফিরে যায়। জায়গা নেই। আমরা যারা বেড নিয়ে আছি এ খবর শুনে ফেকাসে গালে হাসি। কথায় বলে পুরোনো পাগলে ভাত পায় না তার আবার নতুন পাগল এসে জোটে। এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা বলাবলি করি। পাগল এখানে কেউ না যদিও। সব রোগী। রক্তহীনতায় ভুগছি। পাণ্ডু শীর্ণ হাত পা। শুকনো জিরজিরে পাঁজর। চুপসান গাল গর্তে ঢোকা চোখ। আমরা জানি আমাদের হাসতে দেখে লোকের কান্না পায়। আমরা জানি রেগে গেলে আমাদের এক এক জনের কুঁকড়ে যাওয়া দলামোচা খাওয়া দুর্বল গলার পেশী টিকটিকির পেটের মতন ধুকধুক কাঁপে। তার বেশি নয়। ফুসফুসের জোর কোথায় যে হৈ-হৈ করে বাড়ি মাথায় তুলব, রাগ দেখাব। সকলের এক অবস্থা। আমি ঠনঠনের মহামায়া প্রেসের কর্মচারী উমাপদ নন্দী যেমন, তেমনি বেণ্টিং স্ট্রীটের অতবড় জুতোর দোকানের মালিক মিঃ ওয়াং। ঐ একটাই রোগ। অ্যানীমিয়া। সবরী কলার মতন চমক লাগান হলদে রং ছিল চীনা সাহেবের। মিঃ ওয়াং-কে তো আগেও আমি দেখেছি। ভুগে ভুগে গায়ের চামড়া এখন ছাতনাধরা ছাঁচি কুমড়োর চেহারা ধরেছে। এক নম্বর কেবিনে আছে। বারান্দার ওপাশে সবুজ পর্দা ঝুলান ছোট্ট ঘর। দু নম্বর কেবিনে ছিল নৈহাটির ব্রজেন তালুকদার। ছুটি পেয়ে চলে গেছে। তিন ও চার নম্বর কেবিনও এখন ফাঁকা। কেবিন ভাড়া করে থাকার মতন পয়সাওয়ালা রোগী আর কজন আসে। অনেকে অবশ্য ইচ্ছা করে কেবিনে থাকে না। একলা ভয় ভয় করে শুনি।

বড় ডাক্তাররা সারাদিনে একবার আসেন। ছোকরা ডাক্তারদের ছুটোছুটি সারাদিনই আছে। নার্সরা আসে বেলায়, বার বার। কেউ সিস্টার ডাকি, কেউ দিদিমণি। অনেকে শুধু দিদি। দিদিরা যখন ঢোকে মোটে টের পাওয়া যায় না। যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে আসে। আর তক্ষুণি এতবড় হল আলো হয়ে যায়। যেন জ্যোৎস্নায় ভরে ওঠে ভিতরটা। সাতজন করে একসঙ্গে ঢোকে। শ্বেত-পায়রার পালকের মতন ধবধবে পোশাক। আর কী মিঠে এক

একটি গলা! চোখ বুজে শুনতে ইচ্ছা করে। আমরা রোগীরা কান পেতে শুনি। দিদিমণিরা গালাগাল দিলেও ভাল লাগে। মনে হয় গান শুনছি। টগরফুলের মতন গোল ডাগর চোখ। কাশ্মীরী আপেলের মতন গোলাপী লাল গাল। বোঝা যায় কত রক্ত পলকা এক একটি শরীরে। টসটস করছে চামড়া। চোখ বড় করে আমরা তাকিয়ে থাকি। আপনারা কী খান দিদি? এমন রং এমন মাজাঘষা ঝকমকে স্বাস্থ্য। হি-হি, আমাদের কথা শুনে দিদিমণিরা গাল ছড়িয়ে হাসে। লেবুর রস দিয়ে স্রেফ বার্লি-ওয়াটার খাই। বিশ্বাস করবেন? ভুরু পাকিয়ে তারা উত্তর করে। বোকার মতন আমরা ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকি। শুনি। এমন কথা কে বিশ্বাস করতে পারে। যে জন্য চুপ থেকে আমরা ঘনঘন ঢোক গিলি। আমাদের চোখের রং আরও ঘোলা হয়ে ওঠে।

আর তখন, আমাদের ঘোলা চোখের দিকে চোখ রেখে সিস্টারদের একজন গানের সুর করে বলে, ভাবছেন আমরা বুঝি খুব করে আপেল আঙুর বেদানার রস খাই। মোটেই না। আপেল, আঙুর আপনাদের জন্য। রোগীদের খাদ্য। আমরা খাব কোন দুঃখে। কি বলিস রে রেবা, কি বলিস শুক্লা? শুক্লা ও রেবা শব্দ করে না। কেবল ঠোঁট টিপে হাসে।

এই অবস্থায় আমাদের বলার কিছু থাকে কি। শুধু শুনি। এবার অঢেল আপেল ফলেছে, সবাই বলে। দামেও সস্তা। দু টাকা কেজি। এই বড় বড় সাইজ। তেমনি মন মাতান রং। আর কী খোশবাই। চব্বিশঘণ্টা আপেলের গন্ধে ম ম করছে সারা ওয়ার্ড। মুহুর্মুহু লাল নীল সবুজ মাছিরা উড়ে আসছে। ফিনাইল ডেটল ছিটিয়ে তাদের রোখা যায় না। আমাদের শিয়রের কাছে প্রত্যেকটা মিটসেফ-এর মাথায় পাহাড়ের মতন আপেল জমে আছে। যারাই রোগীদের দেখতে আসে হাতে করে আপেলের ঠোঙা নিয়ে আসছে। পেটভরে আপনারা আপেল খান, আপেল খেয়ে গায়ে রক্ত বাড়ান। দিদিরা উপদেশ দিয়ে চলে যায়।

ঠাট্টা করছে, সোনামণিরা ঠাট্টা করে চলে গেল, বুঝেছেন গো দাদা। রাধাবাজারের ঘড়ির দোকানের নগেন পোদ্দার দর্জিপাড়ার কবিরাজ ভুতু সেনের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ভেংচি কাটে। পাশাপাশি দুটো বেড্‌। ভুতু সেন ঘোৎ করে নাক দিয়ে শ্বাস ফেলে বলল, এ ছাড়া আর বলবে কি বিদ্যেধরীরা। আপেল! বলে কিনা মটকি মটকি অরিস্ট সালসা খেয়ে যেখানে কাজ হল না, আপেল আমার

রক্তের হিমোগ্নোবিন বাড়িয়ে দেবে। অ্যাঁ সেদিনকার পুঁচকে পুঁচকে ছুঁড়ি। ভূতু কোবরেজকে জ্ঞান দিতে এয়েছে।

তাই তো, ওধার থেকে উকিল কাশী মিত্তির নাকের নস্যি ঝেড়ে ঘাড় কাত করে বলল, খাঁটি কথা বলছেন সেন মশাই। আপেল! এর মধ্যে কয়েক মণ আপেল আঙুর আমার পেটে গেছে না। ক ফোঁটা রক্ত বাড়ল? কোথায় গেল এত ফলের রস? জল হয়ে পেচ্ছাবের সঙ্গে সব বেরিয়ে যাচ্ছে। ঠিক কিনা। সঙ্গে সঙ্গে নগেন পোদ্দার সায় দিল, যা বলেছেন।

বড় ডাক্তাররা যখন আসেন টের পাওয়া যায়। বাতাসে ভেসে আসার মতন হালকা পলকা শরীর না একটাও। শক্ত মজবুত গাট্টাগোট্টা চেহারা। পাহাড়ের মতন উঁচু দেখতে। চ্যাটার্জি সাহেব ঘোষ সাহেব বোস সাহেব মিত্তির সাহেব। জমাদার ওয়ার্ডবয় এবং সিস্টারদের দেখাদেখি আমরাও ডাক্তারবাবুদের সাহেব বলতে শিখে গেছি। লাল গোল বড় বড় মুখ। জলজ্বল করছে এক এক জোড়া চোখ যেন ভিতর থেকে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম ও যাবতীয় ভিটামিনের তেজ ঠিকরে বেরোচ্ছে। বোঝা যায় গায়ে কত জোর সাহেবদের। সবাই বিলেত ফেরৎ। নামের পিছে পাঁচটা সাতটা করে টাইটল। রোগীদের বিছানার পাশ দিয়ে যখন হেঁটে যান মেঝেটা দুপদাপ কাঁপে। চামড়া ফেটে রক্ত বেরোতে চাইছে এক এক জনের।

কি খান ডাক্তার সাহেবেরা? আপেল আঙুর? উঁহু, আমরা ভাবি। আপেল আঙুর বেদানার মধ্যে শুধু জল। একটু আগে সব আলোচনা করছিলাম। মাটন মুরগি খাসী পাঁঠা খাওয়া শরীর বড় ডাক্তারদের। না, তেল মসলার রান্না মাংস ডাক্তাররা ছোঁন না শুনি। মুণ্ড ছিঁড়ে মুরগির গলাটা সরাসরি মুখে পরে একদমে সবটা কাঁচা রক্ত চুষে নেন। পরে ছিবড়ে মাংসটা ডাস্টবিনে ছুঁড়ে দেন। আসল জিনিস খাওয়া হয়ে গেলে ধড় দিয়ে কি হয়। ভেড়া খাসীর বেলায়ও তাই। কেবল রক্ত। ইনজেকসানের অ্যাম্পল ফাটিয়ে সিস্টাররা যেমন সিরিঞ্জের মধ্যে চোঁ করে ওষুধটাকে টেনে নেয়। তাই না ডাক্তারবাবু? ডোমজুড়ের পরেশ বাকুলী একদিন বোকার মতন বোস সাহেবকে প্রশ্ন করে বসল। বোস সাহেব হল কাঁপিয়ে হেসে ওঠেন। তারপর দূরে দাঁড়ান ঘোষ সাহেবকে ডেকে বলেন, শুনছেন ডক্টর ঘোষ আমার পেশেণ্ট কী বলছে? কি বলছে, ঘোষ সাহেব ঘুরে দাঁড়ান। তখন বোস সাহেব আবার হল কাঁপিয়ে হাসেন। তারপর পাশে বাকুলীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলেন, আমরা

কী খাই শুনবেন মশাই, তাজ্জব হবেন শুনে। মুসুর ডালের জুস্ আর ভেজিটেবল সুপ। সুপ কাকে বলে জানেন তো। কপি পাতা পালং পাতা পেঁপে ডুমুরের সেদ্ধ করা জল। ঐ শুধু নির্যাসটুকু। সঙ্গে দুপুরে দু চামচ ভাত, রাত্রে গুণে ঠিক একখানা হাত-রুটি। বাস্। পারবেন খেয়ে থাকতে?

এ-পাশ থেকে নগেন পোদ্দার ও কাশী মিত্তির কান খাড়া করে বোস সাহেবের কথাগুলি শুনল। তারপর সাহেব ডাক্তাররা রোগীদের দেখেটেখে গটগট করে এক সময় ওয়ার্ড ছেড়ে চলে গেলে নগেন সকলকে শুনিয়ে বলল, সিস্টারদের মতন ডাক্তারবাবুরাও ধাপ্পা দিচ্ছে, শুনলেন তো দাদারা। হুঁ, শুনেছি বৈকি, ওদিকের একটা বেড থেকে মাথা তুলে ঘাটশীলার কেদার পাণ্ডে বলল, আলবৎ ধাপ্পা দিয়ে গেল। সব কচি খোকা আমরা এখানে, ছেলেভুলোনো কথা শুনিয়ে গেল। অ্যাঁ, মশাইরা আপনারা স্বচক্ষে দেখেছেন আমি ক'ডজন চিকেন এসেন্স খেয়েছি এ দু মাসে। খেয়ে হলটা কি? আর উনারা মসুর ডালের জল, আনাজ সেদ্ধ দিয়ে দু চামচ ভাত একখানা হাত-রুটি খেয়ে এমন ষণ্ডামার্কা চেহারা বাগিয়েছেন। ভূতেও বিশ্বাস করবে না।

না, ভূতেও এসব কথা বিশ্বাস করবে না। তার মেয়ের জামাই ফি সপ্তাহে আধডজন করে চিকেন এসেন্সের ফাইল কিনে শ্বশুরকে খেতে দিয়ে যায়। এত মুরগির নির্যাস খেয়েও পাণ্ডে কিছু ফল পেল না।

কাশী মিত্তির বলল, ওসব হল ক্যামিকেল প্রডাক্টস। খেয়ে শরীরের কিছু হয় না। হাসপাতালের দেওয়া জলো দুধ ঠাণ্ডাঘরের ডিম বরফপচা মাছ আমরা খাই, তা হলেও কিছুটা খাদ্যগুণ ওসবে যে না আছে তা নয়। তার ওপর আপেল আঙুরও এক একজন মন্দ চালাচ্ছি না। সব খেয়েও কি এক ফোঁটা রক্ত বাড়ছে, না গায়ে বল পাচ্ছি? বাকি রইল দোকানের চিকেন এসেন্স। আসল কথা যতক্ষণ না ক বোতল করে তাজা রক্ত শরীরে ঢোকাতে পারছি তদ্দিন এখানে আধমরা হয়ে শুয়ে আমাদের কাটাতে হবে। তারপর এই হাসপাতালের বিছানায় পটাপট সব পটল তুলব। ঘরে ফেরা কারো হবে না।

উকিলের কথায় ওয়ার্ডের এ মাথা থেকে ও মাথা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের ঝড় বয়ে যায়। যেন এতকালের অদৃশ্য যম হঠাৎ সকলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত ছড়িয়ে হাসে। কারণ শেষ পর্যন্ত সে-ই জিতে যাচ্ছে।

তাই। আসল হল রক্ত। রক্তের অভাবে শুকনো বাদাম পাতার মতন হলদে হয়ে যাচ্ছি আমরা, কালকাসান্দি পাতার মতন সিটিয়ে কালচে মেরে যাচ্ছি,

নয়তো মরা মুড়মুড়ে নিশিন্দা পাতার মতন নীল হয়ে যাচ্ছে আমাদের এক একটা শরীর। উঠে বসা দূরে থাক, ভাল করে কথা বলতে পারে না এমন পেশেণ্টও এখানে অনেক। হয়তো বেশিই।

আমাদের হতাশ এবং ভয়ে কাঠ হয়ে যাওয়ার আরও কারণ আছে। কদিন ধরে বড় ডাক্তাররা ছোট ডাক্তাররা এবং নার্স দিদিমণিরা ঘটা করে শুনিয়ে যাচ্ছে হাসপাতালে আর রক্ত নেই। যা স্টক ছিল দু' মাস আগে ফুরিয়ে গেছে। ইদানীং এত রোগী আসতে আরম্ভ করেছিল, তাদের বিলিয়ে বিলিয়ে হাসপাতালের রক্তের ভাণ্ডার এখন শূন্য। কাজেই এখন যাঁরা পেশেণ্ট আছেন, তাঁরা বাইরে থেকে রক্ত যোগাড় করুন। কিংবা বাড়ির লোক বা নিজেদের আত্মীয়স্বজন যদি তাঁদের জন্য রক্ত ডোনেট করেন তাতেও কাজ হয়।

তাই ভাবছি সকলে। বালিশে পিঠ ঠেকিয়ে বকের ঠ্যাং-এর মতন সরু সরু কংকালসার পাগুলি সামনের দিকে ছড়িয়ে মাথায় হাত রেখে আকাশ-পাতাল ভাবছি। হাসপাতালের রক্তের স্টক ফুরিয়ে গেছে, ভাল কথা। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা ভয়ানক খবর শুনছি। বাইরেও রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না। কলকাতার কোনো ব্লাড-ব্যাঙ্কে রক্ত নেই। এমন হয়? কাশী মিস্ত্রিরের পয়সার অভাব নেই। ওকালতিতে ভাল পশার ছিল। হাসপাতালে রক্ত নেই তো হয়েছে কি? পরশু সকালে ভায়রার ছেলেকে এক গোছা নোট দিয়ে রক্ত কিনতে পাঠিয়েছিল। সঙ্গে নিজের রক্তের স্যাম্পেল দিয়েছিল। গ্রুপ মিলিয়ে রক্ত আনতে হবে তো। সব রক্ত সকলের জন্য নয়। ভায়রার ছেলে রক্তের জন্য কলকাতা চষে বেড়িয়েছে। তারপর টাকা নিয়ে বিকেলে ফিরে এসেছে। কেবল কাশী মিস্ত্রিরের গ্রুপের রক্ত বলে কথা না, কোন গ্রুপের রক্তই বাজারে নেই। শহরের সব কটা ব্লাড-ব্যাঙ্ক রক্তশূন্য হয়ে বসে আছে।

বারো নম্বর বেড থেকে পাঁচলার শশী দাস ঘাড় উঁচিয়ে কান খাড়া করে কাশী মিস্ত্রিরের ভায়রার ছেলের কথাগুলি শুনছিল। একটু আগে শশী দাস তার দোকানের কর্মচারীকে টাকা দিয়ে রক্ত কিনতে পাঠিয়েছিল। শশী দাসও টাকাওয়ালা মানুষ। দু বোতল তিন বোতল, দরকার হলে দশ বোতল রক্ত কেনার, ক্ষমতা রাখে। বড়বাজারে মস্ত বড় মশলার দোকান। দশটা কর্মচারী খাটে। কিন্তু টাকা থাকলে হবে কি। আসল জিনিস যদি না মেলে। দেখা গেল তাই। দুপুরের আগেই শশীর কর্মচারী শূন্য হাতে ফিরে আসে। কোথাও রক্ত পাওয়া গেল না। নিমেষের মধ্যে ওয়ার্ডের সব রোগী খবরটা শুনল।

আর এক পেশেণ্ট বেহালার বিনোদ চক্রবর্তী। সামান্য কেরানীর চাকরি। ঘরে জমান টাকা নেই। বিনোদের স্ত্রী মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল গলার হার বেচে স্বামীর জন্য রক্ত কেনা হবে। হল তো খুব কেনা।

হ্যাঁ, এখন কথা হচ্ছে, বাড়ির লোক, আত্মীয়স্বজন। যদি তাদের রোগীদের বাঁচাতে হয় তবে তারা নিজের শরীর থেকে রক্ত দিক। দেওয়া উচিত। কিন্তু আত্মীয় বন্ধু স্ত্রী বা নিজের সন্তান হলেই যে রোগীর ব্লাড গ্রুপের সঙ্গে তাদের ব্লাড-গ্রুপ মিলবে তার কথা কি। অনেক সময় মেলে না। যেমন নগেন পোদ্দারের বেলায় হল। নগেনের ভাই রক্ত দিতে চেয়েছিল। নগেনের রক্তের সঙ্গে ভাইয়ের রক্ত মিলল না। তা না হলে কি বাইরে থেকে নগেনের জন্য রক্ত কেনার প্রশ্ন উঠত।

আরও কথা আছে। রক্ত দেবার মতন সকলের আত্মীয় বন্ধু আছে কি? ভাই ভাই-পো ভাগ্নে বা উপযুক্ত ছেলেমেয়ে অনেকের থেকেও কাজ হয় না। যেমন বজবজের রামেশ্বর পাকড়াশীর জোয়ান ছেলে ঘরে। থাকলে হবে কি। ত্রিশ বছরের ছেলের দুটো ফুসফুসই ফুটো হয়ে গেছে। ছয় মাসের ওপর কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালে বেড নিয়ে আছে। যক্ষা রোগীর রক্ত রামেশ্বরের কোন্ কাজে লাগত। তাহলেও রামেশ্বরকে তো বাঁচতে হবে। ঘটি বাটি বেচে রক্ত কিনবে বলে রামেশ্বর টাকা যোগাড় করে রেখেছিল। এখন? তেমনি ওপাশের বাইশ নম্বর বেড-এর পোস্ট্যাল ক্লার্ক মহেন্দ্র সরকারের অবস্থা। হাসপাতালে রক্ত নেই, বাজারে রক্ত নেই। মহেন্দ সরকারের ছেলে, যদিও দ্বিতীয় পক্ষের, তাহলেও তো সন্তান, বাবাকে রক্ত দিতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিতে পারল কোথায়। বউমা বাদ সাধলেন। বরের শরীর খারাপ হবে। খবর-কাগজের অফিসে চাকরি। মাসে পনেরো দিন নাইট-ডিউটি করতে হয়। এমন মানুষের শরীর থেকে রক্ত নেওয়া চলে? যুক্তিটা ফেলনা নয়। মহেন্দ্র সরকার একেবারে চুপ করে গেছে।

আবার এমন লোক আছে, সন্তানের শরীর থেকে রক্ত নিয়ে নিজে বাঁচব কল্পনা করে শিউরে উঠছে। গড়পাড়ের কিশোরী ভদ্র। উনিশ নম্বর বেড নিয়ে তিন মাসের ওপর এখানে শুয়ে। ছেলে অরুণেশ, ঐ একমাত্র ছেলে ভদ্রলোকের গত বছর অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করে এখন এম-এ পড়ছে। খেলাধুলায় ভাল। বয়স একুশ। উঁহু, অরুণেশের শরীর থেকে এক ফোঁটা রক্ত নেওয়া চলবে না। তার চেয়ে আমি মরে যেতে রাজী। কিশোরী স্ত্রীকে বলে দিয়েছে, আমার

বয়স ষাট পেরিয়েছে—আর ছেলের সবে শুরু, কতবড় ভবিষ্যৎ তার। কিশোরী যে জন্য স্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছিল ব্যাঙ্কে যৎসামান্য যে কটা টাকা আছে তাই থেকে কিছু তুলে এনে রক্ত কেনা হোক।

তার অর্থ, অন্য ওয়ার্ডের খবর আমাদের জানা ছিল না, দেখছি আমাদের ওয়ার্ডের চৌদ্দ আনা রোগী রক্তের জন্য প্রথমটা হাসপাতাল, তারপর শহরের ব্লাড-ব্যাঙ্কগুলির দিকে তাকিয়ে ছিল। এখন সব আশা নির্মূল হল। হাসপাতালের মতন বাইরের প্রত্যেকটা ব্লাড-ব্যাঙ্ক দেউলিয়া সেজে বসে আছে।

বলেছি, রাধাবাজারের ঘড়ির দোকানের নগেন পোদ্দার রসিক ব্যক্তি। এত দুঃখেও দিব্যি হাসছিল। খবর শুনে কাল বিকেলে বলছিল, আবার বরফ-যুগ চলে এসেছে, আইস এজ্। পৃথিবী ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে মশাইরা জেনে রাখবেন। কলকাতা শহরে এক ফোঁটা রক্ত নেই, তার মানে তুষার শীতল হয়ে গেছে চরাচর। তা ছাড়া, কি, ডোমজুড়ের পরেশ বাকুলী নগেনের মতন হাসতে পারে না, মুখটা অন্ধকার করে বলছিল, বাপের জন্মে এমন কাণ্ড কেউ শুনেছে? বলতে হয় বেবাক মানুষ জমে শিলাপিণ্ড হয়ে গেছে। আঁখমাড়া কলে ফেলে পিষলেও একফোঁটা রক্ত বেরোচ্ছে না কারো গা থেকে। না খেয়ে ভেজাল খেয়ে মানুষের এ দশা হয়েছে।

নারকেলডাঙার ক্ষিতীশ সামন্ত, যার তিন নম্বর বেড, ভাল করে কথা বলতে পারে না, খনখনে স্বরে বলল, মানুষের উপকারের কথা ভেবে আগে অনেকে ইচ্ছে করে রক্ত দিত। হুঁ, তা দিত, উকিল কাশী মিত্তির এতক্ষণ চুপ ছিল, এবার মুখ খুলল, তা দান-খয়রাতী আর না-ই বা করল, রক্ত দিলে পয়সা পাওয়া গেছে। গরীবদের একটা ভাল রোজগারের পথ খোলা ছিল। কত রিকশাওয়ালা ঠেলাওয়ালাকে দেখেছি, সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেছে, তারপর সুযোগমতন কোনো একটা ব্লাড-ব্যাঙ্কে গিয়ে রক্ত দিয়ে টাকা নিয়ে ঘরে ফিরেছে। কেবল ঠেলা বা রিকশার পয়সায় সংসার চলছিল না।

ভূতু কবিরাজ বলল, আমাদের ওদিকে বিরজা বলে এক পোস্টম্যান ছিল। এই জোয়ান চেহারা। রোদে পুড়ে জলে ভিজে লোকের দোরে দোরে ঘুরে সারা বছর ডাক বিলি করত। আহা, ডাক-পিওনের চাকরি, কত আর মাইনে পেত। তাও তো সাত বছর আগের কথা বলছি। এমন আগুন লাগেনি বাজারে। তবু সরকারী বেতনে বেচারার সংসার চলছিল না। লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের ওদিকার ওরিয়েন্ট ব্লাড-ব্যাঙ্কে গিয়ে খানিকটা করে শরীর থেকে রক্ত

ঝরিয়ে আসত। ঐ টাকা দিয়ে বউয়ের শাড়ি কিনে দিয়েছে, ছেলের ইস্কুলের মাইনে চালিয়েছে।

তারপর? নারকেলডাঙার ক্ষিতীশ সামন্ত হাঁ করে শুনছিল। এখনো আছে বিরজা?

কি করে থাকবে! ভুতু সেন লম্বা শ্বাস ছাড়ল। রক্ত দিয়ে দিয়ে শেষটায় পোস্টকার্ডের মতন সাদা হয়ে গেল চেহারাটা। বিয়াল্লিশ বছরেই পরমায়ু শেষ। টুপ করে ঝরে পড়ল।

আহা—হা—হা। এক সঙ্গে আমাদের চার-পাঁচটা গলা আর্তনাদ করে উঠল।

পরিবারের জন্য শহীদ হয়েছিল বিরজা পিওন। তারপর আমরা আর কেউ শব্দ করিনি। চুরাশিজন পেশেণ্ট নিয়ে এতবড় ওয়ার্ড। মনে হল, হলের ভিতরটা দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের দশ ডিগ্রী নিচে নেমে গেছে। বাইরে তুষারপাত হচ্ছে। কম্বল মুড়ি দিয়ে শীত কমছে না। হি-হি করে কাঁপছি সব। কিন্তু মজা এই, তখন বাইরেটা শুক্লা দশমীর দুধসাদা জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, ফাগুন মাস। কোকিল ডাকছিল। যেন থরে থরে কোথাও গন্ধরাজ ফুটেছে। ফুলের গন্ধে বাতাস মাতোয়ারা। সেই সঙ্গে আমরাও। আমরা ভাগ্যবান, বলতে হবে। ভেবে নতুন করে হাসি পেল। হাসি না যদিও কেউ। এ যে কী করুণ দশা। চাঁদের আলো ঝরিয়ে কোকিলের ডাকে দশদিক আমোদিত করে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে রসিকতা করে।

কেবল কি ঈশ্বর! যাঁরা আমাদের জন্য এই হাসপাতাল করে দিয়েছেন তাঁরাও কম রসিক কি, ভাবি। তাঁরা জানতেন রক্তাল্পতায় ব্লটিং কাগজের মতন ধবল হয়ে গেছে, শুকনো অশ্বত্থ পাতার মতন হলদে ফ্যাকাসে চেহারা ধরেছে, বা সাপের ছোবল খাওয়া শরীরের মতন কালো নীল হয়ে এসেছে এমন রোগীরা এখানে এসে ঠাঁই নেবে। তাই তাদের মনোহরণের জন্য কত কি কাণ্ডকীর্তি। আপনারা বাইরে থেকে কেউ কোনোদিন যদি আমাদের দেখতে আসেন, এদিক-ওদিক চোখ ফেরালেই টের পাবেন এ বাড়ির দরজা জানালা দেওয়াল কেমন ঝকমক করছে। দেওয়ালের কথাই ধরুন। মনে হবে মেঘের কোলে রোদ উঠে রামধনুর ইন্দ্রজাল ফুটে বেরোচ্ছে। দেওয়ালের লাল নীল সবুজ হলুদ সাতটা রং আঙুল দিয়ে গোনা যায়। চুরাশিটা বেড-এর ওপর বিশাল সিলিং জুড়ে ফ্রেস্কো ঢং-এ আঁকা পদ্মবন। পদ্মবনের ফাঁকে ফাঁকে হংসমিথুন। কেন বলুন তো? চিৎ হয়ে

বিছানায় শুয়ে সারাদিন অসুখের কথা ভেবে মন খারাপ না করে রোগীরা ছবিগুলি দেখবে। নিচের দিকে তাকালে মনে হয়, মস্ত মেঝে জুড়ে সবুজ ঘাসের পর গালিচা বিছানো। জানালায় জানালায় বাহারের মানিপ্ল্যাণ্ট। সবুজ গোল গোল পাতার ফাঁক দিয়ে বাইরের ঝাউ দেবদারুর চূড়া দেখা যায়। কখনও মেঘের আকাশ। মেঘ না থাকলে ঝলমলে তারা বা নীল রৌদ্র। রীতিমত কবিতার ব্যাপার। হুঁ, ডানলোপিলোর গদি আঁটা পরিষ্কার ধবধবে বিছানায় আমরা শুই। ঠাণ্ডায় মোটা কাশ্মীরী কম্বল, গরমে পাতলা সুতীর চাদর। দু হাত অন্তর একটা করে সিলিং-ফ্যান ঈগলের মতন প্রকাণ্ড ডানা ছড়িয়ে সোঁ সোঁ ঘোরে। পাখার হাওয়া ভাল না লাগলে ওয়ার্ড-বয়কে ডেকে এয়ার-কুলার মেশিন চালিয়ে দিতে বলে। ঝিঁঝি ডাকার মতন শব্দ করে মেশিনটা চলতে থাকে গরমের লেশমাত্র থাকে না। তবে গরমের চেয়ে ঠাণ্ডা আমাদের কাবু করে বেশি। মুহুর্মুহু হাত পা বুক পিঠ হিম হয়ে আসে। যে জন্য বছরের বেশির ভাগ সময় পাখা বন্ধ থাকে, এয়ারকুলার চলে না।

আরও কী সব ব্যবস্থা দেখুন। স্ক্রীন, যাকে আমরা পর্দা বলি—তাকিয়ে দেখার মতন। কী উজ্জ্বল শৌখীন রং। যেন সবুজ সাটিনে তৈরি। ঐ সব পর্দা আড়াল করে আমরা যখন পায়খানা প্রস্রাব করি, মনে হয় কি, বসন্তের বনে বসে প্রকৃতির কাজ সারছি। বুঝুন। না, স্ক্রীনের আরও কাজ আছে। বলা ভাল না, কিন্তু না বলেই বা উপায় কি। মনে করুন, কোনো পেশেণ্টের আয়ুর বারোটা বেজে গেল। তখন সবুজ পর্দা টেনে লাশসমেত বিছানাটা ঘিরে রাখা হয়। যতক্ষণ না রোগীর আত্মীয় বন্ধুরা এসে বডি বার করে নিয়ে যায়। আমি এখানে আসার পর কদিনেই কম করেও ডজন তিনেক বিছানা এভাবে পর্দা দিয়ে ঘিরে রাখতে দেখেছি।

আমাদের অক্সিজেন ও সেলাইন ঢোকাবার নলগুলি দেখেও আপনারা আত্মহারা হবেন। তেমনি শরীরে রক্ত ঢোকাবার বাহারী সব টিউব। ফিকে সবুজের ওপর চিরিচিরি সাদা রেখা। অন্য সব হাসপাতালে এ সব নল লাগিয়ে রোগীরা যখন শুয়ে থাকে তাদের আত্মীয়রা দেখে ভয় পায়। এখানে এসব দেখে ভয়ের ছিটেফোঁটা মনে আসে না। মনে হয়, সব কিছুই স্বাভাবিক ও মানানসই। মনে হয়, রোগীরা বুঝি বনজ ওষুধি লতা নাকে ঢুকিয়ে গন্ধ শুঁকছে, বা মুখে ঠেকিয়ে বুনো লতার তেতো মিঠি রস মজা করে চুষছে।

দেখে অবাক হবার মতন আরও জিনিস আছে এই হাসপাতালে। সুদৃশ্য

হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ হাতে সিস্টাররা যখন ছুটোছুটি করে—একবারও কারো মনে হয় না রোগীদের গায়ে ছুঁচ ফোটাতে এসেছে তারা। মনে হবে, পিচকিরি নিয়ে হোলীর রং খেলতে ছুটে এল দিদিমণিরা। বা থার্মোমিটার হাতে যখন আমাদের বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়। মনে হয় না এগুলি থার্মোমিটার। যেন সোনার কাঠি রুপোর কাঠি। সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিদিরা আমাদের ঘুম ভাঙায়, রুপোর কাঠি ছুঁইয়ে আমাদের ঘুম পাড়ায়। আমাদের ভাত খাবার থালাগুলির দিকে একবার তাকাবেন। প্লাস্টিকের যদিও। কিন্তু এমন রং এমন পালিশ ওপরে অবিকল যেন চন্দন কাঠের রেকাবী। পাঁচটা খোপ থালায়। এক খোপে ভাত এক খোপে মাছ একটায় ডাল আর একটায় তরকারি। বাকি একটা খোপে নুন থাকতে পারে সেদ্ধ ডিম থাকতে পারে। যাই থাকুক—পরম তৃপ্তির সঙ্গে আমরা আহার সারি।

এবার আমাদের ইউরিন্যাল—প্রস্রাবের বোতলগুলি দেখুন। যেন জমাদার প্রত্যেকটা বেড-এর নিচে একটি করে সাদা ধবধবে খরগোশের বাচ্চা বসিয়ে দিয়ে গেছে। পেশেন্টের যখন দরকারের সময় বোতল টেনে নেয়—দেখে মনে হয়, খরগোশটাকে কোলে নিয়ে আদর করছে। তাই না সেদিন রসিক নগেন ঘাড় ঘুরিয়ে বগলা মাস্টারকে বলছিল, কি মশাই, আপনার খরগোশ ছানাকে কি ঘাস খাওয়াচ্ছেন? উঁহু, হেসে বারুইপুরের বগলা দত্ত উত্তর করেছিল, জল খাওয়াচ্ছি। শুনে আমরা অনেকক্ষণ ধরে হি-হি করে হেসেছি।

তারপর দেখুন আমাদের বেডপ্যান-এর চেহারা। জামবাটির মতন বিশাল এক একটি পাত্র। ওপরের কলাইকরা রংটিও চমৎকার। সদ্য ফোটা টকটকে জবার রং। হঠাৎ দেখে মনে হয়, চকচকে একটা কাচের ভাণ্ডে এত রক্ত বুঝি টলমল করছে। যে কারণে ঘাটশীলার কেদার পাণ্ডে রোজ পায়খানা করতে বসে একবার করে পাত্রটার গায়ে হাত বুলোয় আর স্ক্রীনের ফাঁক দিয়ে গলা বাড়িয়ে পাশের সীটের বসির মিঞাকে বলে, বুঝলেন গো সাহেব, হাসপাতালে রক্ত নেই শহরে রক্ত নেই তো হয়েছেটা কি—আমার জিম্মায় এখন অনেক রক্ত—দু লিটারের বেশি। শুনে বসির মিঞা পানদোক্তা খাওয়া কালো দাঁতের সারি ছড়িয়ে হাসে ও চোখ নামিয়ে খাটের নিচে লাল টুকটুকে বেডপ্যানটা দেখে, তারপর চোখ তুলে রগুড়ে গলায় বলে, আমিও মাঝেমধ্যে ভাবি কর্তা, এত রক্ত যখন এয়ে গেছে, আমরা শিগ্‌গির মরছি না।

এভাবে পরস্পরের মধ্যে আমরা হাসি মস্করা ঠাট্টা ইয়ার্কি চালাই। দুঃখের

মধ্যেও হাসি। নগেন পোদ্দারের মতন সবাই সময় সময় খুব রসিক হয়ে উঠি। উপায় কি। সারাক্ষণ রক্তের ভাবনা, মৃত্যুর ভয় ভাবতে ভাল লাগে? মূতের বোতল পায়খানার পাত্র নিয়ে আমাদের রসিকতা করতে আটকায় না।

যেমন ডাক্তারবাবুরা। মসুর ডালের জুস ও ভেজিটেবল সুপ খাওয়ার গল্প শোনায়। ঐ খেয়ে এমন তাগড়াই চেহারা এক একটির। তার মানে কি, আমাদের সঙ্গে মস্করা করতে ভালবাসেন তাঁরা। যেমন নার্স দিদিরা। স্রেফ বার্লির জল গিলে এমন গোলাপী মোহিনী মূর্তি সব। এ সব বলে আমাদের ধাপ্পা দেওয়ার দরকার আছে। যেমন আমাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখতে, এতক্ষণ যা বললাম, চারদিকে এত সব উদ্যোগ আয়োজন। সুতরাং, ডাক্তার নার্স সবাই নানা আজগুবি গল্প শুনিয়ে রোগীদের প্রবোধ দেবে, মন ঠাণ্ডা রাখবে জানা কথা।

তা বলে কি আমরা রাগ করি। মোটেই না। সময় সময় বিরক্ত হই, এই পর্যন্ত। তা না হলে তাজা টগবগে শরীর নিয়ে রক্তের এক একটা পিপে হয়ে সাহেব ডাক্তাররা যখন রোগীদের বিছানার পাশে এসে দাঁড়ান—দেখে আমাদের ভাল লাগে। আমরা আশ্বস্ত হই। পৃথিবীতে আজও অনেক তরতাজা মানুষ বাস করে। চিন্তা করি। রক্ত পেলে একদিন এমন দশাসই চেহারা বাগিয়ে গটমট করে আমরাও ঘোরাফেরা করতে পারব। ডাক্তারবাবুরা যখন আমাদের গায়ে হাত রাখেন নাড়ি টেপেন—আমরা টের পাই ঐ সমস্ত বিরাট বিরাট শরীরের গরম রক্ত আমাদের হিম হয়ে আসা শরীরে বেশ ভাল রকম তাপ সঞ্চার করছে। এভাবে রোজ আমাদের মৃত্যু পাঁচ ছ' মিনিট করে পিছিয়ে যায়। কম লাভ? সেই-রকম নার্স দিদিরা যখন কাছে এসে দাঁড়ায় আমরা খুশি হই। আমাদের বগলে থার্মোমিটার গুঁজে দেয়, মাথা ধুইয়ে গা স্পঞ্জ করে দেয়, আমাদের বিছানা সাজিয়ে দেয়। আমাদের পচা ফ্যাকাসে শরীরের অতি কাছে সরে আসে তারা। তাই কৃষ্ণনগর কলেজের প্রফেসার সুধীর সেন, ভদ্রলোক খুবই গম্ভীর, কম কথা বলে, কিন্তু এক একদিন রসের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেয় এবং এককালে যে কাব্যচর্চা করত বোঝা যায়। সেদিন সিস্টারদের সম্পর্কে বলছিল, লাবণ্যময়ীদের শরীর থেকে নির্গত সুগন্ধী শ্বাস আমাদের রুগ্ন দেহে সালসার কাজ করে। শুনে সকলে হো-হো করে হেসেছি। কথাটা উপভোগ করার মতন।

এভাবে যতক্ষণ পারি, যতটা পারি, আমরা এ ওকে হাসির কথা শুনাই। মৃত্যুচিন্তা ঠেকিয়ে রাখি।

এবং এই ব্যাপারে আমার উৎসাহও কম না। হাঁটতে কষ্ট হয়, তা হলেও এই

বেড সেই বেড-এর রেলিং ধরে ধরে কষ্টেসৃষ্টে এগোই এবং এক একটি বিছানার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। আমাকে দেখে রোগীরা খুশি হয়। আদর করে বসতে বলে। আমি বসি গল্প করি। তারা জেনে গেছে আমি তাদের দলের একজন। বা একটু বেশি হতভাগা। ঠনঠনের মহামায়া প্রেস মাসান্তে যে কটা টাকা আমার হাতে তুলে দেয় তাতে কোনোকালে বিয়ে করে ঘরসংসার পাতা চলবে না। যে কারণে চল্লিশেও আমি অকৃতদার। এদিকে আত্মীয় বন্ধু বলতে এমন কেউ নেই যে, নিজের শরীর থেকে রক্ত দিয়ে ভালবেসে আমাকে নীরোগ সজীব করে তুলবে। পুঁজির মধ্যে হাতঘড়িটা সম্বল। ঠিক করেছিলাম, ওটা বেচে দিয়ে রক্ত কিনব। এখন রক্তের বাজারের যা হালচাল দেখছি।

কাজেই আমাদের সকলের অবস্থা এক। তবে একটি দুটি ভাগ্যবান আছেন এখানে। যেমন ষোল নম্বর বেড-এর পেসেন্ট—মুড়াগাছার জোতদার মহিম হালদার। না, মহাশয়টি আমাদের সঙ্গে গল্পগুজব করা পছন্দ করেন না। কেন করবেন—আমাদের মতন রক্তের দুর্ভাবনা তাঁর নেই। পিতৃভক্ত দুই ছেলে রক্ত দিতে চাইছে। দু ছেলের বউ রক্ত দিতে চাইছে। দু' মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে তাতে কি। তারাও দরকার হলে বাবাকে রক্ত দেবে। সেই সঙ্গে জামাইরা। তারপর শোনা যাচ্ছে, বিবাহিত দুই শালীও মহিমবাবুকে রক্ত দেবার জন্য তৈরি হয়ে আছে। এবং সেই সুবাদে ভায়রা-ভাই দুটিও। এবং এদের প্রায় সকলের রক্তের সঙ্গে মহিমবাবুর গ্রুপ নাকি মিলে গেছে। কাজেই সবদিক থেকে লোকটির সোনার কপাল। না, আরও আছে। জোতদারের অনুচর অনুগৃহীতেরা। বেলায় বেলায় দল বেঁধে মহিমকে যারা দেখতে আসছে। মানুষটাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য দরকার মতন তারাও যে রক্ত দিতে পিছপা হবে না এমন একটা ভাব সকলের চোখে-মুখে। তবে মহিম হলদার নাকি বলে দিয়েছেন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের রক্ত ছাড়া অন্য কারো রক্ত তিনি শরীরে ঢোকাবেন না। রক্তের ব্যাপারে তিনি কুলমর্যাদা মেনে চলেন। অহঙ্কারের কথা বইকি। কিন্তু হালদার মশায়ের আরও একটা বড় অহঙ্কারের কথা কাল আমাদের কানে এসেছে। হেড-ওয়ার্ডবয় বৈকুণ্ঠ হাজরার মুখে যা শুনলাম। কাল শোয়ার সময় মহিম নাকি বড় সিস্টারকে হাসতে হাসতে বলছিলেন, মানুষের মন কখন কোনদিকে মোচড় নেয় বলা যায় না—যদি এমন দিন আসে যে ছেলেমেয়েরা বউয়েরা শালীরা বা ভায়রাভায়েরা শেষ পর্যন্ত বিগড়ে যায়—মানে রক্ত দিতে গাঁইগুঁই করে, নিজের শরীরের রক্তের ওপর মানুষের সবচেয়ে মায়া বেশি—এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না—সেই

অবস্থায়ও মহিম এতটুকু ঘাবড়াবেন না। কারণ তাঁর টাকার অভাব নেই। কলকাতার কোনো ব্লাড-ব্যাঙ্কে রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না তো বয়ে গেছে। দিল্লী থেকে বোম্বে থেকে—দিল্লী বোম্বেতে পাওয়া না যায় তো চণ্ডীগড় থেকে শ্রীলঙ্কা থেকে তিনি রক্ত আনাবেন। প্লেনে করে নিজের রক্তের স্যাম্পেল পাঠিয়ে দেবেন। আবার সেই প্লেনে উড়েই তাঁর জন্য বোতল বোতল রক্ত কলকাতায় চলে আসবে। ক' ঘণ্টার মামলা! হাঙ্গামা কিছুই নেই।

এসব শুনে এবং মানুষটাকে নিত্য দেখে আমাদের চোখ ঝলসে যায়। এই ওয়ার্ডের ষোল নম্বর বেড্ আমাদের কাছে রাজসিংহাসনের মতন। সেই চোখ নিয়ে আমরা সেদিকে তাকিয়ে থাকি। রাজার মেজাজ নিয়ে হালদার মশাই তাঁর ঐ সিংহাসনে শুয়ে বসে দিন কাটান। মাথাপিছু আট টাকা মজুরিতে চার চারটে অ্যাটেণ্ডেণ্ট। ইয়ার্কি! রাত্রে দুজন দিনমানে দুজন তাঁর পরিচর্যায় রত। আর কত লোকের আনাগোনা। ছেলেরা মেয়েরা বউয়েরা জামাইরা শালীরা, স্বয়ং গিন্নী এবং মহিমের বাধ্যের মানুষেরা কতবার করে তাঁকে দেখতে আসছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিচ্ছে। যখন যে আসছে হাতে করে ফলমূল সন্দেশ এবং ছোটবড় হরেক সাইজের মোড়ক বা টিনের কৌটোয় প্যাক করা নানারকম খাদ্য নিয়ে ঢুকছে। একটা মানুষ কত খেতে পারে? না, মহিম হালদারকে দেখতে আসার জন্য ভিজিটিং কার্ড বা ভিজিটিং আওয়ারের কড়াকড়ি একেবারে নেই। যখন যে খুশি ভিতরে ঢুকে পড়ছে—যতক্ষণ খুশি তাঁর কাছে থেকে যাচ্ছে।

যত কড়াকড়ি আমাদের গরীবদের বেলায়—ক্ষিতীশ সামন্ত কাল আফসোস করছিল। আমাদের আত্মীয় বন্ধুদের দুটোর বেশি তিনটে ভিজিটিং কার্ড ইস্যু করা হয় না। দু' ঘণ্টার বেশি—তা-ও সকালে বা দুপুরে তো নয়ই, বিকেলেও আমাদের লোকদের থাকতে দেওয়া হয় না। এই পক্ষপাতিত্ব কেন?

এই নিয়ে কাগজে লেখালেখি দরকার। বগলা মাস্টার বলছিল।

বুঝলেন, পয়সা। ভুতু কবিরাজ দু' আঙুলে টাকা বাজিয়ে বলছিল, এই যার আছে ঈশ্বরও তাকে খাতির করে। হাসপাতালের লোকেরা করবে জানা কথা।

তা এত যার পয়সা সে কেন আমাদের মতন হরিজনদের সঙ্গে ফ্রী-ওয়ার্ডে। কেবিনে থাকতে বাধা ছিল কি! কেদার পাণ্ডে প্রশ্ন তুলেছিল।

উঁহু, বাধা কিছু নেই—সেই মুহূর্তে হেড-ওয়ার্ডবয় বৈকুণ্ঠ আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। মহিম হালদারের অনেক কিছুর খবর সে রাখে। বলল, জোতদার মশাই আমাদের বুদ্ধি নিয়ে চলেন না। দেশে চাষবাস নিয়ে থাকেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর কাজকারবার। এখানেও তিনি জেনারেল ওয়ার্ডে সাধারণ মানুষের সঙ্গে থাকতে চান। কেবিন পছন্দ করেন না।

সে কি! কথাটা হেঁয়ালির মতন ঠেকে। হাঁ করে বৈকুণ্ঠের মুখের দিকে সকলে তাকাই।

তখন বৈকুণ্ঠ হাজরা গুহ্য ব্যাপারটা ফাঁস করে দেন। বত্রিশ পাটি দাঁত ছড়িয়ে হাসে। মহিম হালদারের ছোট ভায়রার কাছ থেকে সে জেনে গেছে। সামনের ইলেক্‌শনে হালদার মশাই দাঁড়াচ্ছেন। তাই সর্বদা মুখে 'সাধারণ' 'সাধারণ' করছেন। আশা দেশের গরিবগুরবো সাধারণ মানুষের ভোট পেয়ে জিতে যাবেন। তারপর মন্ত্রী হবেন।

আহা, এমন মানুষের সকলের আগে বেঁচে থাকার দরকার। ভুতু কবিরাজ বলল, তিনি যে মন্ত্রী হবেন। মন্ত্রী হবার আগে কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয় বৈকি। কথা শেষ করে ভুতু সেন বড় করে শ্বাস ফেলতে যাচ্ছিল। নগেন পোদ্দার বাধা দিল। ধুত্তুরি মশাই, আসল খবর আপনারা কেউ জানেন না। ইলেক্‌শনে দাঁড়ানটাড়ান কিছু নয়। ওসব হল ওপর চালাকির কথা। ব্যাপার হল কি, হালদার মশাই-এর ভূতের ভয় বেশি। তাঁর ছোট শালীকে কাল সুযোগ পেয়ে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। যে কারণে হালদারের কেবিনে থাকা হয়নি। ওখানে একলা থাকলে ভয় পেয়ে মরে যেত।

কেন, বগলা মাস্টার প্রতিবাদ করেন। একলা থাকার অর্থ কি। দিনের বেলা যেমন, রাতের জন্য দু' দুটো লোক রাখা হয়েছে। এমন দুটো তরতাজা অ্যাটেণ্ডেন্ট থাকতে হালদারের ভূতের ভয়টা কোথায় ছিল!

এবার নগেন গলা খুলে হাসল। বলল, তবেই বোঝা যাচ্ছে হাসপাতালের হালহদিস কিছুই এখনো আপনাদের জানা হয়নি। রাতের অ্যাটেণ্ডেন্ট কি আর মানুষ থাকে দাদা। রাত দশটার পর তারাও ভূত হয়ে যায়। ভূত এসে আগে তাদের কাঁধে চাপে। তারা ভুসভুস করে নাক ডাকায়—তারপর ভূত বাবাজী রোগীকে নিয়ে পড়ে। বুঝুন।

হাত নেড়ে ও চোখের মণি ঘুরিয়ে এমন চমৎকার রসাল করে নগেন বলতে লাগল—হাসতে হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরার উপক্রম। সারাটা বিকেল

এভাবে প্রাণখুলে হেসে সকলে উপভোগ করেছি। পয়সার গরমে মহিম হালদার আমাদের কারো সঙ্গে কথা বলে না—এই ক্ষোভ আফসোস আমাদের শেষ পর্যন্ত আর থাকে না।

এই জন্যই ওয়াং সাহেবকে আমাদের এত ভাল লাগে। বলেছি, বেন্টীং স্ট্রীটে তার প্রকাণ্ড জুতোর দোকান। অনেক পয়সার মালিক। কিন্তু এক ফোঁটা অহংকার নেই। হাসপাতালে কেবিন ভাড়া করে থাকলে হবে কি, যখন তখন আমাদের কাছে চলে আসে। যেন আমাদের সঙ্গে গল্পগুজব না করলে চীনা সাহেবের খাওয়া হজম হয় না। আর কী সাদাসিধে পোশাক। সাদার ওপর কালো ডোরাকাটা বালিশের খোলের মতন ঢলঢলে পাজামা। গায়ে সস্তা সুতীর ফতুয়া। তা-ও দুটো বোতাম আছে, দুটো নেই। যেজন্য বুকের নিচের দিকে জামাটা হাঁ হয়ে থাকে সারাক্ষণ। যেমন চব্বিশ ঘণ্টা হাঁ করা একটা হাসি সাহেবের মুখে লেগে আছে। আর ঐ হাসির জন্য দু পাশের দুটো সোনাবাঁধান দাঁত ঝকমক করে। তবে ওপর ও নিচের পাটির কটা করে দাঁত নেই। তাতে যেন আরও ভাল লাগে ওয়াংকে। দাঁত পড়া মুখের হাসিটাকে শিশুর হাসির মতন দেখায়। এবং মানুষটা যে সরল নিরীহ সন্দেহ নেই। যখন হাসতে থাকে ছোট কুতকুতে চোখ দুটো একেবারে বুজে যায়। আহ্লাদে আটখানা হয়ে শিশুরাও এমন চোখ বুজে হাসে।

সকলের সঙ্গে সাহেবের হাসি গল্প মেলামেশা। তবে আমার সঙ্গে খাতিরটা একটু বেশি জমে গেছে। কারণ কি? না কি ওয়াং বুঝে গেছে এখানে আমি সবচেয়ে বেশি হতভাগ্য! জানি না।

মহিম হালদারের একটা লজ্ঝড় টেম্পো আছে। সম্ভবত তার খামারবাড়ির ধান চাল আনা নেওয়ার কাজে ওটা ব্যবহার করা হত। এখন দেখছি ছেলেরা ছেলে-বউরা এবং হালদার গিন্নী ঐ টেম্পো চড়ে হাসপাতালে মহিমকে দেখতে আসে। মেয়ে দুটিও তাদের বরকে নিয়ে ঐ একই গাড়িতে কুমড়োঠাসা হয়ে হাসপাতালে বাবাকে রোজ দেখতে আসছে।

একসঙ্গে অত ছোট গাড়িতে সকলের জায়গা হয় না বলে দ্বিতীয় দফায় ঐ টেম্পো চড়েই মহিমের শালীরা ও ভায়রা ভায়েরা হাসপাতালে আসে। আমাদের রোগীদের কাছে এমন দৃষ্টিকটু ঠেকে জিনিসটা! মহিমের আত্মীয়স্বজন যে

কোনোদিনই ট্রেনভাড়া ট্যাকসিভাড়া দেয় না বোঝা যায়। ভয়ানক কঞ্জুস মানুষগুলি। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি।

কিন্তু ওয়াং-এর বেলা অন্যরকম। বিকেল চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে সার দিয়ে গাড়ি দাঁড়ায় হাসপাতালের লনে। সব কটা দামী, সব কটা নতুন গাড়ি। কি ডিজাইন সেসব গাড়ির। দেখে চোখ জুড়োয়। মা ষষ্ঠীর কৃপায় ওয়াং সাহেবের সন্তানসংখ্যা একটু বেশি। পাঁচ ছেলে ছয় মেয়ে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। পাঁচ-ছেলের যেমন পাঁচখানা গাড়ি, ছয় মেয়ের ছ'খানা গাড়ি। ওয়াং সাহেবের গিন্নীর আলাদা গাড়ি। বেশ বড় ব্রাউন রং। নিউ-মডেলের ফিয়াট। মনে হয় সুস্থ অবস্থায় ওয়াং ঐ গাড়ি চড়ে বেড়াত। এক ডজন গাড়ি শুধু বাড়ির লোকের। আরও দশ বারোটা গাড়ি রোজ বিকেল পড়তে হাসপাতালে ছুটে আসে। ওয়াং যে ভয়ানক বন্ধুবৎসল তার প্রমাণ। বেন্টিং স্ট্রীট তো আছেই, টেরিটিবাজার টেংরা তপসিয়া থেকে কম করেও বারো চৌদ্দজন চীনা সাহেব ওয়াংকে দেখতে আসে। সবাই ভাল ভাল গাড়ি চড়ে আসে। সবাই ব্যবসা বাণিজ্য করে। দেদার পয়সার মালিক এক একজন।

কাজেই বিকেলে লনের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, কোনো ভি আই পি বুঝি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাঁকে দেখতে এই গাড়ির ভিড়। মহিম হালদারের রংচটা পুরানো টেম্পোটা দেখলে কি তা মনে হয়!

যে কথা বলছিলাম। হালদারকে রক্ত দিতে যেমন লোকের অভাব নেই, ওয়াং সাহেবরও লোকবল কিছু কম না। বরং বেশি। ছেলেরা বউরা মেয়েরা জামাইরা ওয়াং-কে রক্ত দেবে। ওয়াং-এর কাছ থেকে সেদিন তেমন আভাস পেলাম। বেন্টিং স্ট্রিট টেরিটিবাজার তপসিয়া টেংরার চীনা সাহেবরা ও তাদের মেমরাও নাকি ওয়াং-কে রক্ত দিতে চাইছে। তা বলে এই অহংকার নিয়ে মুড়াগাছার জোতদারের মতন ওয়াং ফুলে থাকে না। আর যদি বাইরে থেকে রক্ত আনাবার কথাই ওঠে, টাকার জোরে যা হয় মহিম হালদার বড় গলায় সিস্টারকে যেমন বলছিল, ওয়াংও কি বোম্বে দিল্লী থেকে—চণ্ডীগড় বা শ্রীলঙ্কা থেকে রক্ত আনাতে পারে না! খুব পারে।

জোতদারের খেতের ধান তার পরিবারের পাঁচজনে খায়, গাঁয়ের মানুষ কিছু কিনে খায়। বাকিটা সরকারী গুদোমে জমা হয়ে পরে এই রেশন-সপে সেই রেশন-সপে বিলি হয়।

আর ওয়াং-এর ফলাও জুতোর কারবার। তার দোকানের জুতো কলকাতার

মানুষের পায়ে যেমন ওঠে, তেমনি শোনা যায়, বাক্সবন্দী হয়ে গ্রোসে গ্রোসে দেশবিদেশে চলে যায়। ওয়াং-এর কারবারের এক্সপোর্টের দিকটাই নাকি বড়। সুতরাং কী পরিমাণ টাকা আছে লোকটার অনুমান করা কঠিন না। কে জানি বলছিল, তেমন দরকার হলে বোম্বে দিল্লী চণ্ডীগড় কেন—ইংলণ্ড আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া কি খাস চীন মুলুক থেকে ওয়াং রক্ত আনিয়ে নেবে।

তা নিজের এই ক্ষমতার কথা বড়াই করে একদিনও কি ওয়াং কাউকে বলেছে। শুনিনি। কতদিন তো আছে এই হাসপাতালে।

এই জন্যই বলি, একেবারে সোনার মানুষ। ওই যে ইংরেজীতে বলে সেণ্ট —ওয়াং-কে দেখে তাই মনে হয়। ঠিক একটি সাধু-সন্তর মতন। একটু মেজাজ নেই, দেমাক নেই। আর ওই তো বেশভূষা চালচলন—কত সাধারণ! দামী দামী জুতো তার দোকানে সাজান থাকে। আর নিজে পরে থাকে আড়াই টাকা দামের হাওয়াই চপ্পল।

না, কিপটে বলব কেন। আসলে তার প্রকৃতিটাই এমন। বড্ড বেশি সাদাসিধে ও সরল। সরল বলেই মুখে সর্বদা ঐ শিশুর হাসি। আর অবিশ্বাস্য রকম অমায়িক ভদ্র ব্যবহার সকলের সঙ্গে।

ইণ্ডিয়ান কিংস বা রথম্যান মার্কা দামী সিগারেট যেমন তাকে খেতে দেখি—আমাদের কাছে গল্প করতে এলে আদর করে যদি কেউ বিড়ি অফার করে হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে ওয়াং তা-ও নেয়। বিড়িটা ধরিয়ে যখন টানতে থাকে তার ছোট চোখ দুটো বুজে খিয়ে একেবারে লেপাপোছা হয়ে যায়। চ্যাপ্টা নাকের দু'পাশে সমান্তরাল রেখার দুটো ভাঁজ পড়ে, কপালের সাদা শুকনো চামড়ার নিচে পেঁয়াজ রসুনের শিকড়ের মতন সূক্ষ্ম শিরগুলি ভেসে উঠে তিরতির কাঁপতে থাকে। দেখে মনে হয় ভারি সুখ পাচ্ছে ওয়াং বিড়ি টেনে। নিষ্ঠার সঙ্গে টানছে।

এখন আমাদের কথায় ফিরে আসা যাক। গল্পগুজব হাসি মস্করা কিন্তু সবদিন চলে না। হঠাৎ এমন একদিন আসে—যেন চুরাশিজন রোগীর আশিজনই অতিরিক্ত অসুস্থ হয়ে পড়ি। শুয়ে থেকে কেবল আঃ উঃ করা অথবা মড়ার মতন নির্জীব হয়ে থাকা। এটা তো সত্য—রক্ত পেতে যত দেরি হচ্ছিল, মনের দিক থেকে আমরা ভেঙে পড়ছিলাম। আর আমাদের স্বাস্থ্যেরও দ্রুত অবনতি ঘটছিল। আমরা টের পাচ্ছিলাম, এক একটি বিছানার কাছে রোজ যম এসে দাঁড়াচ্ছে। তার চোখে মুখে অধৈর্য। যেন গলা উঁচু করে সে বলতে চাইছে—

চলে এসো চলে এসো। এত কষ্ট এত কাতরানি কেন। যম চেঁচাতে পারে না, শব্দ করে চলাফেরা করতে জানে না। নিঃশব্দ ছায়ার গতি নিয়ে আসে, হাত নেড়ে ইশারা করে, তারপরও আবার চলে যায়। তবে হ্যাঁ, নিয়মিত আসছে সে। কাশী মিস্তিরের কথা শোনার পর থেকে এই ধারণা আমাদের মনে ক্রমশ শিকড় গেড়ে চলেছে। কদিন বিশ্রী ঘোলাটে আবহাওয়া যাচ্ছিল। না রোদ না বৃষ্টি না হাওয়া। একটা শ্বাসরোধী গুমোটের মধ্যে আকাশ মাটি ও পৃথিবীর জীবজন্তু যেন ধুঁকছিল। সকালে বিকালে বাইরের দেবদারু ও ঝাউগাছে পাখির কিচির-মিচির আর কানে আসছিল না। সন্ধ্যার পর বা দুপুরে রাস্তার কুকুরের ঘেউ-ঘেউ কত শুনি। এখন সব বন্ধ। আর ঐ যে বারান্দার রেলিং-এর গায়ে কাকের ঝাঁক উড়ে এসে বসে কা কা করে। তারাও আর আসছে না। আসে, এক ঝাঁক না—গোনাগুনতি ঠিক একটা কাক। যেন অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ও গম্ভীর সে। এসে কর্কশ গলায় গা গা করে ঠিক একবার কি দুবার ডাকে। তারপর থেমে যায়। মশাইরা, এই হল আসল কাকের ডাক। কাশী মিস্তির আমাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলছিল, শুনেছেন? এতদিন আমরা নকল কাকের ডাক শুনছিলাম। উৎসুক চোখে সকলে উকিলের মুখের দিকে তাকাই। তখন কাশী মিস্তির গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল, বলল, হাঁ তাই। রামায়ণে পড়েন নি? রাবণের ভয়ে ধর্মরাজ যম একবার কাকের মূর্তি ধরে প্রাণ বাঁচিয়ে ছিল।

হুঁ হুঁ, কেদার পাণ্ডে বলল, যম কাকের বেশ ধরে, কুবের গিরগিটি হয়ে যায়, বরুণ হয়ে যায় হাঁস। এভাবে দশাননের চোখে ধুলো দিয়ে তিনজন তির্যক যোনিতে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

তবে তো আপনাদের জানাই আছে সব। কাশী মিস্তির বলল, কাজেই এখন ধরে নিতে পারেন, এতকাল আমরা এখানে নকল কাকদের ডাক শুনেছি —এখন সময় হয়েছে, যে ডাকবার ঠিক এসে ডাকছে।

উকিলের কথা শুনে সবটা ওয়ার্ড থমথম করে। এ ওর মুখের দিকে তাকায়। তখন নগেন পোদ্দার হাসে। দুদিন ধরে তার শরীর খুব খারাপ যাচ্ছিল। কিন্তু ঐ যে—খারাপ শরীর নিয়েও সে হাসে—আমাদের হাসাতে চায়। বলল, আর একটা জিনিস আপনারা লক্ষ করেছেন কি! কি জিনিস? সকলে নগেনের দিকে চোখ রাখি। নগেন বলল, কদিন ধরে অলুক্ষণে বেড়ালটা ভেতরে ঢুকছে না। দোরের কাছে উঁকি দিয়ে একবার ম্যাঁও ডাক দিয়ে চলে যায়। হুঁ তাই তো—আমরা স্বীকার করলাম, এর অর্থ কি? একসঙ্গে সবাই প্রশ্ন করি।

নগেন বলল, অর্থ খুবই সহজ। পাঁজিটা জ্যোতিষ জ্ঞানে আপনাদের অজানা নেই। হারামজাদা টের পেয়েছে, এবার টাকুস টাকুস করে আমরা এক একজন চোখ বুজব, আর আমাদের গিন্নীদের এ-জন্মের মতন আঁষ খাওয়াটা বন্ধ হবে। এখন গেরুস্থ বাড়িতে মাছ রান্না বন্ধ হলে ওরই সবচেয়ে বেশি অসুবিধে। সেই শোকে শয়তান আর ভেতরে ঢোকে না—দোরের কাছে একবার উঁকি দিয়ে একটা নৈরাশ্যের ডাক দিয়ে চলে যায়।

শুনে সকলে ক্ষীণ গলায় হাসি। এই হাসি মস্করা খুব অল্প সময়ের। আবার সব চুপ হয়ে যাই। যন্ত্রণায় আঃ উঃ করি। বলব কি, চারদিকের এমন রামধনু রঙের জমকালো দেওয়াল, হংসমিথুন ও পদ্মবন আঁকা বিশাল সিলিং নিয়ে সবটা হলঘর একটা অন্ধকার ভয়ের সমুদ্রের চেহারা ধরে এবং থেকে থেকে ঐ সমুদ্রে দীর্ঘশ্বাস ও হতাশার ঢেউ উঠতে থাকে পড়তে থাকে।

আমরা সবাই মৃত্যুপথযাত্রী। এখানে একমাত্র ব্যতিক্রম মুড়গাছার জোতদার মহিম হালদার। তিনি নিরাপদ ও সুরক্ষিত। দীর্ঘশ্বাস ও হতাশার ঢেউ তাঁকে স্পর্শ করে না। তাঁর রক্তের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কাল পরশুর মধ্যে তো এসে যাবে। প্রচুর তাজা রক্ত শরীরে ঢুকিয়ে সুস্থ হয়ে হাসতে হাসতে এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন।

ষোল নম্বর বেড্-এর দিকে চোখ পড়লে আমাদের মনে হয় অন্ধকার সমুদ্রের বুকে একটা আলোকস্তম্ভ হয়ে জোতদার তাঁর বিছানায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে বসে আছেন। হাসপাতালে তাকিয়া বালিশ ব্যবহার করার নিয়ম নেই। ডাক্তারবাবুদের স্পেশ্যাল পারমিশন নিয়ে হালদারের বাড়ির লোকেরা শিমুল তুলোয় ঠাসা মোটাসোটা দু'খানা তাকিয়া নিয়ে এসেছে। কেনই বা আনবে না। মানুষটা তো মরছে না। আর দশটা রোগীর মতন চেপ্টা চামড়ার বালিশে শুয়ে কষ্ট পাবে কেন। মহিম বাঁচবেন। তাই হাসপাতালেও তাঁর আরাম সুখের নানা আয়োজন। এইমাত্র আপেল আঙুর খেলেন। এখন হরলিকস্ খাচ্ছেন। একটু আগে নাপিত ক্ষুর দিয়ে মুখখানা ভাল করে কামিয়ে সুগন্ধী লোশন মাখিয়ে গেছে। একদিন অন্তর জোতদার দাড়ি কামান। আমাদের মতন খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে ভূত সেজে থাকায় তাঁর ঘোর আপত্তি। স্বাভাবিক। যমের দুয়ারে পা রেখে নিয়ম করে গোঁফ দাড়ি কামাতে আমরা ভুলে গেছি—কিন্তু মহিম ভুলবেন কেন। বরং চারদিকে এতগুলি মরণোন্মুখ মুখ দেখে জীবনের দাম তাঁর কাছে অনেক বেশি বেড়ে

গেছে। এই মাত্র অ্যাটেণ্ডাণ্ট দুজন তাঁর শরীর ম্যাসেজ করে দিচ্ছিল। এখন পাউডার-টাউডার মাখিয়ে মাথা আঁচড়ে দিয়ে সিল্কের জামা গায়ে পরিয়ে দিয়েছে। সেজেগুজে তাকিয়া ঠেস দিয়ে হরলিকস্ খেতে খেতে মহিম অপেক্ষা করছেন। তাঁর বাড়ির লোকেরা আত্মীয় বন্ধুরা এবং অনুগ্রাহীতের দল এখনি এসে যাবে। ঘড়ির কাঁটায় তিনটে চল্লিশ। বিকেল পড়ে গেছে।

বলেছি, গালগল্প আর জমছিল না। আমরা সবাই অসুস্থ ক্লান্ত বিষণ্ণ। তারপর এই অন্ধকার ঘোলাটে দিন। একা বিছানায় শুয়ে থেকে হাঁপিয়ে উঠছিলাম। তাই আস্তে আস্তে এক সময় বিছানা থেকে নেমে খাটের মাথা ধরে ধরে প্রথমটা বারান্দায়, তারপর বারান্দার রেলিং ধরে ধরে ধুঁকতে ধুঁকতে ওয়াং সাহেবের কেবিনে গিয়ে ঢুকি। আমায় দেখে সাহেব কী যে খুশি হয়। কাম অন, কাম অন বাবু! ছিট্‌ ডাউন হিয়ার। কাগজের মতন সাদা শীর্ণ আঙুল দিয়ে ওয়াং তাঁর খাটের পাশটা দেখিয়ে দেয়। আমি হাসতে হাসতে বসে পড়ি। ওয়াং দামী সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দেয়। আমি একটা তুলে নিই। ওয়াং একটা তুলে নেয়। তারপর তার চকচকে গ্যাস-লাইটার জেলে আগে আমার, পরে নিজের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে।

এবার বলো সাহেব, আজ কেমন আছ! মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে আমি প্রশ্ন করি। তোমার শরীর ভাল তো?

একজন রোগী আর একজন রোগীকে এ ছাড়া আর কী প্রশ্ন করতে পারে! শরীরের কথা স্বাস্থ্যের খবরাখবর এখন আমাদের কাছে সব।

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে সাহেব পিটপিট করে তাকায়। মিটমিট হাসে। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, তিউ নি সিফুৎ, তিউ নি সিফুৎ।

আমি চুপ। এই রসিকতাটা রোজ সে করে। অথচ ইংরেজী বলতে পারে হিন্দী বলতে পারে, বাংলাও বেশ ভাল শিখে গেছে কলকাতায় থেকে থেকে। কিন্তু তার মাতৃভাষাটাই আমাকে আগে শোনায়।

বোকার মতন আমি হাঁ করে থাকি। তার ভাষা এক বর্ণও বুঝি না। অসহায়ের মতন একভাবে তাকিয়ে আছি দেখে তখন যদি সাহেবের মায়া হয়। আমার কাঁধের ওপর একটা হাত তুলে দিয়ে ওয়াং শব্দ করে হাসে। তারপর মুখের কাছে মুখটা সরিয়ে এনে বলে, ভাল আছি বাবু, আমি ভাল আছি।

শুনে খুশি হই। বেশ বেশ! এবং মনে মনে বলি, আমাদের রোগীদের একদিনা ভাল থাকার অর্থ একদিন বেশি বাঁচা। তৃপ্ত মনে সিগারেট টানি।

কিন্তু ওয়াং আবার মিটিমিটি হাসে। তারপর দুম্ করে তার চৈনিক ভাষায় প্রশ্ন করে, নি হাও মা ?

আবার আমি অথৈ জলে পড়ি। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকি। দেখে আবার সাহেবের মায়া হয়। তখন সে হাসতে হাসতে বলে, তুমি কেমন আছ, বাবু ?

ভাল. আমি ভাল আছি। ইচ্ছা করে ভাল শব্দটার ওপর জোর দেই। শুনে ওয়াং খুশি হয়। না হলে সে মুখ কালো করে।

কিন্তু এই লুকোচুরি ক'দিন চলে! আমি যে ভয়ানক অসুস্থ ভয়ানক দুঃখী। কারো কাছ থেকে রক্ত পাবার আশা নেই, সুতরাং আমার বাঁচারও আশা নেই। এই জিনিস আমি কতকাল ঢেকে রাখতাম ? সেদিন আমার মুখ থেকে আসল কথাটা বেরিয়ে পড়ল।

হাউ আর ইউ বাবু, তুমি কেমন আছ ? আজ আর তার মাতৃভাষা না। সরাসরি ইংরেজীতে তারপর বাংলায় আমাকে প্রশ্ন করল।

নো, নট গুড, আমি ভাল নেই সাহেব। অল্প করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওয়াং-এর প্রশ্নের জবাব দেই। তারপর চুপ করে থাকি।

মুখে সিগারেট গুঁজে ওয়াং সেটা ধরতে ভুলে যায়।

তুমি কেমন আছ সাহেব, তুমি ভাল তো ? আমি পাল্টা প্রশ্ন করি। সাহেব আস্তে মাথা ঝাঁকায়। অন্যদিনের মতন উচ্ছ্বাস নেই। কেননা আমাদের দু'জনের একজনের কেবল ভাল থাকা তার মনঃপূত না। ওয়াং বেদনাবোধ করে। লাইটারটা তুলে নিয়ে এবার আমি ওয়াং-এর সিগারেট ধরিয়ে দেই, তারপর নিজে ধরাই। কতক্ষণ চুপচাপ কাটে। সামনের দেওয়ালে একটা টিকটিকি হাঁটে। ওয়াং এক দৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে !

তার এতটা চুপচাপ আমার ভাল লাগছিল না।

তোমার রক্তের কি হল সাহেব ? স্যাৎ ? আমি আস্তে শুধাই।

এবার ওয়াং-এর মুখে হাসি ফুটল। কেননা তার সঙ্গে এতদিন মেলামেশা করে আমি তার মাতৃভাষার ঐ একটা শব্দ আয়ত্ত করতে পেরেছি। স্যাৎ, রক্ত।

ইয়েস স্যাৎ। অল্প করে হেসে ঘাড় দুলিয়ে ওয়াং বলল, মাই ব্লাড ইজ কামিং। শিগগির রক্ত এসে যাবে। তার ছেলেরা রক্ত দিতে চাইছে, মেয়েরা মেয়ে-জামাইরা, দরকার হলে ওয়াং-গিন্নীও রক্ত দেবে। তাছাড়া টেরিটিবাজার, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, বৌবাজার ও তপসিয়ার অগুনতি চীনা সাহেব ওয়াং-কে রক্ত

দেবার জন্য প্রস্তুত। তার রক্তের ভাবনা কি। কিন্তু কথাটা বলার মধ্যে কত বিনয়, নম্রতা। এ তো আর মহিম হালদার নয় যে গলা উঁচু করে দশজনকে শুনিয়ে এসব বলবে।

ভাল, খুব ভাল। ওয়াং-এর কথা শুনে খুশি হই। মনে মনে বলি, তোমার মতন সৎ বিনয়ী বন্ধু-বৎসল মানুষের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে। চলি সাহেব। বিছানা ছেড়ে আমি উঠতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ওয়াং তা হতে দেবে কেন। খপ্ করে আমার হাত চেপে ধরল।

উঁহু, বসো বাবু, এখন উঠছ কেন। ছিট্ ডাউন। অর্থাৎ আমাদের গল্প ফুরোয় নি। আরও অনেক কথা আছে। আমাকে বসিয়ে দিয়ে ওয়াং পিটপিট করে আমার মুখ দেখতে লাগল।

অ্যাণ্ড হোয়াট অ্যাবাউট ইয়োর ব্লাড? স্যাং? তোমার রক্ত যোগাড় হয়েছে? ওয়াং প্রশ্ন করেন।

হুঁ, আমার রক্ত আসবে। আমার স্যাং শিগগির যোগাড় হয়ে যাবে। এতকাল সাহেবকে শুনিয়েছি। কিন্তু সেদিন আর মিছে কথা মুখ দিয়ে বেরোয় না। একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললাম।

না, সাহেব। আমার রক্ত দেবার কেউ নেই। বললাম, আমি যে একলা মানুষ। কলকাতায় রক্ত নেই—দূর দেশ থেকে রক্ত আনা সেই ক্ষমতাই বা কোথায়। পয়সা-কড়ি নেই।

তার প্রতিক্রিয়া কী হল? দেখলাম ওয়াং একভাবে আমার হাতটা ধরে রেখেছে। দেখলাম চীনা মাটির পুতুলের মতন তার নীলাভ ফ্যাকাসে দু-চোখে জল এসে গেছে। চট করে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। আমি জানি, আমি জানতাম এভাবে আস্তে আস্তে বিকেল হত। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামত, তারপর রাত। তারপরও ওয়াং একভাবে আমার হাত ধরে চুপ করে বসে থাকত। বোধ করি এভাবে আমাকে সান্ত্বনা দিত। সমবেদনা জানত। না কি হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ত—ঠিক আছে বাবু, তোমার রক্ত যোগাড় হয়ে যাবে। আমার ছেলেরা আছে, মেয়েরা আছে। একজন তোমাকে রক্ত দেবে। বলত কি? আমার যেন মনে হয় ঠিক এমন কিছু বলার জন্য তার পাতলা ঠোঁট দুটো নড়ে উঠেছিল। যেন ততটা সরলতা ও মমত্ব মেশান একটা মহাপ্রবণতার ছবি আমি চীনা সাহেবের চোখের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম।

কিন্তু কথাটা বলার সময় পায়নি ওয়াং। তার হাতঘড়িতে তখন কাঁটায়

কাটায় চারটে। চোখ ফেরাতে দেখি ওয়াং-এর স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরা জামাইরা কেবিনে ঢুকবে বলে সার বেঁধে দরজায় দাঁড়িয়ে। চলি সাহেব। তাদের ভিতরে ঢুকতে পথ করে দিয়ে আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসি।

ভিজিটিং আওয়ারের সময়টা আমার কাছে দুঃসহ। যেন কয়েক হাজার মানুষ ভিতরে গিজগিজ করে। প্রত্যেকটা বিছানার কাছে রোগীদের আত্মীয় কুটুম বন্ধুরা ভিড় করে থাকে। কত কথা কত রকম গল্প শোনা যায়। হা হুতাশ কান্নাকাটিও কানে আসে। আমার কাছে কেউ আসবার নেই। কাজেই একলা বিছানায় ভূত সেজে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। হাঁপিয়ে উঠি। তাই বিকেলের এই দু'ঘণ্টা বারান্দায় একটা বেঞ্চে বসে কাটাই। জমাদার ওয়ার্ডবয়দের গাল-গল্প শুনি। অথবা রেলিং-এর বাইরে উঁচু উঁচু গাছগুলি দেখি।

সেদিন ওয়াং-এর কেবিন থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসতে দেখি মহিম হালদারের বাড়ির লোকেরা দল বেঁধে ভিতরে ঢুকছে। হাতে হাতে ফলের ঠোঙা কেক্ সন্দেশের বাক্স বিস্কুটের টিন স্নো-পাউডারের ডিবি, আরও কত কি। হুঁ, জামাকাপড়ের বাক্সও কারো হাতে দেখলাম। এমনি অবশ্য রোজই দেখি। যেন নিত্য হালদার মশাইয়ের জন্মদিন লেগে আছে। আর নিত্য তাঁর শতায়ু কামনা করতে করতে আত্মীয়-স্বজন অনুচররা হাসপাতালে ছুটে আসে। আর সবাই খুব সেজেগুজে আসে। গাঁয়ের মানুষ হলে হবে কি। গাঁয়ের পুরুষরাও এখন স্যুটবুট পরতে শিখেছে। হাতে ঘড়ি গলায় পাউডারের ছোপ। তবে হালদার বাড়ির মেয়েদের সাজসজ্জার বহরটা বেশি। দামী দামী শাড়ি জুতো। কত সোনাদানা এক একজনের গায়ে। যদি কেউ আপনারা এই দৃশ্য দেখতেন চোখ কপালে উঠত। আপনাদের মনে হত কি হালদার বাড়ির মেয়েরা অসুস্থ হালদারকে দেখতে আসে না, আসে বাইরের মানুষকে শাড়ি গয়না দেখাতে। মনে মনে আপনারা হাসতেন। আমিও হাসি। সেই তুলনায়, এই মাত্র দেখে এসেছি, ওয়াং-এর বাড়ির মেয়েদের পুরুষদের। কত সাদাসিধে পোশাক। ওয়াং-এর বন্ধুদের গায়েও অতি সাধারণ জামাকাপড়। অথচ ভীষণ বড়লোক এরা সবাই। ওয়াং-এর বাড়ির বউ-ঝিদের গায়ে গয়নার ছিটেফোঁটাও নেই। হাতে একটা করে শুধু ঘড়ি। চুলে চিরুনি গোঁজা। পাজামা বা ম্যাকসি পরা নিতান্ত আটপৌরে সাজ। তা বলে ওদের দেখতে কি খারাপ লাগে। আমার তো ভালই লাগে। আর কী আশ্চর্য রকম চুপচাপ সব। পুতুলের

মতন আসে। তারপর তাদের রোগীকে দেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। আর তার ঠিক উল্টো মহিম হালদারের বাড়ির মানুষগুলি। সমানে কথা বলছে, অনর্গল হাসছে, কাশছে এবং আরও নানা রকম শব্দ করছে। হাসুক। ক্ষতি নেই, আমাদের মতন বিছানায় শুয়ে জোতদার কিছু মৃত্যুর প্রহর শুনছে না। প্রচুর রক্ত পাচ্ছে। শরীর চাঙ্গা করে নিয়ে ঘরে ফিরে যাবে। তা বলে ওয়াং সাহেব কি মরে যাচ্ছে? তাকেও তার বাড়ির লোকেরা বন্ধুরা যতটা দরকার রক্ত দেবে। রক্ত পেয়ে ওয়াং-এর গায়ের সাদা শুকনো চামড়া আবার সবরী কলার রং ধরবে। তারপর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঘরে ফিরে যাবে। কিন্তু তা বলে কি আর বাড়ির মানুষগুলি হইচই হট্টগোল করছে—হাসাহাসি করছে। মোটেই না। এবং যেহেতু তারা চুপটি করে আসে এবং ওয়াংকে দেখে আবার চুপি চুপি বেরিয়ে যায়—তা বলে কি ভাবতে হবে যে, ওয়াংকে তারা ভালবাসে না! নিশ্চয় বাসে। মহিম হালদারের জন্য প্রচুর ফল মিষ্টি, এটা ওটা উপহার আসছে! ওয়াং-এর জন্যও আসে। কিন্তু যতটা রোগী খেতে পারবে, ব্যবহার করতে পারবে ঠিক ততটাই তারা ওয়াং-এর জন্য নিয়ে আসে। বেশী নয়। আর ওদিকে রোজ দেখি হালদার মশায়ের জন্য আনা কত জিনিস ফেলা যাচ্ছে। ফেলা ঠিক নয়। জমাদার ওয়ার্ডবয়দের বিলিয়ে দেওয়া হয়। একটা মানুষ কত আর আপেল আঙুর কেক সন্দেশ খেতে পারে। তার মানে কি! সব কিছুই যেন লোকদেখানো বড়মানুষী চাল। মহিম হালদারের কত টাকা আছে তোমরা দেখ।

আর একটা জিনিস দেখে আমাদের হাসি পায়। মহিম হালদারের বাড়ির লোকেরা খুব গন্ধটন্ধ ছড়াতে ছড়াতে হাসপাতালে ঢোকে। যেন শিশি কৌটা উপুড় করে তারা আতর এসেন্স পাউডার হেয়ার ওয়েল গায়ে মাথায় ঢেলে আসে। তাদের গালগল্পে কলরব ও উঁচু গলার হাসির মতন ঐ সব এসেন্স পাউডার হেয়ার অয়েলের গন্ধও যেন জোরে চেঁচাতে থাকে। ওয়াংকে যারা দেখতে আসে তাদের গায়ের গন্ধ টের পাওয়া যায় না। পুরুষদের তো নয়ই, মেয়েদের বেলাও তাই। যদিও বা এক আধটু গন্ধ টের পাওয়া গেছে, খুবই অস্পষ্ট, খুবই চাপা। ঝোপের আড়ালে ঢেকে থাকা কোনো বুনো ফুলের হালকা সুবাসের মতন।

এভাবে সারাটা বিকেল চুপচাপ বারান্দায় বসে দুটো পরিবারের কথা চিন্তা করি। আকাশ পাতাল তফাত। মুড়াগাছার জোতদার মহিম হালদার ও

বেন্টিং স্ট্রীটের জাঁদরেল সু-মার্চেন্ট চিং ওয়াং হো। দুজনেই বড়লোক। টাকার কুমীর। তবু যেন দুই মেরুর দুটি মানুষ।

—কোথায় ছিলেন মশাই, সারাটা বিকেল?

—ওয়াংকে দেখতে গিয়েছিলাম।

—ধুত্তুরি মশাই ওয়াং। ভুতু কবিরাজের মতন বগলা মাস্টারও আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসল। কেবিনের মানুষ কেবিনে থাকুক। এখানে কি দেখার কিছু কম জিনিস আছে!

—কি হয়েছে নগেনবাবু? আমি নগেনের দিকে তাকাই। নগেন গুজগুজ হাসে। ঐ দেখুন, ওদিকে তাকান। ষোল নম্বর বেড্-এর দিকে নগেন পোদ্দার আঙুল দেখায়।

দেখলাম মুখ অন্ধকার করে মহিম হালদার বসে আছে। আজ যেন আর আলোকস্তম্ভ হয়ে জ্বলজ্বল করছে না এত বড় মানুষটা। একটা উই ঢিপি হয়ে চুপ করে বসে আছে। কি ব্যাপার! অন্য দিন এ সময় গলার পর্দা উঁচু করে অ্যাটেণ্ডেণ্ট দুটিকে নানা রকম নির্দেশ দেন হালদার। অর্থাৎ বাড়ি থেকে এত সব খাবারদাবার ও পাঁচ রকম জিনিসপত্র এসে গেছে। সব গুছিয়েটুছিয়ে তুলে রাখুক। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাটেণ্ডেণ্টরা হাত চালিয়ে কর্তার হুকুম তামিল করে। আজ দেখা গেল আপেল আঙুরের ঠোঙা সন্দেশের বাক্স বিস্কুটের টিন পাউডারের ডিবি আরশি চিরুনি জামাকাপড় বিছানায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। দুই অ্যাটেণ্ডাণ্ট খাটের দু' পাশে দুটো টুলের ওপর বসে ঝিমোচ্ছে।

—বুঝেছেন, বগলা মাস্টার তখনও আমার দিকে তাকিয়ে। বলল, এর নাম হল বিষয়-আশয়। জোতদারের মনের অবস্থাটা হয়েছে এখন কি রকম জানেন? বিষ খেয়ে মরতে পারলে বাঁচি।

হেঁয়ালির মতন ঠেকছিল কথাগুলি। আমি নগেনের দিকে চোখ ফেরাই। নগেন বলল, সারাটা বিকেল তুমুল যুদ্ধ হয়ে গেছে মশাই, ঐ ষোল নম্বর বিছানা ঘিরে। যেমন হালদার মশায়ের ছেলেদের গলা শোনা গেছে তেমনি মেয়েগুলোর গলা। যেন রণচণ্ডী মূর্তি এক একটি। আর তাদের পেছনে খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল দুই জামাই।

ভুতু কবিরাজ বলল, বসুন, বসে কথাগুলো শুনুন। কবিরাজের কথা মতন আমি আমার বেড্-এ উঠে বসি। তখন কবিরাজ আরম্ভ করল, হালদারের বড় ছেলে বলছিল, আমি তোমাকে রক্ত দেব বাবা, তবে শর্ত—তোমার নাতির নামে

আলাদা করে এখনি বিশ বিঘা জমি লিখে দিতে হবে। বড় হয়ে তোমার নাতি বিলেত যাবে। তার খরচ। মেজো ছেলে বলছিল, আমি রক্ত দেব বাবা, আর তার পুরস্কার হিসেবে তোমার নাতনীর নামে পঁচিশ বিঘা জমি লিখে দাও—ওর বিয়ের খরচ আছে। দাদার ছেলেকে বিলেত পাঠাবার চেয়ে আমার মেয়ের বিয়েটা জরুরী বেশি—কথাটা ভুলে যেও না। ছোট ছেলে তক্ষুনি বলে, আমি তোমাকে রক্ত দিচ্ছি বাবা—তার জন্য বাগান পুকুর সমেত আমাদের গোটা বসতবাটীখানা আমার নামে লিখে দিতে হবে তোমাকে। আমি সকলের ছোট। তোমার ওপর আমার রাইট বেশি। ছেলেদের হয়ে ছেলেদের বউয়েরা গলাবাজি করছিল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

—তারপর? আমি পর পর দুটো ঢোক গিললাম। হেসে নগেন বলল, তারপর গাছ-কোমর বেঁধে এগিয়ে এল মেয়েরা। বিয়ে হয়ে গেছে বলে কি তারা পর হয়ে গেছে। সন্তান কোনদিন পর হয় না। দূরে চলে গেছে, কাজেই বাবার ওপর তাদের আবদার বেশি খাটে। তারা বাবাকে রক্ত দেবে। বিনিময়ে বাবা তাদের বিষয়ের ভাগ দিক। দু মেয়ের পেছনে দাঁড়িয়ে দুই জামাই দোঁহার গাইল। সব শুনে হালদার মশায়ের আক্কেলগুড়ুম।

—তারপর?

—তক্ষনি রেগে গিয়ে জোতদার বলল, দরকার নেই কারো রক্ত দিয়ে। কলকাতায় রক্ত পাওয়া যায় না, বাইরে থেকে—বোম্বে মাদ্রাজ দিল্লি থেকে প্লেনে করে আমি রক্ত আনাব। শুনে সঙ্গে সঙ্গে হালদার গিন্নী ফুঁসে উঠলেন। এত দূর থেকে এককাঁড়ি টাকা খরচ করে রক্ত আনাবে। কোথায় পাবে তুমি এত টাকা! এ তো আর দু' পাঁচ টাকার ব্যাপার নয়—অনেক টাকা লাগবে।

—বেশ? নগেনের চোখে চোখ রেখে আমি প্রশ্ন করলাম, জোতদার মশায় কি ব্যাঙ্কে কিছুই রাখেন নি?

—রাখবে না কেন। কথাবার্তায় বুঝলাম সবই গিন্নীর নামে। টাকা তুলতে গেলে মহিলার সই চাই। তাই চোখ পাকিয়ে গিন্নী বললেন, খবরদার, ব্যাঙ্ক থেকে একটি পয়সাও তোলা হবে না। এ টাকা আমার। রক্ত দিতে হয় তোমার ছেলেরা দিক মেয়েরা দিক। আমার টাকা নষ্ট করে তুমি বাইরে থেকে রক্ত আনবে, তা আমি হতে দেব না। ঐ তো দেড় দু লাখ মাত্র সম্বল। তুমি চোখ বুজলে আমায় দেখবে কে! আলো চাল আলু ভাতে খেয়ে বাঁচতে হলেও আমার টাকার দরকার হবে মনে রেখো।

—ভারি মুশকিলের কথা তো! বললাম, মহিম হালদারের অবস্থা দেখছি এখন প্রায় আমাদের মতন দাঁড়াল। রক্তের জন্য জোতদার তবে কোথায় যাবেন!

বগলা মাস্টার বলল, তারপর শুমুন, আরো মজার ঘটনা ঘটেছে। বাড়ির লোকদের এই ঝগড়াঝাটি দেখে হালদার মশায়ের বাধ্যের লোকেরা—লক্ষ করেছেন দল বেঁধে রোজ তারা জোতদারকে দেখতে আসে—হুঁ, তাদের একজন এগিয়ে এসে বলল, আমি রক্ত দেব। টাকা খরচ করে কর্তাবাবুর জন্য বাইরে থেকে রক্ত আনতে হবে না। কথাটা শুনে হালদারের ছেলেরা চোখ পাকিয়ে লোকটাকে এমন ধমক লাগাল। বলছেন কি এ সব আপনি! আমরা বেঁচে থাকতে বাবার গায়ে আপনার রক্ত ঢোকাব। কোন সাহসে বলছেন? মানমর্যাদার কথা ছেড়েই দিলাম। রক্ত বড় সাংঘাতিক জিনিস। কেবল গ্রুপ মিললেই হয় না। এর শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার অন্যভাবে হয়। আমরা বেঁচে থাকতে রামা শ্যামা যেদো মেধোর ব্লাড বাবাকে দেওয়া হবে—তা হয় না, এ জিনিস আমরা এলাউ করব না।

কথা শেষ করে বগলা মাস্টার টেনে টেনে হাসতে লাগল। ভুতু কবিরাজ হাসছিল। নগেন পোদ্দার হাসছিল। ঘাটশিলার কেদার পাণ্ডে হাসছিল। হাসি জিনিসটা সংক্রামক। শেষটায় আমিও হাসতে আরম্ভ করি। বলেছি, হাসি মস্করার সুযোগ পেলে আমরা সহজে তা নষ্ট হতে দিই না। মুড়াগাছার জোতদারকে রক্ত দেওয়া নিয়ে ভিজিটিং আওয়ারের সময় যে তাণ্ডব হয়ে গেল—হাসির ব্যাপার বইকি। যদিও মানুষটার জন্য আমাদের কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু করা কি।

ইতিমধ্যে রাতের খাবার এসে গেল। দিনের ডিউটি শেষ করে এক ঝাঁক দিদিমণি বেরিয়ে যেতে জুঁই ফুলের মতন ফুটফুটে নতুন এক ঝাঁক দিদি ভিতরে ঢুকল। এসেই আমাদের তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে সকাল সকাল শুয়ে পড়ার জন্য হাঁকডাক শুরু করল এবং যার যেমন দরকার রোগীদের ক্যাপসুল ট্যাবলেট ঘুমের ওষুধ বিলোতে লাগল। না হলে আমরা বুঝি সারা রাত হাসতাম। কারণ, আমরা বুঝে গিয়েছিলাম টাকা থাকার দুঃখ টাকা না থাকার দুঃখের চেয়েও ভয়াবহ। ছেলেমেয়ে থাকার দুঃখ ছেলেমেয়ে না-থাকার দুঃখের চেয়েও মারাত্মক।

এবং আমরা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না—রক্তের অভাবে হাসপাতালের

বিছানায় শুয়ে পচে গলে মরার চেয়ে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে মরে যাওয়া ঢের বেশী গৌরবের। দুঃখের বিষয়, হেসে কেউ মরে না। পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজির নেই।

পরদিন। অন্য একটা দিন। আকাশের একেবারে উল্টো চেহারা। থমথমে ঘোলাটে ভাব কেটে গেছে। সোনালী ফুরফুরে রোদ নিয়ে নিষ্পাপ শিশুর মতন আকাশটা হাসছে।

তাই বলছিলাম, ঈশ্বর কত রকম রসিকতা করতে জানে আমাদের এই মরণাপন্ন রোগীদের সঙ্গে। তুলনাটা এভাবে দেওয়া যায়। কাল সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে যদি দেখছিলাম সর্বশক্তিমান সুতোয় বেঁধে একটা মরা ঢোসকা ইঁদুর আমাদের নাকের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছে—মেঘলা বদখত চেহারার দিনের সঙ্গে এমন উপমা ছাড়া আর কিছু মনে আসছিল না—আজ তবে বলতে হয়, সকালে জেগে উঠে চোখ মেলে দেখি, সুতোয় বাঁধা মরা ইঁদুরের বদলে রঙিন ফুরফুরে একটা প্রজাপতি। সুতোটাকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে প্রজাপতিটা। এমন চমৎকার দিনে শ্মশানের মড়াও প্রাণ পেয়ে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে। আমরা তো এখনও তদ্দূর পৌঁছাইনি। কাজেই ভয়ানক চাঙ্গা বোধ করছিলাম সকাল থেকে সবাই। আঃ উঃ শব্দ নেই, গোঙানি নেই কোনো বেড্-এ। কারো ঝিমোনি নেই। বেলায় ডাক্তাররা রাউণ্ড দিয়ে চলে যাবার পর স্নান-খাওয়া সেরে নিয়ে বেশ জমিয়ে গল্পগুজব করছিলাম সব। দুপুর থেকে কেমন একটা বসন্ত বসন্ত ভাব মনে হচ্ছিল। কোকিলের ডাক শোনা গেল না যদিও। একটা পাপিয়া ডাকছিল দূরে। যে জন্য কাকের কা-কা ও অলুক্ষুণে বেড়ালটার আনাগোনা খুব একটা খারাপ লাগছিল না। গল্প নিয়ে সবাই মেতে গেলাম। কি নিয়ে গল্প? বুঝতেই পারেন। যার কপালে ভাত জোটে না—ভাতের চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা তার মাথায় ঢোকে না। ভাতের কথা ছাড়া অন্য কথা মুখে আসে না। আমাদেরও তাই। রক্ত। রক্ত নিয়ে গল্প যত জমে তেমন আর কিছুতে না। আরম্ভ করেছিল ডোমজুড়ের পরেশ বাকুলী। বলছিল, আমরা রক্ত রক্ত করছি। হাসপাতালে রক্ত নেই, কলকাতা শহরে রক্ত নেই—এখন মনে করে দেখুন, রাম রাবণের যুদ্ধে কত রক্তপাত হয়েছিল। ও পক্ষে হাজার হাজার রাক্ষস মরল, এ পক্ষে হাজার হাজার বানর। যদি সে যুগের মানুষ হতাম পিপে ভরতি করে রক্ত যোগাড় করে রাখা যেত। রক্তের জন্য ভাবতে হত না। শুনে কেদার পাণ্ডে ফ্যা ফ্যা

করে হাসল। বলল, আরে মশাই, রাক্ষসের রক্ত দিয়ে আমরা করতাম কি। গ্রুপে মিলত না। আর বানরের রক্তই বা আমাদের কোন্ কাজে লাগত।

না, ও কথাটি বলবেন নি, দাদা। বগলা মাস্টার বলল, কাগজ পড়েন নি? বাঁদরের ফুসফুস, বাঁদরের কিডনি এখন হামেশা মনুষ্য শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া, বাঁদর তো আমাদের খুব কাছাকাছি জীব। ডারুইন সাহেবের মতে, আমরা সরাসরি বানর থেকে এসেছি।

খগেন পোদ্দার বলল, রাম-রাবণের যুদ্ধের চেয়ে অনেক বড় মাপের যুদ্ধ হয় কুরুক্ষেত্রে। তেরো দিনের যুদ্ধে আঠারো অক্ষৌহিণী সৈন্য মারা গেল। এখন ভাবুন ক' লাখ লিটার রক্ত ঝরেছিল।

তা আর বলতে! ভুতু কবিরাজ পরেশ বাকুলীর দিকে চোখ ঘুরিয়ে বলল, আঠারো অক্ষৌহিণী—এ কি চাট্টিখানি কথা। এক অক্ষৌহিণী বলতে কি পরিমাণ সৈন্যসামন্ত বোঝায় বলতে পারেন বাকুলী মশাই? না দাদা, অক্ষৌহিণীর হিসেব আমার জানা নেই। বাকুলী সলজ্জ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

তা কি করে আর জানবেন। ভুতু কবিরাজ মিহি গলায় হাসল। এ যুগে কি আমরা রামায়ণ-মহাভারত পড়ার সময় পাই। নাটক নভেল নিয়ে মত্ত।

তা-ও পড়া হয় কোথায়, দাদা। বাকুলী সখেদে বলল, খবরের কাগজখানার ওপর সকালে একবার চোখ বুলাই। পড়াশুনো বলতে ঐ। সারাদিন কাটে রুজিরোজগারের ধান্দায়।

যদি রামায়ণ-মহাভারতের কথাই তুললেন, কাশী মিত্তির বলল, একা পরশুরাম কি কম রক্ত ঝরিয়েছিল! পিতৃবধের শোধ তুলতে গিয়ে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করল। কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করল মানুষগুলোকে। আর সেই রক্তে কিনা বিশাল এক হ্রদ তৈরী হয়ে গেল। নাম হল পঞ্চ হ্রদ। এখন চিন্তা করুন, কত রক্ত জমা হয়েছিল একটা জায়গায়।

তাই তো! খগেন বলল, সেই আমলের মানুষ হলে বালতি ডুবিয়ে ডুবিয়ে রক্ত আনতে পারতাম। রক্তের জন্য এভাবে আমাদের কান্নাকাটি করতে হত না।

হুঁ, তাই যদি বলেন, এবার প্রফেসার মুখ খুলল, এ-যুগে আমাদের হিটলার সাহেব কী করেছিল একবার চিন্তা করুন। গ্যাস-চেম্বারে ঢুকিয়ে কী পরিমাণে ইহুদী খুন করল!

হুঁ, তা করল। ভুতু কবিরাজ বলল, কিন্তু গ্যাস-চেম্বারে খুন হওয়া রক্ত আমাদের কাজে লাগত না। গ্যাসের বিষে সব রক্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল যে।

কথাটা শুনে, প্রফেসার কতকটা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কেদার পাণ্ডে বলল, মুশকিল হচ্ছে কি, মানুষের তাজা রক্ত না হলে আমাদের মতন অ্যানিমিক রোগীদের বাঁচান যায় না। তা না হলে ভেবে দেখুন, এই কলকাতা শহরে রোজ কত পাঁঠা-খাসী-গরু ভেড়া জবাই হচ্ছে। আমরা কেবল মাংস কিনে খাই। রক্ত কেউ খাই না। সব রক্ত নর্দমায় চলে যায়। তার মানে হাজার হাজার লিটার রক্তের অপচয়।

কাশী মিত্তির বলল, হবে হবে—আপনারা ভাবছেন কি। মেডিকেল সায়ান্স অনেক দূর এগিয়ে গেছে। শুনছি জীবজন্তুর রক্ত থেকে সিন্‌থেটিক ব্লাড তৈরি করার জোর চেষ্টা চলছে। ঐ রক্ত আমাদের মতন রোগীদের শরীরে ঢোকান হবে। রক্তের প্রব্‌লেম থাকবে না।

তা, থাকবে না। কেদার পাণ্ডে আফসোসের গলায় বলল, তবে আমরা এ জিনিস দেখে যেতে পারলাম না। আমাদের ফিউচার জেনারেশন যদি এর ফল ভোগ করে। আমরা মরব।

গল্পে গল্পে দুপুর গড়ায়। বেলা প্রায় শেষ। এমন সময় একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সকলের মুখ থেমে গেল। ওয়াং সাহেব নেই।

সে কি! নেই মানে কি। ভয়ানক চমকে উঠলাম।

মর গিয়া মর গিয়া। জমাদার পিয়ারী দু হাতের তেলো শূন্যে ঘুরিয়ে, যেন খাড়া বোতল উল্টে গেছে, এমন একটা ভঙ্গি করল। আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। পিয়ারীর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। পিয়ারী তখন দার্শনিকের মতন চোখ করে আমাকে বোঝাল, বাবু—ওপরওয়ালার মর্জি, হামি তুমি কিছু করতে পারি না। ওখান থেকে তলব এল—ব্যস্ চীনা সাহেব চলে গেল। আঙুল দিয়ে আকাশ দেখিয়ে পিয়ারী একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়ল।

একটা অস্ফুট গুঞ্জন উঠল। বড় ভাল লোক ছিল ওয়াং। সোনার মানুষ। এত পয়সার মালিক! এক ফোঁটা অহংকার ছিল না। ওয়ার্ডবয় নবীনকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে নবীন বলল, আজ দুপুরে রক্ত দেবার কথা ছিল সাহেবকে।

তারপর? আমরা একসঙ্গে প্রশ্ন করলাম, বাড়ি থেকে কি রক্ত এসেছিল?

তা বলতে পারব না। নবীন মাথা নাড়ল। বলল, বেলা এগারোটায় সরকার কেবিনে ঢুকে সাহেবকে খাবার দিতে গিয়ে দেখে সাহেব চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে সরকার বড় সিস্টারকে খবর দেয়। সিস্টার তক্ষুনি কেবিনে ঢুকে সাহেবের বিছানার কাছে গিয়ে চাদর সরিয়ে দেখে সাহেব মরে কাঠ হয়ে আছে। সকালের দেওয়া দুধ পাউরুটি যেমন টেবিলে ঢাকা ছিল সেভাবে পড়ে আছে।

খবর শুনিয়ে নবীন চলে গেল। পিলপিল করে ভিজিটারের দল ভিতরে ঢুকছিল। বোঝা গেল, চারটে বেজে গেছে। ইতিমধ্যে দুবার ঘাড় ঘুরিয়ে আর একটা মানুষকে দেখলাম। ষোল নম্বর বেড্-এর মহিম হালদার। বলেছি, রক্তহীনতায় ভুগলেও মুড়াগাছার জোতদার যে খুব একটা শুকিয়ে গিয়ে আমাদের আর দশটা রোগীর মতন কঙ্কালের মূর্তি ধরেছিল তা মোটেই নয়। গায়ের রংটা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল—তা না হলে এখনও নাদুসনুদুস চেহারা। কিন্তু আজ যতবার ওদিকে চোখ গেছে, মনে হচ্ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মানুষটা আধখানা হয়ে গেছে। যেন ঝড়ে বাড়ি খাওয়া একটা জাহাজ ভেঙে দুমড়ে একাকার হয়ে গেছে। চুপ করে একভাবে বসে আছে। শব্দ নেই মুখে। তখনও তার পরিবারের লোকেরা বা শুভানুধ্যায়ীর দল এসে পৌঁছোয়নি। বিছানার চারপাশটা মরুভূমির মতন খাঁ খাঁ করছে।

সারাটা বিকেল নিজের বেড্ ছেড়ে নড়লাম না। ভিজিটিং আওয়ারের ভিড় ও গোলমালের মধ্যে একা একা বসে থাকতে খুব খারাপ লাগছিল যদিও। কিন্তু বেরিয়ে যেতাম কোথায়। বারান্দায় যাওয়া মানে ওয়াংকে দেখতে এক নম্বর কেবিনে ঢোকা। রোজ যা করছিলাম। আজ কেবিনে ঢুকে কাকে দেখব, কার সঙ্গে গল্প করব? বিছানায় বসে খবর পেলাম বেলা দুটো নাগাদ ওয়াং-এর আত্মীয়রা এসে ডেড বডি বার করে নিয়ে গেছে।

আপনারা ভূত বিশ্বাস করেন? করেন না। আমি করি। সেদিন থেকে করি। ওয়াংসাহেব মারা গেল, আর ঠিক সেই সন্ধ্যায় আমি নিজের চোখে ভূত দেখলাম।

বলেছি, সারা বিকেল নিজের বেড্ ছেড়ে নড়িনি। বাইরের সোনালী রোদ এক সময় প্লাটিনামের রং ধরল। তারপর আস্তে আস্তে ধূসর হয়ে গেল। ভিজিটাররা একে একে বেরিয়ে যেতে হলঘরটা ফাঁকা হয়ে গেল।

অন্য দিন লোকের ভিড় ও চেঁচামেচির দরুন আমার মাথা ধরে। আজ সে রকম কিছু টের পেলাম না। অথবা যেন সে সব বোধটোধ একেবারে লোপ পেয়ে গেল। কারণ কি? ওয়াং-এর কথা ভেবে? আমাদের খুব কাছাকাছি এসেছিল চীনা সাহেব। আমার সঙ্গে বন্ধুত্বটা এদিকে বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছিল এটা ঠিক। সবাই একদিন যাবে। ঐ যে পিয়ারী জমাদার বলে গেল, ওপরওয়ালার ডাক এলে কেউ থাকতে পারবে না। আমি যাব, এখানকার অনেকেই চলে যাবে। ওয়াং চলে গেল। কিন্তু ওয়াং-এর যে রক্তের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। আমার যা কোনদিনই হবে না। আমার মতন অনেকেরই হয়তো রক্ত যোগাড় করা হবে না। সুতরাং, আমরাই আগে মরতাম। হয়ে গেল উল্টো।

এই একটা চিন্তা মাথায় নিয়ে বিকেলের দু-তিন ঘণ্টা যে কী করে কাটল! কেমন জবুথবু হয়ে গিয়েছিলাম। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নামল। মাথার ওপর সব কটা বাল্‌ব জ্বলে উঠল। বিকেলের দিদিমণিরা চলে গেল। রাতের দিদিরা এসে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে খাবারও এসে গেল। খেতে ইচ্ছা করল না। খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে ধুঁকতে ধুঁকতে বারান্দায় চলে এলাম। জুঁইফুলের মতন ফটফটে জ্যোৎস্না বাইরে।

এতক্ষণ পর মনে হল, রোজকার অভ্যাসমতন বাইরে না এসে এতটা সময় ভিতরে বসে থাকার দরুন কান মাথা গরম হয়ে গেছে। ফাঁপ ফাঁপ ঠেকছিল। ডাক্তারবাবুরা বলেন, দুর্বল শরীরে ভিটামিন বড়িটড়ি খাওয়া হয় তাই কান মাথা সময় সময় গরম ঠেকে। হতে পারে। ডাক্তারদের কথার প্রতিবাদ করি না। তবে আমার মনে হয়, সারাদিন চার দেওয়ালের মধ্যে আটকা থাকার জন্য এটা হচ্ছিল। এবার ভাল লাগছিল। ভাল করে শ্বাস ফেলতে পারলাম। তবু কষ্ট করে হেঁটে আমি এখনও বাইরে আসতে পারি। বেশির ভাগ রোগী এত দুর্বল যে, বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারে না। সারাদিন শুয়ে বসে কাটায়। কী দুর্ভোগ!

বারান্দাটা একেবারে ফাঁকা। এ সময় তাই হয়। রোগীরা খাওয়াদাওয়া করে। ওয়ার্ডবয়রা জমাদাররা এই ফাঁকে চা-জলখাবার খেতে এদিক ওদিক বেরিয়ে যায়। দুধের সরের মতন পাতলা জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে আমি দেবদারু ও ঝাউয়ের সরসর শব্দ শুনছিলাম। বাইরের সবটা দৃশ্য, কেন বলতে পারব না, আমার কাছে কেমন অদ্ভুত অপ্রাকৃত ঠেকতে লাগল। অন্যদিনের মতন যদি

ওয়াং-এর কেবিনের দরজা খোলা আছে দেখতাম, তবে বোধ করি চারদিকের চেহারাটা এত অস্বাভাবিক ঠেকত না। কিন্তু অন্য সব কেবিনের মতন এক নম্বর কেবিনের দরজা বন্ধ ছিল। বন্ধ দরজার মুখে সবুজ পর্দাটা বাতাসে অল্প অল্প কাঁপছিল।

প্রায় দু মিনিট একভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। এই অবস্থায় লনের ঝাউ ও দেবদারু গাছের দিক থেকে পুব-দক্ষিণ কোণার গেট দিয়ে একটা মানুষ যদি আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠে আসে অবিশ্বাস করার কিছু থাকে কি! কিন্তু যদি বলি মানুষটা ওয়াং? রোগা শরীর নিয়ে এক পা দু পা করে আমার সামনে এসে দাঁড়াল—শুনে আপনারা প্রথম চমকে উঠবেন, তারপর হাসবেন। বলবেন, গাঁজা। বলবেন, আমার চোখের ভুল। আমি যদি প্রতিবাদ করি এবং গলায় জোর দিয়ে বলি যে না, মানুষটা সেই চীনা সাহেবই, নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি কেমন করে—আপনারা গম্ভীর হয়ে যাবেন। এবং একটু ভেবেটেবে বলবেন, হতে পারে। দুর্বল শরীর, দুর্বল মাথা, এই অবস্থায় দুপুর থেকে ওয়াং-এর চিন্তা আপনার মগজে ঘুরছিল। এই অবস্থায় নবমীর জ্যোৎস্না ও বারান্দার রেলিং-এর সরু লম্বা ছায়া-গুলো মিশে একটা ফ্যান্টম-এর মতন কিছু যদি আপনার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আপনাকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না।

এর পর আমি আর কোনো কথা বলব না। কারণ, আপনাদের অবিশ্বাস আপনাদের কাছে, আমার বিশ্বাস আমার কাছে। আপনাদের অবিশ্বাসকে শক্ত খুঁটির ওপর দাঁড় করাতে নানারকম যুক্তি আমাকে দেখাবেন। এক্ষেত্রে আমার চুপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে প্রসঙ্গটা যখন আরম্ভ করেছি শেষ করতে দিন।

দেখলাম, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধান, আমাদের দুজনের দেখা নেই। এর মধ্যেই ওয়াং কত বেশি নিস্তেজ ও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তবে শিশুর মতন সুন্দর হাসিটা মুখে লেগেছিল। দেখে তবু খানিকটা আশ্বস্ত হই।

আমি আগে কথা বলি। হাউ আর ইউ মিঃ ওয়াং, তুমি কেমন আছ?

এবার সাহেবের হাসি নিবে গেল। গম্ভীর হয়ে গেল। তবে অন্যদিন যেমন দেখা হলে তার মাতৃভাষায় কথা বলে প্রথমটা আমার সঙ্গে একটু রগড় করে, আজ আর তা করল না ওয়াং। সোজাসুজি বলল, আমি ভাল আছি।

শুনে চুপ থাকি। কিন্তু পরক্ষণে মাথা নাড়ি। বলি, না সাহেব, তুমি ভাল নেই। তোমার শরীরটা বেশি খারাপ দেখাচ্ছে।

ওয়াং শব্দ করল না। বলেছি, চারদিকের জ্যোৎস্না হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম স্বচ্ছ লাগছিল। যেন কাঁচের বোয়ামের মধ্যে জল টলটল করছে। সামান্য কেশে গলাটা পরিষ্কার করলাম।

ইতিমধ্যে ওয়াং পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট ও তার সুদৃশ্য লাইটার বের করল। আমাকে সিগারেট অফার করছিল, আমি কিন্তু হাত বাড়িয়ে ধরলাম না। তার চোখে চোখ রেখে বললাম, ব্লাড ? হোয়াট অ্যাবাউট ইউর ব্লাড, মিঃ ওয়াং। আজ তোমাকে রক্ত দেবার কথা ছিল যে ?

সাহেব একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে কিছু ভাবল।

কি হল সাহেব! আমি আবার বললাম, তোমার বাড়ি থেকে রক্ত এসেছিল ?

এবার ওয়াং চটে গেল। তার মুখ দেখে তাই মনে হল। দ্রুত হাত নেড়ে মাথা নেড়ে ফু মী হোঁ পি চিং ফাং ইত্যাদি অনেকগুলি চীনা শব্দ একসঙ্গে বলে ফেলল। কিছুই যখন বুঝি না, আমার কাছে সব শব্দ একরকম। চুপ করে থাকি। ওয়াং তার সিগারেট ধরিয়ে নেয় এবং দ্বিতীয়বার আমাকে অফার না করে সিগারেটের বাক্স ও লাইটার একসঙ্গে পকেটে ঢোকায়। সাহেবের এই আচরণ আমাকে বিস্মিত করল। কিন্তু জিনিসটা গায়ে মাখলাম না।

বলব কি, ওয়াং-এর জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। বললাম, তোমার শিগগির রক্ত নেওয়া দরকার। মনে হয়, ক ঘণ্টার মধ্যে তুমি বড্ড বেশি উয়ীক্ হয়ে পড়েছ। কালও তোমাকে এত রোগা দেখিনি, সাহেব।

এবার ওয়াং আরও বেশি চটে গেল। মাথা নেড়ে বলল, আমার রক্ত চাই না। আই ডোণ্ট্ রিকোয়ার ব্লাড।

সে কি! ভাবনায় পড়লাম। তবে কি বাড়ির কর্তাকে রক্ত দেওয়া নিয়ে জোতদারের ছেলেমেয়েরা জামাইরা যেমন সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা চাইছিল, ওয়াং-এর বেলাও তাই হচ্ছে ? আশ্চর্য কি। তাই হয়তো রাগ করেছে ওয়াং। রক্ত নিতে চাইছে না। অভিমান।

শোন সাহেব, ঠাণ্ডা গলায় ওয়াংকে বোঝাই, তোমার কত বড় জুতোর দোকান। তুমি মরে গেলে ব্যবসাটা দেখবে কে! দেশের পক্ষে সেটা ক্ষতি। তুমি তো এ দেশেরই মানুষ হয়ে গেছ। আজ কত বচ্ছর কলকাতায়।

ওয়াং উত্তর করে না। এক মনে সিগারেট টানে। একটা জিনিস লক্ষ করলাম। সাহেব সিগারেট টানছে, কিন্তু ধোঁয়া দেখছি না। এটা কি করে

সম্ভব। জ্বলন্ত সিগারেট টানছে, অথচ ধোঁয়া নেই। অবশ্য তখন অতশত ভাববার সময় ছিল না আমার। আমার কেবল মনে হতে লাগল সাহেব এক্ষুনি পালিয়ে যাবে। কাজেই তাড়াতাড়ি কথাগুলি শেষ করলাম। বললাম, ঠনঠনের একটা পুরোনো থুথ্‌ড়ে প্রেসের কর্মচারী আমি। পুয়োর মাইনে পাই, তুমি জান মিঃ ওয়াং। আমি বেঁচে থাকলে যা মরলেও তাই। কারোর কিছু ক্ষতি হবে না। আমার মতন লাখ লাখ গরীব রোজ মরছে! আমি গেলে দেশের আর একটা গরীব কমবে। তোমার বেঁচে থাকা দরকার।

নো নো, আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট ব্লাড। একগুঁয়েমির সুর ওয়াং-এর।

বললাম, তোমার জুতোর কারবার দিন দিন আরো বড় হবে, বাড়বে। তোমার জুতো ইণ্ডিয়ার বাইরে যাচ্ছে। তাতে দেশে ফরেন মানি আসছে। তোমাকে হারাতে পারি না আমরা।

আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট ব্লাড। হাম্‌ ব্লাড নেহি লে গা। পিটপিটে চোখ দুটো একেবারে এইটুকুন করে সাহেব খিঁচিয়ে উঠল।

কেন এ কথা বলছ সাহেব! এবার না বলে পারলাম না। কথটা ক্রমাগত আমার মগজে খোঁচা মারছিল। তবে কি তোমার ছেলেমেয়েরা রক্ত দিতে চাইছে না? তোমার ওয়াইফ কী বলছে! তোমার বন্ধুরা?

ওয়াং নীরব। বাইরে দেবদারু গাছে একটা রাতজাগা পাখি টুইটুই করে উঠল। হঠাৎ আমার মনে হল যেন অনেক রাত হয়েছে। পরে ওয়ার্ডে ফিরে গিয়ে দেখেছিলাম মোটে আটটা বেজে দশ। ঠিক দশ মিনিটের জন্য ওয়াং হাসপাতালের বারান্দায় এসে আমার সঙ্গে কথা বলেছিল।

কি হল ওয়াং, চুপ করে আছ?

সিগারেট শেষ করে ওয়াং পোড়া টুকরোটা রেলিং-এর ওপারে ছুঁড়ে দিল। তারপর মুখটা কঠিন করে আমাকে দেখল। তার কপালের সিটিয়ে যাওয়া চামড়ায় অগুনতি চিরিবিরি রেখা জাগল। বুঝলাম যত বেশি রক্তের কথা বলছি ওয়াং ততই বিরক্ত হচ্ছে। নতুন করে রেগে যাচ্ছে। আমিও নাছোড়বান্দা। বললাম, তোমার ছেলেমেয়েরা তোমার ওয়াইফ তোমার দোকানের কর্মচারীরা বা তোমার বন্ধুরা যদি তোমাকে রক্ত না দেয় তাতে তোমার রাগ বা দুঃখ করার কিছু নেই। তোমার অনেক টাকা মিঃ ওয়াং। ব্লাড যোগাড় করতে কোনো অসুবিধেই নেই।

ব্লাড! স্যাৎ? অনেকক্ষণ পর ওয়াং চীনা শব্দটা ব্যবহার করল। তারপর

আমার চোখে চোখ রেখে বিচ্ছিরি ভেংচি কাটল। কোনোদিন যা করতে দেখিনি। তা কাটুক ভেংচি। গায়ে মাখলাম না। রাগ করলাম না। বরং গলায় আর একটু সহানুভূতি ঢেলে বললাম, টাকা থাকার তোমার এই সুবিধে সাহেব—হাসপাতালে রক্ত নেই, কলকাতায় রক্ত নেই, দিল্লি বোম্বে মাদ্রাজ কাশ্মীর থেকে তুমি রক্ত আনাতে পার।

একটু থেমে থেকে আবার বলি, আর যদি মনে কর যে, ইণ্ডিয়া ভুখার দেশ। দিল্লি বোম্বে মাদ্রাজ বা কাশ্মীরেও কলকাতার মতন রক্তের দুর্ভিক্ষ লেগেছে, কোথাও এক ফোঁটা রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না, তাতেও তোমার কিছু যায়-আসে না। টাকার কুমীর তুমি। ইংলণ্ড আমেরিকা ফ্রান্স জার্মানী রাশিয়া—চাই কি তোমার স্বদেশ চীন থেকে প্লেনে করে তুমি প্রচুর ব্লাড আনাতে পার।

স্যাৎ! আমার মুখের কাছে মুখটা সরিয়ে এনে সাহেব এত জোরে শব্দটা উচ্চারণ করল। কেবল কি উচ্চারণ। খাঁদা নাক চোখ সাংঘাতিক কুঁচকেমুচকে আবার একটা বিকট ভেংচি কাটল। দেখে রীতিমত ভয় পেলাম। দু পা পিছনে হটে দাঁড়াই।

তখন সাহেব হাসল। যেন আমার রাগ অথবা বিরক্তি অথবা ভয় পাওয়া দেখে কুলকুল করে হাসল। মানুষটা চিরকালই ভাল তো। আমাকে খুশি করতে সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা হাত চেপে ধরল। উঃ, বরফের মতন ঠাণ্ডা লাগল ওয়াং-এর শীর্ণ শুকনো হাতের আঙুল। মনে হল, যেন ঐ ঠাণ্ডা আমার মেরুদাঁড়া ছুঁতে চাইছিল। কিন্তু তার মুখের হাসিটা এত অন্তরঙ্গ এত উষ্ণ, ঠাণ্ডার বোধটাই আমার চলে গেল।

শোন বাবু, শোন! চিং বু হি, ফা মি শী—আবার একসঙ্গে কয়েকটা চীনা শব্দ মুখ দিয়ে বের করল ওয়াং। তারপর আমাকে সবটা মানে বুঝিয়ে দিতে বলল, আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট ব্লাড—রক্ত চাই না আমি। অল ব্যাড ব্লাড। অল পলিউটেড—পৃথিবীর সব রক্ত খারাপ হয়ে গেছে। বুঝেছ বাবু! দিস ইজ এ উইকেড ওয়ার্লড—অল ম্যান করাপটেড হি—হি!

আমি চুপ, হতভম্ব। তুষারের মতন ঠাণ্ডা আঙুলগুলি বাড়িয়ে আমার বুক ছুঁয়ে আবার একটু আদর করল ওয়াং। বলল, চলি—বাই বাই···

এবার আর পুব-দক্ষিণ কোণার গেট দিয়ে না, সোজা রেলিং টপকে সাহেব ওপারে চলে গেল। তারপর যেন মনে হল পালকের মতন পাতলা হালকা শরীরটা নিয়ে ঝাউ গাছের দিকে উড়ে গেল। গাছের পাতাগুলি জ্যোৎস্নায়

চিকচিক করছিল। দেখলাম, ওয়াং-এর সোনা বাঁধান দুটো দাঁত পাতার সঙ্গে মিশে গিয়ে ঝকমক করছে।

ধুঁকতে ধুঁকতে ওয়ার্ডে ফিরে আসি। ভিতরে পা দিয়ে আমার মনে হল, একটা খেলার জগৎ, প্রকাণ্ড খেলার আসরে ফিরে এসেছি। খাওয়াদাওয়া শেষ করে পুতুলগুলি দিব্যি গালগল্প জুড়ে দিয়েছে। বগলা মাস্টার তার লাল টুকটুকে বেড্‌প্যানের গায়ে হাত রেখে মুখে একটা অবোধ হাসি ঝুলিয়ে কাশী মিস্ত্রিরকে ডেকে বলছে, আমার জিম্মায় এখন অনেক রক্ত, উকিলবাবু। শিগগির আর মরছি না। হেঁ—হেঁ।

সুখী মানুষ

মানুষটা এলো, বসল, কথা বলল, চা খেল, গল্প করল—অনেক কথা বলল, অনেকক্ষণ গল্প করল—আর গল্পের ফাঁকে ফাঁকে প্রচণ্ড শব্দ করে হাসল, প্রচুর সিগারেটের ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করল—তারপর চলে গেল।

লুপ্ত বিস্মৃতপ্রায় একটি মুখ।

কিন্তু এতটুকু জীর্ণ হয়নি নিষ্প্রভ হয় নি। বরং আরো বেশি উজ্জ্বল সপ্রতিভ ও প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছে। আরো বেশি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রাণবন্ত উচ্ছল।

প্রগাঢ় বিস্ময় নিয়ে সারদাবাবু তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখলেন, তার কথা শুনলেন হাসি শুনলেন। তারপর যখন সে চলে গেল—অবশ্য মুরারী যখন চলে যায় সারদা নিচের সিঁড়ি পর্যন্ত বন্ধুকে এগিয়ে দিয়ে আসেন—তারপর ঘরে ফিরে এসে কেমন যেন স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে বসে থেকে চিন্তা করতে লাগলেন।

চিন্তা করাটা তাঁর চিরকালের স্বভাব। মানুষের সুখ দেখলে তিনি চিন্তা করেন, অসুখ [illegible] চিন্তা করেন। সুখ অসুখ। টাকার এপিঠ ওপিঠ। টাকাটা [illegible] [illegible]য়ে চলে। তারপর এক সময় এক দিকে কাত হয়ে পড়ে যায়। হয়তো তখন সুখের পিঠটা ওপর দিকে থাকে। দুঃখের দিকটা চাপা পড়ে যায়। আমরা তখন ভাবি সুখটাই সব। দুঃখটা কিছু না। দুঃখ নেই। মানুষ চিরসুখী। কিন্তু তা কি হয়। আবার গড়িয়ে গড়িয়ে চলা। এবং এক সময় কাত হয়ে পড়া। এবার অসুখের দিকটা ওপরে। আর তাই দেখে আমরা মাথায় হাত দিয়ে ভাবি। দুঃখী, চিরদুঃখী এই মানুষ।

কিন্তু মুরারী কি তার ব্যতিক্রম নয়!

এইজন্যই সারদা হঠাৎ একদিন বন্ধুকে দেখে বিস্মিত হলেন, চিন্তান্বিত হলেন। অত্যন্ত পরিচিত মানুষ কাছের মানুষ। গোলপার্কে থাকে। এখান থেকে—সারদাবাবুর বাড়ির এই রাস্তা থেকে মুরারীর বাড়ি আর কতটা পথ। কিন্তু ইচ্ছা করে সারদা সেখানে যান না।

হ্যাঁ, মুরারী একটা ভয়ংকর ব্যতিক্রম। চিরকালের নিয়মের বাইরে। যেন নিয়মটাকে ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে পিছনে ফেলে রেখে সে এগিয়ে চলেছে।

তাই মানুষটাকে দেখলে বুকে ধাক্কা লাগে, চক্ষু স্থির হয়ে যায়। চক্ষু স্থির করে সারদা এতক্ষণ বন্ধুকে দেখছিলেন, কথা শুনছিলেন, হাসি শুনছিলেন। এখনও তিনি সেভাবে তাকিয়ে আছেন। মুরারীকে নিচের সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে এসে স্থির দৃষ্টি মেলে শূন্য চেয়ারটা শূন্য চায়ের বাটিটা এবং পোড়া সিগারেটের টুকুরো ও ছাইয়ে ভর্তি অ্যাশট্রেটা দেখছেন। যেন এখনও তিনি মুরারীর দরাজ গলার হাসি শুনতে পাচ্ছেন, কথা শুনতে পাচ্ছেন। তার হাত নাড়া, চোখ নাড়া, পা দোলানো ও গাল ফুলিয়ে ফুলিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়ানোর ফুর্তিযুক্ত অনায়াস সহজ ভঙ্গিটা সারদার চোখের সামনে ভাসছে।

ছবিটা চিন্তা করে সারদা বিড়বিড় করে উঠলেন। মুরারী মানুষ না। একটা জলজ্যান্ত অনিয়ম। যেন আশ্চর্য কোন জীব। অদ্ভুত তার প্রকৃতি, অস্বাভাবিক আচরণ। স্ত্রী টি বি স্যানিটেরিয়ামে পড়ে আছে। একমাত্র মেয়ে। বছর-দুই আগে বিয়ে হয়েছিল। বিধবা হয়েছে। ছোট ছেলেটা জন্ম থেকে বিকলাঙ্গ। আর বড় ছেলে—যাকে দিয়ে মুরারীর আশাভরসা, যার উপার্জনের ওপর, সাহায্য ও সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে এই পঞ্চাশ বছর বয়সে সে কতকটা নিশ্চিন্ত হতে পারত, সেই ছেলে—বাইশ-তেইশ যার বয়স, এখন গুণ্ডা বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে রাতদিন হইহই করে কাটাচ্ছে। নিয়মমত বাড়িতেও থাকছে না। কোথায় তার রাত কাটে, কোথায় দিন কাটে, মুরারী জানে না, খবরও রাখে না।

আর মুরারী নিজেও তেমন কিছু একটা কৃতী পুরুষ, সফল মানুষ না। আইন পাস করে 'বার'-এ জয়েন করেছিল। কিন্তু কোনদিন মক্কেল জোটাতে পারল না। অগত্যা চাকরিতে ঢুকল। সাধারণ চাকরি। সামান্য মাইনে। কিন্তু সেই চাকরিও বেশিদিন থাকল না। ছাঁটাই কর্মচারীদের দলে পড়ে গেল। তারপর বেশ কিছুদিন বেকার হয়ে ঘরে বসে কাটাল। যেন তখনই ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়িখানা বেচে দিয়ে গোলপার্কে একটা ভাড়া বাড়িতে উঠে গিয়েছিল।

তখন পর্যন্ত সারদা বন্ধুকে দেখতে পেতেন। তার খোঁজ খবর রাখতেন। স্ত্রীকে স্যানিটেরিয়ামে পাঠানোর ব্যাপারে সারদা কিছুটা সাহায্য করেছিলেন বইকি। কিন্তু মুরারী যেন কারোর কোনরকম সাহায্যের প্রত্যাশী ছিল না। এক দিকে বন্ধু অন্য দিকে নিকটতম প্রতিবেশী। পাশাপাশি বাড়ি। সারদার বাবাও মুরারীর বাবা একসঙ্গে জমি কিনে ভবানীপুরে বাড়ি তুলেছিলেন। মুরারীর দারিদ্র্য সারদাকে পীড়িত করত। এবং এটা কর—ওটা করা ঠিক হবে না ইত্যাদি অনেক রকম উপদেশ পরামর্শ তিনি বন্ধুকে দিয়ে ছিলেন বা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুরারী কোন উপদেশ গায়ে মাখত না, কোন পরামর্শ কানে নিত না। হেসে তুড়ি মেরে সবই উড়িয়ে দিত। যেন তার কিছুই হয় নি—কিছুই হবে না, দুর্ভাবনায় পড়ার মতন অবস্থা এখনও হয়নি এমন একটা ভাব দেখিয়ে দিব্যি ক্রিকেট খেলার মাঠের গল্প জুড়ে দিত বা একটা সরকারী বিল নিয়ে এসেম্বলী হাউসে আজ দুই দলের মধ্যে কেমন মজার লড়াই বেধেছিল অপর কোন বন্ধুর কাছে শুনে আসা গল্পটা রসিয়ে রসিয়ে সারদার কাছে বর্ণনা করতে লেগে যেত। বা গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরার সরকারী পরিকল্পনা নিয়ে অমুক কাগজ কি-সব টিপ্পনী কেটেছে তার গল্প। সারদা হাঁ করে তাকিয়ে থেকে মানুষটাকে দেখতেন। সেই যে ছেলেবেলায় বাপ-কাকাদের মুখে শোনা যেত—অমুক লোকটার গায়ে বাতাস লাগে না—মুরারীকেও তাই দেখতেন সারদা। থাক না মাথার ওপর ঝড়-ঝাপটা, আমার গায়ে বাতাসটি লাগছে না। মুরারীর চোখ-মুখে সর্বদা যেন এই কথাটা লেখা থাকত।

শেষ দিকে তিনি আর বন্ধুকে বিশেষ কিছু বলতেন না। কারণ উপদেশ দিতে গেলে মুরারী বিরক্ত হত সারদা টের পেতেন। এমন কি সারদা এসেছে টের পেল মুরারী অনেক সময় বাড়িতে থেকেও সাড়া দিত না। বা কোথাও কাজ আছে বলে তখনি বেরিয়ে পড়ত। বন্ধুর সঙ্গে বসে আর গল্প করবে কি, মুরারী তাকে ঘরে ঢুকবারই সুযোগ দিলে না চিন্তা করে সারদা ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে আসতেন। তারপর থেকে তিনি আর মুরারীর বাড়ি যেতেন না। এবং মুরারীও এ-বাড়ি আসা বন্ধ করে দিয়েছিল। এর ঠিক ক'দিন পরেই শোনা গেল বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে মুরারী ভবানীপুর ছেড়ে চলে গেছে।

তারপর দীর্ঘদিনের অদর্শন।

আজ আবার মুরারীকে দেখে সারদা হোঁচট খেলেন। একটুও বদলায় নি। সেই পা-দোলানো, হাত নাড়া—গাল ভর্তি করে সিগারেটের ধোঁয়া ছড়ানো।

হাসি গল্প।' যেন আরো বেশি সজীব হয়ে উঠেছে, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আমুদে হয়ে উঠেছে মানুষটা।

একটা জিনিস আরো বিস্মিত করল সারদাকে।

যেন আজ প্রথম তিনি এটা আবিষ্কার করলেন। মাথার একটি চুলও তো পাকে নি মুরারীর। মুখের চামড়ায় এতটুকু ভাঁজ পড়ে নি। বরং, দেড়-দুবছর পরে দেখা, শরীরটা যেন আরো শক্ত হয়েছে, হাতের কব্জি আরো পুরু হয়েছে। ঘাড়ে চিবুকে যেটুকু মেদ দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল এখন আর তাও নেই, তার পরিবর্তে কেমন একটা উদ্ধত তারুণ্য উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে। যেন নূতন করে মুরারী যুবক হতে চলেছে।

অথচ সেই তুলনায়, আয়নায় অহরহ নিজের চেহারা দেখছেন সারদা, মুরারীর সমবয়সী হয়েও কেমন যেন ঢিলেঢালা হয়ে গেছেন তিনি। মাথায় যে ক'টা চুল আছে সাদা হতে আরম্ভ করেছে এবং বাকি সমস্ত মাথা-জুড়ে সবিশাল টাক। দু বছর আগেই চুলের মাথার এই চেহারা হয়েছে। এদিকে আবার ডায়াবিটিসের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তাই শরীরটা এই ক'মাসে আর একটু বেশি নরম হয়ে পড়েছে। চিবুকের চামড়া ঝুলে যাচ্ছে, নাকটা হেলে গেছে। তখন মুরারীকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়ে সারদা তার পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। সারদার লজ্জা করছিল। কেমন ছোট হয়ে গেছেন তিনি। আগে যেন তাঁর মাথা মুরারীর মাথাকে ছাড়িয়ে যেত। এখন দেখলেন মুরারীর থুতনির নিচে পড়ে আছেন তিনি। চিবুক তুলে ধরে সারদাকে কথা বলতে হচ্ছিল।

আশ্চর্য স্বাস্থ্য! স্বাস্থ্য মনের স্ফূর্তি। কোথা থেকে এত প্রাণ এত শক্তি এত উদ্দীপনা পাচ্ছে মানুষটা, কি তার উৎস সারদা ভেবে ঠিক-করতে পারছিলেন না। যার স্ত্রীর এমন অবস্থা, মেয়ে বিধবা হয়েছে, একটা ছেলে বিকলাঙ্গ, আর একটা ছেলে কুসংসর্গে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল। এদিকে বাড়িখানা গেছে। নিজে কর্মহীন। বাড়ি-বিক্রির টাকায় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। হয়তো সবটা লাগে নি। বাকিটা দিয়ে সংসারের খরচ চলছিল। না কি এখনো চলছে। তা হলেই বা কত টাকা আর হাতে থাকবে। বসে খেলে রাজার ধনও ফুরোয়। কিন্তু দুশ্চিন্তার সূক্ষ্মতম রেখাটিও কি মুরারীর মুখে দেখতে পেলেন সারদা? আজও খেলার মাঠের গল্প করে গেল, সমুদ্রে মাছ ধরার সরকারী পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাওয়ার দরুন অমুক কাগজ আবার কি-সব টিপ্পনী কাটতে আরম্ভ করেছে বা হাওড়ার পর শেয়ালদার লাইনে ইলেকট্রিক ট্রেন চলতে শুরু করায়

ও-দিকে জমির দর রাতারাতি কেমন বেড়ে যাচ্ছে রসিয়ে রসিয়ে মুরারী কত খবর বলে গেল। তা ছাড়া, কোন এক উকিল-বন্ধুর মুখে শোনা একটা চটকদার ডিভোর্সের মামলার কাহিনীও আর একটু বেশি রঙ চড়িয়ে রস চড়িয়ে সারদার কাছে বর্ণনা করতে ভুলে থাকল না বন্ধুটি।

এবং এটাও সত্য, অনেকদিন পর মুরারীকে দেখে, মুরারীর কথা ভাবতে গিয়ে সারদা নিজের দিকে তাকালেন। যেন তাকানো না, নিজের সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। কই তিনি তো একদিনের জন্যও হাসতে পারলেন না। প্রাণখুলে কেমন করে হাসতে হয় এবং সেই হাসির উৎস কি, আজও এই পঞ্চাশ বছর বয়সেও তাঁর কাছে অজ্ঞাত থেকে গেল। অথচ তিনি একজন কৃতী পুরুষ। পাঁচজন ঈর্ষা করতে পারে, এমন অবস্থায় তিনি পৌঁছেছেন। তাঁর দুই ছেলে উচ্চশিক্ষিত। একজন বিলাত থেকে ঘুরে এসেছে। আর-একজন আমেরিকায় আছে। মেয়ের বিয়ে দেননি। মেয়ে ডাক্তারী পড়ছে। এখনই বিয়ে করতে চাইছে না। না, মুরারীর স্ত্রীর মতন তাঁর স্ত্রী অসুস্থ নন। এই বয়সেও চমৎকার হেসে খেলে খেয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। আর বিষয় সম্পদ। মুরারীর পৈতৃক বাড়ি বেচে দিয়েছে আর সারদা তাঁর বাবার তৈরী ছোট একতলা বাড়ি বড় করে বাড়িয়ে প্রকাণ্ড তেতলা বাড়িতে পরিণত করেছেন। তা ছাড়া, যাদবপুরের দিকে তিনি আরো কিছু জমি কিনে রেখেছেন। গাড়ি কিনেছেন। ব্যাঙ্কেও মোটা টাকা জমেছে। মুরারীর ডাইনে-বাঁয়ে, অগ্র-পশ্চাতে ব্যর্থতা ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না। সারদার চতুষ্পার্শ্বে সাফল্যের আলো, সার্থকতার ইঙ্গিত।

অথচ তিনি সন্তুষ্ট নন। সন্তুষ্ট নন, নিশ্চিন্ত নন, নিরুদ্বিগ্ন নন। সর্বদাই কেমন বিমর্ষ, বিষণ্ণ, স্তিমিত, ক্লান্ত। তাঁর কেবলই মনে হয়, কি যেন তিনি পেলেন না, কি যেন হল না। প্রাণ খুলে হাসবার মতন আনন্দ করার মতন কিছুই তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। আবার আনন্দ খুঁজতে বেরোবার মতন সাহস ও উৎসাহের অভাবও তিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেন। এই জন্য তিনি আরো বেশি হতাশায় ভুগছেন। ধর্মকর্ম করে পরমার্থ লাভের দ্বারা জীবনে পরিতৃপ্ত হওয়ার দুরাকাঙ্ক্ষা তাঁর অবশ্য নেই। কিন্তু তীর্থ দর্শনের কথা বাদ দিয়েও এমনি দেশ-ভ্রমণের তাগিদও তিনি বড় একটা অনুভব করেন না। এখন তো ভাল, যৌবনেও খেলার মাঠ কি থিয়েটার বা সিনেমা তাঁকে আকর্ষণ করল না। এসবের মধ্যে খুব একটা আনন্দ আছে তিনি বিশ্বাস করেন না।

তবে কোথায় আনন্দ, কিসে আনন্দ এবং কতটা আনন্দ লাভ করলে মুরারীর

মতন ব্যর্থ বিপর্যস্ত একটি মানুষ হো-হো করে হাসতে পারে। বন্ধুর বাড়ি চড়াও হয়ে একটানা দু ঘণ্টা বসে গল্প করতে পারে, সিগারেট টানতে পারে!

জীবনে অনেক কিছু পেয়েছেন সারদা। অনেক দিকই তাঁর পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু তবু তিনি অপূর্ণ অসম্পূর্ণ মনে করেন নিজেকে। এমন না যে, আরও অনেক কিছুর আকাঙ্ক্ষা তিনি করছেন। আজ পর্যন্ত যা পেয়েছেন, যতটা তিনি হয়েছেন. ততটা না পেলেও যেন তাঁর দুঃখ থাকত না। তিনি বুক চাপড়াতেন না, দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন না, কাঁদতেন না। আবার এর চেয়েও যদি তিনি বেশি হন, বেশি পান, তাঁর কি খুব একটা আনন্দ হবে—এখন আমি পূর্ণ প্রস্ফুটিত বলে আহ্লাদে নৃত্য করবেন? না, তা-ও না। তিনি সেই মানুষ নন। তাঁর বিষণ্নতা তখনও থাকবে। অর্থাৎ এই জিনিস তাঁর কেমন যেন নিজস্ব। হয়তো তাঁর রক্তের মধ্যে আছে সারাক্ষণ ম্লান নির্জীব স্তিমিত হয়ে থাকা। নিরানন্দ মূর্তি তাঁর চিরকালের। বৈষয়িক ক্ষেত্রে উন্নতি অবনতি, সংসার-জীবনের সফলতা-ব্যর্থতার সঙ্গে এর যোগাযোগ নেই।

তাই সারদা ভাবছিলেন। যেন এক দিক দিয়ে দুইজনের মধ্যে মিল আছে।

কিছু না পেয়ে, কিছু না হয়ে মুরারী সদানন্দ পুরুষ।

আর অনেক কিছু পেয়ে, অনেক সফলতা লাভের পরেও সারদা ভয়ংকর অসুখী। যেন মুরারী তার পরেও হাসবে। যখন এর চেয়েও বেশি দুঃখে পড়বে, চরম দুর্দিন আসবে। চিরকাল সে এমন নিশ্চিন্ত। যেন নিশ্চিন্ততা তাঁর রক্তে। দুটি মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এমন আকাশ পাতাল ব্যবধান কেন, সারদা ভেবে পেলেন না। মুরারীকে তিনি ঈর্ষা করতে লাগলেন।

অবশ্য মুরারী সম্পর্কে তাঁর অপরিসীম বিস্ময় বেশিক্ষণ রইল না। একটু পরেই মণিশংকর এলো ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে। সারদার বন্ধু এবং মুরারীরও বন্ধু। অনেকদিন পর সারদা মণিশংকরের কাছে মুরারীর কথা তুললেন। আজও সে হো-হো করে হাসছে। তেমনি ড্যামকেয়ার ভাব। যেন সুখ তার হাতের তেলোর মধ্যে। কেউ তা কেড়ে নিতে পারবে না। চিরকাল সে সুখের পায়রা। ব্যাপার কি!

শুনে মণিশংকর চুপ করে রইল। চেটোর নিচে ছড়ির হাতলটা ঘোরাতে লাগল। কিছু একটা চিন্তা করছিল বোঝা গেল।

তারপর সারদার দিকে যখন চোখ তুলল দেখা গেল মণিশংকর ঠোঁট টিপে হাসছে।

'অনেকদিন পর মুরারী হঠাৎ তোমার বাড়ি ?'

'তা জানি না। তবে দেখলাম, একটুও বদলায়নি। বরং আগের চেয়েও যেন ফুর্তিতে দিন কাটাচ্ছে।'

'আমিও অনেকদিন দেখি না। আমার বাড়িও আসে না।' ছড়ির হাতলটা মুঠ করে ধরল মণিশংকর। 'তবে সে যে মহাসুখে আছে—অনেক আগেই আমি টের পেয়েছিলাম।'

'এখানে থাকতে ? ভবানীপুরে যখন ছিল ?' কেমন যেন সতর্কভাবে মণিশংকরের চোখের মণি দুটো দেখছিলেন সারদা।

মণিশংকর ঘাড় কাত করল।

'হ্যাঁ, তাই তো। কেন, তখনও কি তাকে মনমরা হয়ে থাকতে দেখেছ ? একদিন ?'

'না। মনমরা সে কোনদিনই না। চিরদিন একরকম। ভীষণ ফুর্তিবাজ, ভীষণ—'

'না, তা হলেও, হয়তো তুমি খুব ভাল করে লক্ষ করনি'—গলার স্বরটাকে খাটো করে ফেলল মণিশংকর। 'স্ত্রী অসুস্থ হবার পর থেকে মুরারীর ফুর্তির মাত্রাটা বেড়ে গিয়েছিল। এখন মনে করে গ্যাখো।'

সারদা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

মণিশংকর মৃদু শব্দ করে হাসল।

'সেই ফুর্তি, সেই আনন্দ এখন চরমে পৌঁছেছে।'

কপালে রেখা জাগল সারদার। আঙুল দিয়ে দুপাশের রগ টিপে ধরে মণিশংকরের মুখটা দেখতে লাগলেন।

'কথা বলছ না ?' মণিশংকর একটু ঝুঁকে বসল।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' কপাল থেকে হাত সরিয়ে সারদা সোজা হয়ে বসলেন। 'যদি তুমি সে কথাই বল, স্ত্রী অসুস্থ থাকাতেই তার আনন্দ, তবে তো এমন বিপদ, এ ধরনের দুর্ঘটনা তার পরিবারে আরো ঘটেছে। জন্ম থেকে একটা ছেলে বিকলাঙ্গ। বিয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে বিধবা হল—বড় ছেলেটা কুসংসর্গে পড়ে—'

সারদাকে কথা শেষ করতে দিল না মণিশংকর।

'আশ্চর্য ! আমি কি বলছি একটার পর একটা বিপদ ও দুর্ঘটনা ঘটছে দেখে মুরারী আনন্দ পাচ্ছে ? তা হবে কেন। বরং অসুস্থ স্ত্রীর জন্যও সে দুঃখিত—

ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়েও বেদনা পাচ্ছে—না তা নয়—আমি বলছিলাম স্ত্রী অসুস্থ হওয়ার পর থেকে এমন কিছু এসেছে মুরারীর জীবনে, সে এমন কিছু পেয়েছে, যা সত্যি তাকে আনন্দ দিচ্ছে—সে সুখী। এবং সেই সুখ এত তীব্র ও প্রবল যে, দুঃখগুলি বেমালুম চাপা পড়ে গেছে। পরিবারের কোন দুঃখদুর্দশা তাকে আর বিচলিত করতে পারছে না।' একটু থেমে মণিশংকর বলল, 'তুমি তার চেহারা দেখনি, চোখ দুটো দেখনি? চোখ-মুখ দিয়ে যেন কেবল খুশী ঝরে পড়ছে, আনন্দ ঝরে পড়ছে—তাই না?'

সারদা মাথা নাড়লেন।

'সত্যি ওর চেহারা ভাল হয়েছে—যেন দশ দশ বছর বয়স কমে গেছে।'

চেয়ারের পিঠে দেহটা এলিয়ে দিয়ে মণিশংকর গলার নিচে হাসল। ছড়ির ডগা দিয়ে মেঝেটা একটু ঠুকল।

'কমবেই, বয়স কমতে বাধ্য—আমারও কমে যেত বয়স, তোমারও কমত, বুঝলে ব্রাদার—হেসে হেসে মণিশংকর মাথাটা দোলাতে লাগল। 'পঞ্চাশ আর বাইশ—মুরারীও, পঞ্চাশ পেরিয়েছে—কেমন না।'

সারদা আবার স্তব্ধ। যেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে একটা কিছু দেখবেন বলে মণিশংকরের চোখের মণিদুটোর দিকে তাকিয়ে। তাঁর কপাল ও চোখের কিনারের চামড়া কুঁচকে রইল।

'হ্যাঁ, বাইশ হবে। বা বড়জোর তেইশ।' দেওয়ালের দিকে চোখ ঘুরিয়ে মণিশংকর খানিকটা নিজের মনে বলল, 'তার বেশি না। মুরারী এ-পাড়ায় থাকতে তার স্ত্রী অসুখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তো সে এসেছিল। চার বছর আগে। তখন কি আর আঠারো উনিশের বেশি ছিল তার বয়স। কিছুতেই না। ভয়ংকর কচি ছিল মুখখানা। তাই তো দেখেছি।'

দেওয়ালের দিক থেকে চোখ নামিয়ে সারদার মুখের দিকে তাকাল মণিশংকর।

'তুমি তো দেখেছ মেয়েটিকে। বেশ ফুটফুটে চেহারা।'

সারদা ঢোক গিলে থুতনিটা নাড়লেন।

'শুনতাম শালীর মেয়ে। মুরারীর বৌয়ের দূর-সম্পর্কের কোন্ বোনের মেয়ে যেন। স্ত্রীর অসুখের সময় মুরারী নিয়ে এসেছিল সংসারের কাজকর্ম করবে বলে। গরীব। মেয়েটারও একটা আশ্রয়ের দরকার ছিল, মুরারী বলত তখন।'

'হ্যাঁ, বলত, আমায়ও একদিন ঐ বলেছিল—ভগবান জানে শালীর মেয়ে কি

আর কারো মেয়ে—তবে এখন আর নিছক আশ্রিতা হয়ে নেই। রীতিমত গৃহিণীর পদ পেয়েছেন তিনি শুনলাম।'

সারদার চোখ বড় হয়ে গেল।

'তবে কি মুরারী আবার একটা বিয়ে করে বসল?'

মণিশংকর ঘাড় নাড়ল।

'না তা করতে যাবে কেন—অত কাঁচা ছেলে মুরারী না। এখনো স্ত্রী বেঁচে আছে। এই অবস্থায় বিয়ে কবার হাঙ্গামা আছে। দরকার কি বিয়ে করার। কিছু দরকার পড়ে না। মুরারীর সংসারে আগে থাকতেই সে শিকড় গেড়ে বসেছিল। এবার ডালপালা মেলে, ফুল ফল ছড়িয়ে—বুঝলে না?' মণিশংকর চোখ ঘুরিয়ে একটু রসিকতা করল।

সারদা আবার নীরব হয়ে গেলেন।

'তাই ভায়ার আমাদের এত সুখ—সুখের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে, এখন বুঝতে পাচ্ছ মুরারীর আনন্দের উৎসটা কোথায়?'

সারদা একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেললেন।

'আমার অন্যরকম ধারণা ছিল মুরারী সম্পর্কে। বুঝি কোন দুঃখ তাকে কাবু করতে পারে না। ভগবান তার ভেতর এমন একটা শক্তি দিয়েছেন, যার জোরে শত শোক-তাপ দুঃখ পেয়েও সে হাসতে পারে, আনন্দ করে বেড়াতে পারে। এমন শক্তিমান পুরুষ, ভাগ্যবান পুরুষ সংসারে দেখা যায় বইকি। অবশ্য খুব কম। লাখে একটি। হয়তো তাও না। কিন্তু এখন যা দেখছি—তোমার মুখে যা শুনলাম—'

মণিশংকর আবার সারদার চোখের দিকে তাকাল।

'মুরারীর গোলপার্কের বাসায় আমিও অবশ্য কোনদিন যাইনি। নানা কারণে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। শুনেছি, ছোট ছোট দুখানা কামরা ভাড়া নিয়ে আছে। আমার বড়মামা গোলপার্কে অনেকদিন বাড়ি করেছেন তুমি জান। সেদিন বড়মামীমা এসেছিলেন আমাদের বাড়ি। সব বললেন। মুরারীকে নিয়ে, ওই মেয়েটাকে নিয়ে বিশ্রী কানাঘুষা চলেছে ও-পাড়ায়—একটা স্ক্যাণ্ডেল—দুর্গন্ধ পেলে মানুষ কেমন নেচে ওঠে বুঝতেই পারছ—'

'থাক—আমাদের আর এ-সব আলোচনা করে কি হবে—' যেন খুব আঘাত পেয়েছেন সারদা। প্রসঙ্গটা সেখানেই শেষ করতে চাইছেন।

মণিশংকর চুপ করল।

সারদা কপালের রগ টিপে ধরে স্থাণুর মতন স্থির হয়ে বসে রইলেন।

একটু পর মণিশংকর উঠে দাঁড়াল ও 'দুর্গা, দুর্গা' বলে হাতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বেরিয়ে গেল।

একদিন, দুদিন—তিনদিন পর্যন্ত সারদা ইতস্তত করলেন। কেবল ভাবলেন। আর-একবার তিনি মুরারীকে দেখতে চান। কি খেয়াল নিয়ে সেদিন এসেছিল, আবার হয়তো অনেকদিন সে এদিকে আসবে না।

কাজেই আবার তার দেখা পেতে হলে দীর্ঘকাল সারদাকে অপেক্ষা করতে হবে। বসে থাকতে হবে। কিন্তু ততদিন যেন অপেক্ষা করার ধৈর্য থাকবে না।

সেদিনই, মণিশংকর চলে যাবার পর সারদা মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন, পরদিন সকালে মুরারীর বাসায় যাবেন।

কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে কি ভেবে নিরস্ত হলেন।

ঠিক করলেন পরদিন যাবেন। সেদিনও যাওয়া হল না। কেবল ইতস্তত করতে লাগলেন। অথচ লোকটাকে আর-একবার না দেখে তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না।

তাঁর একটা ভয় ছিল। যদি মণিশংকরের কথাগুলি সত্য হয়! মণিশংকরের কথা সত্য হোক তিনি চান না। তার মামীমার রিপোর্ট মিথ্যা হবে, এই আশাই সারদা হৃদয়ে পোষণ করছেন। তাই তিনি সেই শিশুকে দেখতে চাইছেন, যে কেবল হাসতে জানে, আনন্দ করতে জানে—জগৎ সংসারের কোন দুঃখ দৈন্য শোক তাপ যাকে এতটুকু স্পর্শ করে না। মুরারীর রক্তের মধ্যে অফুরন্ত আনন্দ উল্লাস ছড়িয়ে আছে। একটি তরুণীর ভালবাসা নূতন করে তার রক্তে দোলা দিয়েছে তাকে উৎফুল্ল করে রেখেছে, সারদা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। মণিশংকরের কথা শুনে তিনি দুঃখ পেয়েছেন, তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। যেন গায়ে পড়ে মুরারী সম্পর্কে কথাগুলি শোনাতে মণিশংকরের সেদিন ছুটে না এলে চলছিল না।

এই জন্যই সেদিন মণিশংকর যখন বেরিয়ে যায়, সারদা তাকে এগিয়ে দিতে সিঁড়ি পর্যন্ত ছুটে যাননি। নিজের আসনে চুপ করে বসে ছিলেন। মুরারী যখন চলে যায়, সারদা সঙ্গে গিয়েছিলেন, সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

সারদা হতাশার ছবি, অন্ধকারের ছবি, ম্রিয়মানতার মূর্তি।

মুরারী আশা আলো উত্তেজনা ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতীক। তাই মুরারীকে দেখে সারদা সেদিন এত বিস্মিত হন। আগে বুঝতেন না, সেদিন বুঝেছিলেন, সুখী

সবাই হতে পারে না। সব পেয়েও একজন অসুখী থেকে যায়। আবার কিছু না পেয়েও আর-একজন মহাসুখী। আজ যদি একটার জায়গায় সারদার সাতটা বাড়ি হয়, সাতখানা গাড়ি হয়, তবু তিনি মুরারীর মতন হাসতে পারতেন না। আজ মুরারী ভাড়া বাড়িতে আছে, কাল ভাড়া দিতে না পেরে যদি রাস্তায় দাঁড়ায়, তবু একটি বন্ধুর দেখা পেলে মুখ কালো করে না থেকে সে হাসবে, বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরবে এবং পকেটে শেষ-সম্বল দু-চার আনা থাকলে তাই দিয়ে আপ্যায়ন করতে বন্ধুকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ একটা চায়ের দোকানে ঢুকবে। অর্থাৎ সেখানে বসে কিছুক্ষণ গল্প করা, হৈ-হৈ করে সময় কাটানো। দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনাকে এভাবে সাত হাত দূরে ঠেকিয়ে রাখতে দুঃখের মুখে পাথর চাপা দিতে তার জুড়ি নেই।

আর মুরারীর এই আশ্চর্য শক্তিকে খর্ব করতে কত কি চক্রান্ত। ওপাড়ার মানুষ ভীষণ কানাঘুষা করছে। মণিশংকরের মামীমা সব শুনে এসেছে। মণিশংকরও এ-সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ।

মুরারী অকারণে খুশি নয় নিশ্চিন্ত নয়।

তার সুখী হওয়ার পিছনে একটা কারণ আছে।

কারণ। যেন মণিশংকর একটা কালো মাছি ছেড়ে দিয়ে গেছে, আর সেটা বার বার সারদার মনের ওপর উড়ে বসতে চাইছে। সারদা প্রাণপণে হাত নেড়ে মাছিটা তাড়াতে চাইছেন।

চতুর্থ দিন আর ইতস্তত না করে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। গাড়ি নিলেন না। গাড়ি চড়ে মুরারীর গোলপার্কের বাসায় যেতে মন উঠল না।

মুরারী তখন তার ছোট ঘরে জানালার ধারে চুপ করে বসে আছে। ওদিকটা ফাঁকা। আকাশ দেখা যায়। মাঝখানে একটা ঝাউ গাছ।

যেন চুপ করে বসে জানালার বাইরে ঝাউ গাছের ফাঁক দিয়ে সে পশ্চিমের রক্তবর্ণ আকাশ দেখছে। তখন বেলাশেষ।

এটা সত্য, সারদা একদিন খুব উপদেশ দিত, মুরারীর আজ আর মনে নেই। মনে নেই বলে সেদিন সারদার বাড়ি গিয়ে বন্ধুকে দেখে এসেছে, তার সঙ্গে বসে গল্প করে এসেছে। আজও সারদাকে দেখে সে ভয় পেল না, তাকে এড়াতে চেষ্টা করল না। বরং খুশি হয়ে সমাদর করে বন্ধুকে বসতে দিল।

মুরারীর মুখোমুখি আর একটা বেতের চেয়ারে সারদা বসলেন।

'কি করছিলে?'

'এই তো, বসে আছি—আকাশ দেখছি।' পায়ের ওপর পা তুলে দিল মুরারী, চেয়ারের পিঠে শরীর এলিয়ে দিয়ে হাই তুলল। 'চমৎকার লাল হয়ে আছে ওদিকটা।'

কিন্তু ওদিকে তাকান না সারদা। মুরারীর চোখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসেন।

মুরারী একটু অবাক হল। সারদা তো এভাবে হাসে না। সারদাকে কোনদিন সে হাসতেই দেখল না। এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন বন্ধুর হাসির অর্থ বুঝতে পেরে সে শব্দ করে হাসল।

'ভাবছ এমন একটা ঘরে থেকে, এমন খিঞ্জির ভেতর বাস করে সূর্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করছি, কেমন?'

সারদা কিছু বললেন না। হয়তো চোখ ঘুরিয়ে একবার ভিতরটা দেখলেন। এইটুকুন কামরা। জিনিসপত্রে ঠাসা। নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়।

কিন্তু মুরারী হেসেই চলেছে। যেন সারদা অবাক হওয়াতে তার আরো বেশি আনন্দ হয়েছে।

'আমার ভাল লাগার ভাল থাকার অসীম ক্ষমতা বুঝলে ব্রাদার, এমন দম-বন্ধ-হওয়া ঘরে বসেও বিকেলের লাল আলো উপভোগ করছি, আনন্দ পাচ্ছি।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।' সারদা আর বন্ধুর দিকে না তাকিয়ে মেঝের দিকে চোখ রাখলেন। একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। মুখের মৃদু হাসিটুকুও অদৃশ্য হল। 'সুখী মানুষ তোমার কথা আলাদা।' ধীরে ধীরে কেমন যেন চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন তিনি।

'আমার কথা আলাদা! কেন, তুমি কি ঠাট্টা করছ! খোঁচা দিচ্ছ আমায় একথা বলে?' মুরারী হাসি বন্ধ করল। তার কপালের চামড়া কুঁচকে উঠল। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। সারদাকে নীরব দেখে পরক্ষণে সে আবার হো-হো করে হেসে উঠল। 'হ্যাঁ ভাই, সত্যি আমি অন্য মানুষ আলাদা জাতের মানুষ—আমি যত সহজে সুখী হই—যত চট করে একটা কিছুর মধ্যে আনন্দ পাই তোমরা তা পাও না। তা হলে একটা গল্প বলি শোন।' গল্প বলার উত্তেজনায়, চিরকাল সে যা করে এসেছে, চেয়ারের পিঠ থেকে শরীর আলাগা করে সোজা হয়ে বসল, বড় বড় চোখ করে সারদার দিকে তাকাল। 'কাল খুব বৃষ্টি হয়েছে এখানে, তোমাদের ভবানীপুরে হয়নি?'

'হয়েছিল।' সারদা মৃদুস্বরে উত্তর করলেন। 'দুপুরের দিকে।'

'হ্যাঁ, দুপুরে। এখানে অবিশ্যি বিকেলেও এক পশলা হয়েছিল। কিন্তু

দুপুরে খুব জোরে বৃষ্টিটা এসেছিল, তাই না! কেমন কালো করে ফেলেছিল আকাশটা বল দিকিনি!'

সারদা কথা না বলে শুধু ঘাড় কাত করলেন।

'আমি তখন কোথায় ছিলাম জান—ওখানে, ওই গাছটার নিচে।' আঙুল দিয়ে মুরারী জানালার বাইরে ঝাউগাছটা দেখাল।

'বিপজ্জনক।' সারদা কঠিন গলায় মন্তব্য করলেন। 'ঝড়বৃষ্টির সময় গাছ-তলায় দাঁড়ানোর বিপদ আছে—তখন বজ্রপাত হয়—হতে পারত।'

'হ্যাঁ, তা পারত, কিন্তু আমার কি তখন বজ্রপাতের কথা মনে ছিল। এত ভাল লাগছিল বৃষ্টিটা, এত আনন্দ হচ্ছিল জলে ভিজতে।' মুরারির চোখের মণি চকচক করছিল। যেন কাল জলে ভেজার উৎসাহ আনন্দ আজও তার চোখে লেগে আছে। 'এমন না যে আমি বাইরে থেকে ফিরছিলাম আর বৃষ্টি এসে গেল আর আমি গাছের নিচে আশ্রয় নিলাম। ঘরে ছিলাম, তোমার ওই বেতের চেয়ারটায় বসে ছিলাম। হুড়মুড় করে বৃষ্টি আসতে ছুটে বেরিয়ে গেলাম।'

সারদা স্তব্ধ হয়ে শুনছিলেন।

'সত্যি কেমন একটা ছেলেমানুষিতে পেয়ে গেল তখন। যেন আকাশের কালো মেঘগুলো আমায় ডাকছিল—ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ—দমকা হাওয়া—কিছুক্ষণ মাঠটায় ছুটোছুটি করে গা হাত পা চুল ভিজিয়ে তারপর যখন গাছের নিচে এসে দাঁড়ালাম তখন একটা মজার ঘটনা ঘটল—'

'অদ্ভুত মানুষ।' সারদা অস্ফুট গুঞ্জন করে উঠলেন। কিন্তু মুরারীর কানে তা গেল না। গল্প বলার উত্তেজনায় সে হাত নাড়ছিল পা নাচাচ্ছিল এবং 'মজার ঘটনা' বলতে শুরু করে দুই কাঁধে ঝাঁকুনি তুলে আবার প্রচণ্ড শব্দ করে হেসে উঠল।

'বুঝলে ভাই, ঝাউপাতার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির জল রুপালি ঝালরের মতন কেমন করে ঝরে ঝরে পড়ছে ঘাড় বেঁকিয়ে হাঁ করে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখছি, আর তখন, রোগা লিকলিকে লোম-ওঠা, পাগলা কুকুরই হবে, কেননা লেজটা একটুও নড়ছিল না, কেমন যেন একটু বেঁকে গিয়ে দড়ির মতন ঝুলছিল—হঠাৎ পেছন থেকে এসে গ্যাঁক করে আমার পায়ে কামড় বসিয়ে দিয়ে টলতে টলতে মাঠের দিকে নেমে গেল—যখন চলে যায় তখন নজরে পড়ল—'

'কোথায়—কোন পায়ে!' সারদা চমকে উঠলেন ও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

কিন্তু মুরারীর মধ্যে কোন চঞ্চলতা ব্যস্ততা নেই। হাসতে হাসতে কাপড় সরিয়ে ডান পায়ের হাঁটুর নিচে এক জায়গার মাংস দেখাল। সামান্য ফুলে উঠে লাল হয়ে আছে জায়গাটা।

'কি আশ্চর্য!' সারদা সোজা হয়ে বসলেন ও একটা চাপা নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। চোখ দেখে বোঝা গেল কেমন যেন বিরক্ত হয়ে উঠেছেন তিনি বন্ধুর ওপর। 'তা ওখানটায় সঙ্গে সঙ্গে ওষুধটষুধ লাগিয়েছিলে কিছু? ইনজেকশন নিতে হবে—ট্রপিক্যালে গিয়েছিলে?'

'এই মাটি করেছে!' মুরারী একটু হতাশ হল। কাতর চোখে বন্ধুকে একবার দেখল। তারপর আবার নূতন করে হাসতে আরম্ভ করল। 'তবে আর মজার ঘটনা বলছি কেন।' না, কুকুরের কামড়ের কথা তখন একটুও ভাবিনি—রক্ত বেরোচ্ছে দাঁত বসিয়ে দিয়ে গেছে—সবই দেখলাম, কিন্তু এতটুকু দুশ্চিন্তা হল না। বরং তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হৃষ্টমনে হাওয়ার শোঁ-শোঁ শুনতে লাগলাম, মেঘের ছুটোছুটি দেখলাম আর ভিজতে লাগলাম।'

কিন্তু সারদার দৃষ্টি ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছিল। কাঠের মতন শক্ত হয়ে বসে আছেন। মুরারি এবার গম্ভীর হল। আর হাসল না।

'হ্যাঁ, ওষুধ লাগিয়েছিলাম বৈকি।' সরাসরি সারদার দিকে না তাকিয়ে অন্য দিকে চোখ রেখে মুরারী আস্তে আস্তে বলল, 'কিন্তু তখন না। আরো পরে। আরো কিছুক্ষণ বাইরে থেকে বৃষ্টি ভেজার আনন্দটা ষোল আনা উপভোগ করে ঘরে ফিরে আইডিন দিয়ে জায়গাটা পুড়িয়ে দিলাম।'

যেন বন্ধুকে সন্তুষ্ট করতে মুরারী কথাটা বলল।

সারদা তাতে খুশি হলেন মনে হল না।

'তোমায় একটা প্রশ্ন করব মুরারী?'

'বলো।' এবার মুরারী ঠোঁটের কোণায় হাসল। দুর্বল ক্ষীণ হাসি। অন্তর থেকে আর হাসতে পারছিল না বেশ বোঝা গেল। সারদার শুষ্ক কঠিন চেহারার জন্যই যেন হঠাৎ এমন হয়ে গেল।

'প্রশ্ন করব' বলে সারদা আবার চুপ। চোখ বুজে কি খুব ভাবছেন। এবার বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে কপালের রগ টিপছেন।

মুরারী অস্বস্তিবোধ করল। কিন্তু তা হলেও অনেকটা যেন আন্তরিক হবার চেষ্টায় সামনের দিকে ঝুঁকে বসে বন্ধুর দিকে তাকাল।

'বলো—তোমার যে-কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত।'

'না, প্রশ্ন তেমন কিছু না।' সারদা চোখ খুললেন। 'একটা কথা মনে এসেছে, জানতে চাইছি। শুধু বৃষ্টি দেখার আনন্দ কি তোমায় এতটা আনন্দ দিয়েছিল—এতটা আনন্দ দেয় কাউকে?'

'হ্যাঁ, কেন'! চমকে উঠল মুরারী। হঠাৎ তার মুখের রং পাংশু হয়ে গেল। একটু চুপ থাকল। তারপর জোর করে হাসতে চেষ্টা করল। 'এতক্ষণ আমি কি বললাম তোমায়—খুব সাধারণ জিনিস অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয়ও আমায় আনন্দ দেয় খুশী করে—এমন কি অনেক সময় এক একটা দুর্ঘটনার কথাও ভুলে থাকি—কুকুরের কামড়ও একটা দুর্ঘটনা, তাই নয় কি?'

সারদা আবার নীরব। আবার মুদ্রিত-চক্ষু। কপালের রগ টিপে ধরা বিষণ্ন চিন্তান্বিত মূর্তি।

'তুমি কি আমায় বিশ্বাস করছ না, সারদা?' আর ঝুঁকে না থেকে মুরারী সোজা হয়ে বসল। গলার স্বরে ঝাঁজ ফুটল।

'বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা হচ্ছে না। তবে কিনা বৃষ্টি তো আমরাও দেখি—অনেকেই দেখে—' অস্পষ্ট অপরিচ্ছন্ন গলায় সারদা বলতে আরম্ভ করেও থেমে থাকেন। যেন এর অধিক বলার দরকার পড়ে না।

মুরারী একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

'সারদা!'

'কি?'

'তবে কি তুমি আমায় সন্দেহ করছ—এত আনন্দ কেন মানুষটার, এত সুখী কেন সে?'

এবার সারদা চমকে উঠলেন।

'না না, তা কেন হবে।' তিনি ব্যস্ত হয়ে মাথা নাড়লেন। 'আমি বলছিলাম, কত সহজে কত চট করে তুমি—'

মেঝের দিকে তাকিয়ে ছিল মুরারী। চোখ তুলতে দেখা গেল তার দুই চোখ ছলছল করছে। সারদা আঘাত পেলেন।

'না না সেসব কিছু না, বরং তোমার সুখ দেখে আমি সুখী তোমার আনন্দ আমায় আনন্দ দেয়।' হাত বাড়িয়ে তিনি বন্ধুর কাঁধে মৃদু চাপড় দেন। সান্ত্বনা দেন।

মুরারী সন্তুষ্ট হল। বন্ধুর এই একটা কথায় সে সহজ স্বাভাবিক হয়ে গেল। কত দ্রুত মুরারী সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে লক্ষ করে সারদা আর একবার বিস্মিত হন।

'আসলে মানুষ আমায় ঈর্ষা করে, বুঝলে সারদা।' পূর্বের ন্যায় মুরারীর চোখে-মুখে হাসি ঝলমল করতে লাগল। 'আমার সুখী চেহারা আমার হাসি তাদের ঈর্ষার বস্তু—কোন দুঃখে কেন আমি বিচলিত হই না শোকে কেন মুহ্যমান হই না—'

'তাই।' সারদা উৎসাহভরে মাথা নাড়লেন। 'তারা জানে না সুখ তোমার মধ্যে সহজাত—দুঃখ তোমাকে কোনদিন—'

সারদা এখানে থামলেন। মুরারীর সেই সুন্দরী শ্যালিকা, সম্প্রতি যিনি গৃহিণীর মর্যাদা পেয়েছেন বলে মণিশংকর সন্দেহ করে, ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকলেন। সারদা এই সময়টা মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চা সিঙ্গাড়া এবং আরও কি যেন একটা খাবার টেবিলে সাজিয়ে রেখে যুবতী তেমনি নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'খাও।' টেবিলের দিকে বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল মুরারী।

সারদা নত দৃষ্টি তুলে ধরলেন।

'হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ বন্ধু, সহজাত—।' উৎসাহের আতিশয্যে মুরারীর চোখ চকচক করছিল। 'ছোট ঘর—ঘিঞ্জি তো ভাল—আজ সকালে টেলিগ্রাম পেয়েছি। রাধারাণী, আমার স্ত্রী ক' বছর ধরে স্যানাটোরিয়ামে পড়ে আছে তুমি জান। মাঝখানে একটু ভাল হয়ে উঠেছিল। আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে খবর পেলাম—কাল রক্তবমি হয়েছে—দুঃসংবাদ, কিন্তু তা বলে বিকেলের এই রক্তিম আকাশ আশ্চর্য রং আমি কম উপভোগ করছিলাম কি—তুমি আসার আগে পর্যন্ত চুপ করে বসে ওদিকটা দেখছিলাম—এত ভাল লাগছিল এত আনন্দ পাচ্ছিলাম—' আঙুল দিয়ে মুরারী পশ্চিমের জানালা দেখাল।

আনন্দটা প্রকাশ করতে আবার সে হো-হো করে হাসবে আশংকা করে সারদা তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে চায়ের বাটি ধরতে হাত বাড়ালেন।

সংহার

একবার তিনি সংহার শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। আর একবার বলেছিলেন 'সংহারক'।

অবশ্য সংহার যে করে সেই সংহারক, কিন্তু তা হলেও আমি অল্প হেসে মাথা নেড়েছিলাম। বলেছিলাম, 'পাখিওয়ালাকে আপনি ঠিক এই আখ্যা দিতে পারেন না।'

'নিশ্চয় পারি, আমার চোখে ওই শয়তানও তাই।' একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন ভদ্রলোক, হু, কিশোরীবাবু, মেদ-ভারাক্রান্ত দেহ, বড় বড় চোখ, চোখ দুটোও লাল হয়ে উঠেছিল।

'সিগারেট খান।' পরক্ষণে তিনি শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আমার দিকে সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাইটা বাড়িয়ে দিয়ে আবার দেওয়ালের দিকে চোখ রেখেছিলেন।

আমি আর সেদিকে তাকাইনি। সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।

'শুনুন,' মনে হল কিশোরীবাবু কিছু যেন একটা চিন্তা করার পর আমার দিকে চোখ ফেরালেন। 'এটার মত ওটাও যে একটা শয়তান এ আপনি নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারছেন না?'

'হ্যাঁ, শয়তান আপনি বলতে পারেন, শয়তান নিষ্ঠুর কুচক্রী হৃদয়হীন অনেক কিছু আখ্যা দেওয়া চলে, কিন্তু কথা হচ্ছে কি, লোকটা পাখি শিকার করে, তারপর খাঁচায় পুরে বাজারে নিয়ে সেটাকে বেচে দেয়—এই পর্যন্ত, সে তো কাউকে বধ করছে না, সংহার করছে না—'

কিশোরীমোহন মাথা ঝাঁকালেন। যেন আমি শিশুর মতন কথা বলছি। চোখ বুজে অল্প হেসে নাক দিয়ে এমন একটা ক্ষীণ শব্দও করলেন। তারপর আমার চোখে চোখ রেখে ডান হাতের তেলো প্রসারিত করে ধরলেন।

'পাখিটা যে কিনে নিয়ে যাচ্ছে সে নিশ্চয়ই ওটাকে আবার একটা খাঁচায় পুরবে, পায়ে শেকল পরাবে?'

'হ্যাঁ, তা তো পরাবেই,' বললাম, 'পাখি পুষতে গেলেই খাঁচা ও শেকলের

প্রশ্ন এসে যায়। পাখিওয়ালার কাছ থেকে পাখি কিনে নিয়ে গিয়ে কেউ বনে ছেড়ে দেয় না।'

'কিন্তু আমি একবার তাই করেছিলাম।' কিশোরীবাবু সুন্দর করে হাসলেন। টেবিল থেকে ডান হাতটা গুটিয়ে নিয়ে কোলের ওপর রাখলেন। 'এক বেটা পাখিওয়ালার কাছ থেকে খাঁচাসুদ্ধ পাঁচটা হীরামন কিনে ফেললাম, তারপর বিশ্বাস করবেন? সব কটাকে ছেড়ে দেই, আকাশে উড়িয়ে দেই, তাদের তখনকার সেই মুক্তির উল্লাস আপনি যদি দেখতেন, তারা উড়তে উড়তে বনে ফিরে গেল।'

বিশ্বাস না করার কিছু ছিল না, কিশোরীবাবুর চোখ দুটোর মধ্যে সেই উল্লাস, বিশুদ্ধ জীব-প্রেম নতুন করে জ্বল জ্বল করে উঠতে দেখলাম আমি। তিনি থামলেন না।

'একটা পাখিকে বন থেকে ধরে এনে খাঁচায় পুরে রাখার অর্থ কি, সে তার সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে হারাল, সন্তানদের কাছ থেকে সরে এল, বনের পাখির সমাজে সে আর ফিরে যেতে পারছে না—এটা কি তার পক্ষে মৃত্যুর মতন না? আপনি বলুন?'

চুপ করে রইলাম।

'কাজেই যে লোকটির কথা বলছিলাম, মাঠের ওপর ফাঁদ পেতে বসে থাকে, পাখিটা ভিতরে ঢোকার সঙ্গে দাঁড়টা ঢিলে করে দিয়ে খুট করে খাঁচার মুখ আটকে দেয়—যেদিনই দেখছি, একটা জহ্লাদ ছাড়া শয়তানটাকে আমি আর কিছু কল্পনা করতে পারছি না।' কথা শেষ করে কিশোরীমোহন একটা সিগারেট ধরালেন।

দু তিন টান দিয়ে জ্বলন্ত সিগারেটটা আঙুলের ফাঁকে ধরে রেখে তিনি থুতনি তুলে আবার সেই দেওয়ালের দিকে চোখ রাখলেন।

এবার আমিও সেদিকে চোখ ফেরাই। টিকটিকিটা আর একটা পোকা ধরে গিলে কেমন সুতোর মতন সরু সূক্ষ্ম জিভটা, প্রায় চোখে দেখা যায় না, পিলপিল করে দুবার নেড়ে, মনে হল যেন ঠোঁট চেটে নিয়ে আবার স্থির হয়ে আছে। চোখ দুটো কত শীতল। যেন দুটো কালো পুঁতি, চোখের পাতি নেই, কাজেই এই চোখ নড়ছে কি, নড়ছে না বুঝবার সাধ্য নেই. একবার মনে হতে পারে ওটা আসলে জীবন্ত নয়, দোকান থেকে একটা প্ল্যাস্টিকের টিকটিকি কিনে এনে কিশোরীমোহন তাঁর ঘরের দেওয়ালে আটকে রেখেছেন। এত নীবব স্থির নিস্পন্দ হয়ে থাকতে জানে সে! হুঁ, নিরীহ উদাসীন অন্যমনস্ক।

এই তো একটু আগে ঘরের মেঝেয় ছিল। তখনই অবশ্য আঙুল দিয়ে

কিশোরীবাবু আমাকে দেখিয়েছিলেন। এমন এক একটা সময় গেছে, দুটো একটা মাছি শয়তানের গায়ে এসেও উড়ে বসেছে, কিন্তু একটু নড়াচড়া নেই, অস্থিরতা নেই, যেন শ্বাসও ফেলছিল না দুষ্টু, মাছিরা ভেবেছে একটা কাঠের টুকরো, একটা ময়লা কাগজ। এক সেকেণ্ড পার না হতে দেখা গেছে। আঙুলের মতন সরু রোগা জিরজিরে মেটে রংয়ের কদাকার ভয়ংকর জীবটির রূপ ও পরাক্রম, তার হিংসা, হননের বিচিত্র বীভৎস রূপ ও কৌশল। এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে পাঁচটা মাছি অবলীলাক্রমে সে উদরসাৎ করল।

'এক সঙ্গে দশ দিক দেখতে পারে পাজি।' কিশোরী বলে উঠেছিলেন। 'আমার আপনার চোখ একই সময়ে আর ক'দিকে যায়—আমরা শুধু আমাদের সামনেটাই দেখি।'

কথা না বলে মেঝের দিকে চোখ রেখে ঘাড় কাত করেছিলাম।

'ঈশ্বরের মতন শয়তানের দৃষ্টিও সর্বগামী, জানেন তো।' পরে কিশোরীবাবু আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে উঠেছিলেন।

তাই দেখছিলাম। পুঁতির মতন ক্ষুদে চোখ দুটো দিয়ে সে সামনের মাছিটাকে দেখছে, কেমন স্থির হয়ে আছে, কী অপরিসীম তার ধৈর্য, অবুঝ, অস্থির মাছি, বার বার নড়াচড়া করছে, চুপ করে এক জায়গায় বসছে না। কিন্তু তাতে কি, যত সময় লাগুক, সে অপেক্ষা করবে, যেন অনন্তকাল তার হিম দৃষ্টি একভাবে ধরে রেখে সে অপেক্ষা করতে পারবে। পাকা শিকারী। কখন কোন মুহূর্তে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তার চেয়ে এই জিনিস আর কে ভাল বোঝে।

তাই দেখছিলাম। মাছিটা এতক্ষণ পর এক জায়গায় সুস্থির হয়ে বসেছে, তার ঘাড়ের ও পাখার নড়াচড়া, হাতপায়ের কিলকিল থামল। এইবার, এখন! বুকটা দুরদুর করছিল। অবুঝ জানে না, করাল মূর্তি সাক্ষাৎ যম তার জন্য অপেক্ষা করছে, সেকেণ্ড গুনছে, মিনিট গুনছে—

কিন্তু একি! হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। কিশোরীবাবু যেন আমার মতন এতটা স্তম্ভিত হলেন না। তাঁর চোখ দেখে বুঝলাম। এই জিনিস তিনি অনেক দেখেছেন। আমিও দেখেছি, আমিও আমার ঘরের দেওয়ালে মেঝেয় টিকটিকি কম দেখি কি—না, কিশোরীবাবু আঙুল দিয়ে না দেখালে এবং এতক্ষণ এই পরম সহিষ্ণু ক্ষুদে অত্যাচারীটি সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা না করলে এতটা মনোযোগ দিয়ে তার গতিবিধি লক্ষ্য করতাম না।

সামনের দিকে গেল না। দুষ্টু ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরে গিয়ে পিছনের একটা মাছিকে খপ্ করে গিলে ফেলল।

'অবিশ্বাস্য ব্যাপার!' বিড়বিড় করে উঠলাম। কথাটা কিশোরীবাবুর কানে গেল! আর একবার নাকের শব্দ করে তিনি হাসলেন। 'পামর কখনো কারো বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করেছে শুনেছেন?'

'তা-ও বটে!' বলতে গিয়ে থেমে গেলাম, হঠাৎ টেবিল থেকে পেপার-ওয়েটটা তুলে নিয়ে কিশোরীমোহন মেঝের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। বলাই বাহুল্য, তাঁর হাতের ঢিল লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। চোখের নিমেষে একটা লাফ দিয়ে টিকটিকিটা মেঝে ছেড়ে দেওয়ালে উঠে গেল।

'এমনি ওকে মারা শক্ত।' আস্তে বলেছিলাম।

কিশোরীমোহনের চোখেমুখে তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধ সেই সময় প্রকট হয়ে উঠেছিল। খুব অল্প সময়ের জন্য যদিও। মুখের পেশী শক্ত হয়ে উঠেছিল, নাকের ডগা কুঁচকে উঠেছিল। পরক্ষণে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি হেসে ফেলেছিলেন।

'না, কোনোদিন আমি পারলাম না খচ্চরটাকে শেষ করতে।'

দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে বললাম, 'কিন্তু এই বেটা যেমন এক মিনিটে পাঁচটা মাছি গিলতে পারে, আপনার সেই পাখিওয়ালা নিশ্চয় এত অল্প সময়ে এত পাখি ধরতে পারে না।'

'একটা দুটো ধরতেই ও-বেটার সারাদিন কেটে যায়।' কিশোরী উত্তর করেছিলেন, তারপর একটু থেমে থেকে পরে বলেছিলেন, 'কিন্তু তবু দুটোর মধ্যে আশ্চর্য মিল, চেহারায় চরিত্রে। দুটোকেই আমি সমান ঘেন্না করি।'

'আমি দেখিনি লোকটাকে।'

'খুব সহজেই দেখতে পারেন, আপনিও তো মর্নিং-ওয়াক করেন। পার্কের দিকে না গিয়ে একদিন লেকের ওদিকটায় চলে যান।'

তাই গিয়েছিলাম। কিশোরীমোহন আমার নিকট প্রতিবেশী। একটা বড় ফার্মের ম্যানেজার। এখানে জায়গা কিনে বাড়ি করেছেন। গাড়ি কিনেছেন। একটু প্রেসারে ডায়াবেটিজে ভুগছেন বলে সকালে-বিকালে পায়ে হেঁটে বেড়ান।

তাঁর কথামতন লেকের ধারের একটা পড়ো মাঠে পাখিওয়ালাকে আমি সেদিন দেখলাম। একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছের একেবারে মাথার দিকের ডালে খাঁচাটা

বসিয়ে দিয়ে বেশ কিছুটা দূরে একটা আতাগাছের তলায় ঘাসের উপর চুপ করে সে বসে আছে।

কিশোরীবাবুর ঘরে টিকটিকিটার সঙ্গে পাখিওয়ালার চেহারার মিলটা কোথায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার চোখে পড়ল। খুবই ছোটখাটো একটি মানুষ, তেমনি রোগা রুক্ষ মেটেমেটে গায়ের রং, উস্কখুস্ক চুল, এবং চোখ দুটো অসম্ভব ফ্যাকাসে, যেন এক ফোঁটা রক্ত নেই।

কিশোরীবাবুর টিকটিকি সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে পোকা-মাকড় মাছি খেয়েও শুকনো জিরজিরে হয়ে আছে। যে পরিমাণ খাচ্ছে এতদিনে বেশ তেলতেলে মোটাসোটা লাবণ্যযুক্ত চেহারা হওয়া উচিত ছিল ওটার।

কিন্তু পাখিওয়ালাকে দেখে আমার মনে হল নিয়মিত দুবেলা খাদ্য জুটছে না লোকটার, হয়তো অনেক দিনই তার উপোসকাপাসে কাটছে।

একটা ভীষণ ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে, পরনে জেলজেলে গামছা।

আমাকে দেখে পাখীওয়ালা যেন একটু বিরক্ত হল। স্বাভাবিক।

মাঠভরা সকালের মনোরম হলদে রোদ। অগুনতি চোরকাঁটার মাথায় ফড়িং এসে উড়ে উড়ে বসছে, মাথার ওপর চৈত্রের নীল আকাশ, ঝিরঝির হাওয়া বইছে, উঁচু তুলো গাছের ডালে পাখীওয়ালার খাঁচা আর এখানে আতার ছায়ায় ফ্যাকাসে চোখ দুটো খাঁচার দিকে ধরে রেখে পাখিওয়ালা পাখির ধ্যান করছে—এই নির্জনে নিঃশব্দ ধ্যানের জগতে আর একটি মানুষের আবির্ভাব তার কাছে যে খুবই অবাঞ্ছনীয়, অপ্রীতিকর বুঝতে আমার কষ্ট হল না।

দুবার বিরক্ত হয়ে আমার দিকে সে চোখ ফেরাল। তারপর আর তাকাল না। খাঁচার দিকে চোখ তুলে চুপ করে বসে রইল।

না, প্রথমটা আমার নজরে পড়েনি।

একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে জিনিসটা বোঝা গেল। আগে যা ভেবেছিলাম, খাঁচাটা কিন্তু মোটেই শূন্য নয়। ভিতরে একটা পাখি। সবুজ পাতার রং। বুঝলাম টিয়া। কিচকিচ করে ডাকছিল।

হুঁ, ডাকছিল। একলা বন্দী হয়ে আছে। নিশ্চয় একটি সঙ্গী কি সঙ্গিনীকে চাইছিল।

দেখলাম আমার অনুমান মিথ্যা নয়। কিচকিচ শব্দ করতে করতে দূরের একটা অশ্বত্থ গাছ থেকে দুটো টিয়া উড়ে এসে শিমুলের ডালে বসল। এই ডাল

থেকে ঐ ডালে গেল। খাঁচার কাছে গেল। খাঁচার ভিতরের পাখিটাকে দেখল। বুঝল এটিও টিয়া, সুতরাং খুবই আপনজন।

উঁহু, অন্য খাঁচার মতন এই খাঁচার দরজা কিন্তু এক পাশে নেই, ওপরের দিকে, কাজেই উড়ে এসে বসা টিয়া দুটো খাঁচার আশে-পাশে কতক্ষণ ঘোরাঘুরি করে দরজাটরজা খুঁজে না পেয়ে একটু হতাশ হল, তারপর যেন বুদ্ধি করে খাঁচাটার মাথার দিকে চলে গেল। হুঁ, এবার তারা রাস্তা দেখতে পেল। এখন ফুরুৎ করে ভিতরে ঢুকে পড়ে আর একটি সঙ্গী কি সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলতে পারার কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু দেখা গেল চট করে দুটির একটিও ভিতরে ঢুকছে না। নিশ্চয় তাদের মনে সন্দেহ ঢুকেছে, সত্যি এটা কি আর একটা পাখির বাসা, না খাঁচাটাচা কিছু? তখনি আবার দুটিতে নিচের দিকে নেমে এল। এই ডাল থেকে সেই ডালে উড়ে গিয়ে বসল।

কিন্তু খাঁচার পাখি তখন নতুন উৎসাহ নিয়ে দুজনকে ডাকছিল। ওরাও অবশ্য ডাকছিল। কিচকিচ কিচকিচ। তুলো গাছের মাথাটা শব্দে শব্দে ভরে উঠল। ভারি মজার তো। আমার চোখের পলক পড়ছিল না।

সেই সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, আর এক জোড়া চোখের পলক পড়ছে না। শিকার ধরার আগে টিকটিকির কুতকুতে পুঁতিচোখ দুটো যেমন স্থির হয়ে থাকে, এখানেও ফ্যাকাসে চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে, এই অবস্থায় টিকটিকিটা যেমন করে, রোগা জিরজিরে মানুষটাও শ্বাস বন্ধ করে থেকে খাঁচাটা দেখছে। খাঁচার মুখের দরজার সঙ্গে একটা লম্বা দড়ি বাঁধা। দড়ির মাথাটা একেবারে এখানে চলে এসেছে। পাখিওয়ালার হাতের কাছে। অ:তা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে সেটা জড়ান।

ওদিকে কী হচ্ছিল?

ভিতরের পাখি ক্রমাগত ডাকছিল, খাঁচার দাঁড়ের ওপর উঠে নাচানাচি করছিল, ওপরের দিকে বার বার গলাটা ঠোঁটটা তুলে ধরছিল, যেন ওদের দুজনকে ইঙ্গিত করছিল ঐ তো দরজা, ঐ তো ভিতরে ঢোকার পথ, এসো চলে এসো, আমার মতন তোমাদের গলার স্বর, চোখ ঠোঁট, নাক, হলুদ পা সবুজ পাখা ভয় কি, চলে এসো—মিলেমিশে থাকা যাবে।

তাই, কিশোরীবাবুর দেওয়ালের টিকটিকিটাকেও দেখেছিলাম, সব সময় শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না, ছুটে যায় না, কখনও কখনও সামনের দিকের কদর্য রোগা লিকলিকে পা দুটো একটু একটু করে নড়তে থাকে, চোরের

মতন সন্তর্পণে একটু একটু করে সে এগোয়, আবার স্থির হয়ে দাঁড়ায়, আবার এক সময় পা দুটো নড়ে ওঠে। আবার সে এগোয়। পাখিওয়ালার কালো কিটকিটে শিরা বেরিয়ে পড়া হাত দুটো তাই করছিল, একবার দড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আবার থেমে যাচ্ছে।

হুঁ, খাঁচার পাখি ক্রমাগত ডাকছিল।

যেন ওদের দুজনের একজন আর লোভ সামলাতে পারল না। ঐ ডাল থেকে নাচতে নাচতে এই ডালে চলে এলো। ওর ডাক শুনে এ ডাকল। তারপর আর দ্বিধা নেই, শঙ্কা নেই। খাঁচার ওপরে উঠে গিয়ে বনের পাখি দরজার দিকে গলাটা বাড়িয়ে দিল, ঠোঁটটা ভিতরে নিয়ে গেল, একটা পা, পাখিওয়ালার শ্বাস পড়ছে না, ফ্যাকাসে চোখের পাতা নড়ছে না—দড়ির ওপর হাত রেখেছে, তার দুর্বল হাতটা কাঁপছে, আর একটু, আর একটা পা ভিতরে ঢোকালেই হয়ে গেল, এখান থেকে পাখিওয়ালা দড়ির বাঁধন ঢিলে করে দেবে। টুক করে খাঁচার মুখটি বন্ধ হয়ে যাবে।

একটা সাংঘাতিক মুহূর্ত!

যেন কি হবে, কি হবে না বলা যাচ্ছে না।

একটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে শিমুলগাছের মাথাটা দেখছিলাম।

নাঃ, বনের পাখি খাঁচার ভিতর থেকে গলাটা সরিয়ে আনল, পাটা তুলে আনল। সে বুঝে গেছে, এটা আদৌ পাখির বাসা নয়, মানুষের তৈরী খাঁচা। ভিতরে একটা পোষা টিয়াকে বসিয়ে রেখেছে, বনের আরও দুটো একটা টিয়াকে ভেতরে টেনে আনার চমৎকার ফাঁদ।

পাখিওয়ালার পাখি ধরার কৌশলটির মনে মনে আমি তারিফ না করে পারিনি।

কিন্তু কোথায়, টিয়া দুটো কিচকিচ শব্দ করতে করতে শিমুল গাছ ছেড়ে আবার দূরের সেই অশ্বত্থ গাছটার দিকে উড়ে গেল।

'শালা!' পাখিওয়ালা দড়ি থেকে হাত দুটো সরিয়ে আনল। একটা বড় শ্বাস ফেলল। ঘাসের ওপর একদলা থুথু ফেলল।

'পারলে না ধরতে।' আমি আস্তে বললাম।

সহজে কি ধরা দেয়—চালাক হয়ে গেছে।' মুখটা কালো করে পাখিওয়ালা উত্তর করল। চুপ থেকে দূরের অশ্বত্থ গাছটা দেখল। তারপর আমার দিকে চোখ ফেরাল। 'বেবাক দুনিয়া চালাক হয়ে গেছে—পাখিফাখি আর বাদ যাবে কেন?'

খুব হতাশ হয়েছে পাখিওয়ালা বুঝতে পারলাম।

'কাল ধরা পড়েছিল কি এক আধটা?'

'নাঃ।' পাখিওয়ালা মাথা নাড়ল। 'আজ তিনদিন ধরে এই চলেছে। একটা দুটো উড়ে এসে গাছে বসে ঠিকই, দেখেশুনে আবার সরে যায়।'

উঁহু, তখনি চিন্তা করলাম, কিশোরীমোহনের ঘরের সেই ক্ষুদে শয়তানটির কাছে এই মানুষটা কিছু না। শিশু। যতটা সময় আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি অন্তত কুড়িটা মাছি বা পোকা খেয়ে সে শেষ করত। আর এই হতভাগা তিন-দিনেও একটা পাখি শিকার করতে পারছে না।

তবে কিনা চেহারার দিক থেকে চরিত্রের দিক থেকে, কিশোরীবাবু যেমন বলেছিলেন দুটিরই যে কিছুটা মিল আছে, পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারছিলাম না। খাঁচার দড়িটা ধরে রাখার সময় ফ্যাকাসে চোখ দুটোর মধ্যে একটা দুষ্টামি একটা কপটতা ওত পেতে ছিল না?

'দরকার কি তবে এভাবে সারাদিন গাছতলায় বসে থেকে।' গলা পরিষ্কার করে বললাম, 'তাছাড়া জিনিসটা খুব ভালও না, পাখিটাখি ধরা, আমার তো মনে হয় অন্য কোনো কাজটাজ করলে ভাল হত।'

পাখিওয়ালা চুপ করে শুনল।

নিজের কানেই কথাটা কেমন বেখাপ্পা শোনাল। যেন মানুষটাকে আমি নীতি উপদেশ দিচ্ছি। পাখি ধরাই যদি তার পেশা হয় অন্য কাজ সে করবে কেন, পারবেই বা কেন!

'হু, কথাটা বাবু বলেছেন ঠিকই, ও একটা জীব, জীবকে খাঁচায় আটকে রাখা ঠিক না।' আমার দিকে চোখ তুলে পাখিওয়ালা মাথা ঝাঁকাল। তারপর বড় একটা নিশ্বাস ফেলল। 'তবে কিনা আমার এই ব্যবসা ছিল না।'

'কি করতে আগে?' কৌতুহল হল।

'কারখানার কাজ ছিল, কারখানা বন্ধ হয়ে বেকার হলাম।'

'আর কোনো কাজ জুটল না?'

'নাঃ।' ঘাসের ওপর আর একদলা থুথু ছিটিয়ে পাখিওয়ালা কানের পিছন থেকে একটা পোড়া বিড়ি টেনে আনল। 'বাবুর কাছে আগুন আছে?'

'না ভাই, আমি বিড়ি সিগারেট খাই না।'

'হুঁ, কারখানার কাজ গিয়ে বেকার হয়ে তখন আর করি কি, বিনা পুঁজির ব্যবসা, গাছের মাথায় একটা খাঁচা বসিয়ে রেখে পাখি ধরতে লেগে গেলাম।' লোকটা হাসল।

'কিন্তু পাখিরা তো তোমার খাঁচায় ঢুকছে না।' আমি পাল্টা হাসলাম।

'ঐ যে বললাম বাবু,—পাখিওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল। 'দুনিয়ার সব বেটা চালাক বনে গেছে, ওরা কি আর বাদ থাকবে—পয়লা পয়লা শিকার ভালই জুটছিল। আজ ক'টা দিন একটা পাখি ধরা পড়ছে না।'

'তবে কি অন্য কোথাও গিয়ে খাঁচা বসাবে?'

'নাঃ, এ আর পোষায় না, এই ব্যবসা একেবারে ছাড়তে হবে।'

'তাই ভাল।' খুশি হয়ে ঘাড় নেড়ে বললাম, 'অন্য একটা কাজটাজ যদি জুটিয়ে নিতে পার—তাছাড়া পাখি ধরাটা—' কথাটা আর শেষ করলাম না, আস্তে আস্তে মাঠ ছেড়ে রাস্তায় উঠে এলাম। তখন কিশোরীবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি সবে বেড়াতে বেরিয়েছেন। বেলা করে প্রাতভ্রমণ তাঁর পোষায়। নিজের গাড়ি আছে। অফিসে লেট হবার ভয় নেই। আমাকে ট্রামে বাসে ঝুলে ঝুলে অফিস করতে যেতে হয়।

ক'দিন আর কিশোরীবাবুর বৈঠকখানায় যাওয়া হয়নি। যেন সেই মাঠে পাখি-ওয়ালাকেও আর দেখতাম না।

এক রবিবার সকালে কিশোরীমোহনের বসবার ঘরে ঢুকতেই তিনি হৈ-হৈ করে উঠলেন। সমাদর করে বসালেন। 'কি ব্যাপার! দেখতেই পাচ্ছি না?'

'কাজেকর্মে আসতে পারিনি। তারপর, আপনি কেমন আছেন বলুন?'

'ভাল।' কিশোরীবাবু আমার দিকে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন। 'সিগারেট খান।'

সিগারেট ধরিয়ে এদিক-ওদিক দেখছিলাম। আরও দুটো নতুন সোফা কেনা হয়েছে। টেবিলের ফুলদানিতে এতবড় একটা গন্ধরাজের তোড়া। পয়সাওয়ালা মানুষ, ভাবলাম, তাঁকেই এসব শোভা পায়। ফুল এবং সোফা দেখা শেষ করে ঘরের মেঝেটা দেখলাম, তারপর দেওয়ালের দিকে চোখ রাখলাম।

কিশোরীবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসছিলেন।

'আপনি কিছু খুঁজছেন নিশ্চয়ই?'

'হুঁ', কিশোরীবাবুর চোখের দিকে তাকালাম। 'আপনার ঘরের সেই ক্ষুদে শয়তানটাকে কিন্তু আজ দেখছি না।'

কিশোরীবাবু এবারে হো-হো করে হেসে উঠলেন। 'আমি বুঝতে পেরেছি, আপনার তাকান দেখেই ধরে ফেলেছি আপনি কাকে খুজছেন।'

'কোথায় গেল ওটা?'

'শেষ হয়েছে, আপনা থেকেই শেষ হল।' কিশোরীবাবু সোফার পিঠে হেলান দিয়ে আরাম করে বসলেন। 'পেপার-ওয়েট ছুড়ে কষ্ট করে আমাকে আর মারতে হল না।'

আমি তাঁর চোখদুটো দেখছিলাম। কিশোরীবাবু বললেন, 'কাল শনিবার বুঝেছেন, অফিস থেকে ফিরে ঘরে ঢুকতেই পায়ের নিচে ক্যাঁক করে একটা শব্দ শুনলাম। কি ব্যাপার? তাকিয়ে দেখি আমার জুতোর চাপে বেটা চেপটা হয়ে গেল।'

'খুব মন দিয়ে মাছি খাচ্ছিল আর কি।' আমি হাসলাম। 'কাল আর অন্য কোনদিকেই ওর চোখকান ছিল না।'

'তার মানে পাপী এভাবেই একদিন শেষ হয়, পাপের বেতন মৃত্যু, আপনি জানেন তো।' কিশোরীমোহন গম্ভীর হয়ে বললেন। আমি শব্দ না করে ঘাড় কাত করলাম।

'ভাল কথা মনে পড়ল।' কিশোরীবাবু একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সেদিন তো আপনি পাখিওয়ালাকে দেখলেন, তার পরে কি আর লোকটাকে দেখেছিলেন?'

'না।' একটু থেমে থেকে বললাম, আর কিন্তু তাকে আমি ওই মাঠে দেখিনি আমার মনে হয় পাখিধরা সে ছেড়ে দিয়েছে।'

'হুঁ, মনে হয় ছেড়েই দিয়েছিল, অন্য ব্যবসা ধরেছিল—আপনি শুনে অবাক হবেন, ওই শয়তানও এভাবেই শেষ হয়েছে।'

'কি রকম?' চোখদুটো রীতিমত ছোট করে ফেললাম।

কিশোরীমোহন পিঠ টান করে সোজা হয়ে বসলেন।

'এটা গেছে শনিবার দিন, ওটা গেল মঙ্গলবার বিকেলে। শুনুন মজা, অফিস সেরে গ্রে স্ট্রীটে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আমি গাড়ি নিয়ে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট ধরে বাড়ি ফিরছি, হু', প্রায় মানিকতলা পোলের কাছে এসে গেছি, হঠাৎ একটা হৈ-হৈ শব্দ কানে এল, ঠিক বুঝতে পারলাম না, এমন হল্লা চিৎকার অবশ্য কলকাতা শহরে লেগেই আছে, ফাঁকা রাস্তা পেয়ে বেশ একটু স্পীড নিয়েই আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম। চিৎকারটার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম একটা লোক, যেন পাশের কোন গলির ভিতর থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে পড়বি তো পড় একেবারে আমার গাড়ির সামনে, সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক করেছিলাম কিন্তু ততক্ষণে—'

'চাপা পড়ল লোকটা?'

কিশোরীবাবু মাথা ঝাঁকালেন।

'প্রায় দশগজ দূরে গিয়ে গাড়িটা দাঁড়াল, দরজা খুলে নেমে এসে দেখলাম, সেই বেটা পাখিওয়ালা।'

'এভাবে ছুটছিল কেন?'

'ঐ যে, গলির ভেতর কাদের বাড়িতে চুরি করতে গিয়েছিল, টের পেয়ে পেছন থেকে পাড়ার মানুষ তাড়া করল, ধরা পড়ার ভয়ে উল্লুকটা ছুটছিল, যদি রাস্তা ক্রশ করার চেষ্টা না করে রাস্তার কিনারা ধরে বেটা ছুটত তো আর যাই হোক, গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মরত না।' কিশোরীবাবু সামান্য হাসলেন।

'তা তো বটেই।' একটু থেমে থেকে বললাম, 'সঙ্গে সঙ্গে খুব ভিড় জমে গেল নিশ্চয়ই?'

'তা আর বলতে, কলকাতার রাস্তা, একটা লোককে চাপা দিয়েছি, আমার কেবল ভয় এবার আমায় ধরে সব ঠেঙাবে, গাড়িটাও নষ্ট করবে, কিন্তু সবাই তখন বলাবলি করছিল, বেটা চোর, চুরি করে পালাচ্ছিল, আমার কোনো দোষ নেই, আমি তো সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকও কষেছিলাম, না এই ভদ্রলোকের কোনো দোষ নেই, রাস্কেলটা যদি ধরা পড়ার ভয়ে চোখ বুজে ছুটতে গিয়ে একটা চলন্ত গাড়ির নিচে চলে যায় তো এর জন্য কেউ দায়ী নয়—'

'তারপর?'

'আমি অবশ্য তখনি বেটাকে আমার গাড়িতে তুলে নিয়ে হাসপাতালে ছুটলাম। কিন্তু বাঁচল না।'

'পাখি ধরা ছেড়ে দিয়ে পেটের দায়ে লোকটা চুরি করতে শুরু করেছিল।' বিড়বিড় করে বললাম।

কোনোরকম মন্তব্য না করে কিশোরীবাবু একটা সিগারেট ধরালেন।

'খুব গরম পড়েছে।' কিশোরীমোহন আবার সোফায় হেলান দিয়ে বসলেন। আমি জানালার বাইরের আকাশটা দেখলাম।

'চৈত্র মাস, বৃষ্টি নেই।'

'বাজারে যান-টান?'

আবহাওয়া থেকে কিশোরীবাবু বাজারে চলে গেলেন।

'যাই বই কি, যেতে হয়।' আস্তে বললাম, 'মাছ আনাজ—সবই যে অগ্নিমূল্য।'

'তা আর বলতে, দাঁড়ান আপনাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি, আমি নিজে বড়

একটা বাজারে যাই না, আজ ইচ্ছে হল, রবিবার, চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে একটু ঘুরে এলাম।—হরিহর।' কিশোরীমোহন তাঁর চাকরকে ডাকলেন।

হরিহর পিছনের দরজায় উঁকি দিতে কিশোরীবাবু বললেন, 'বাবুকে মাছটা এনে দেখা।'

আমি ভাবলাম একটা আস্ত কাতল-রুই এনে তাঁর চাকর আমার সামনে হাজির করবে। হরিহর দু হাতে একটা প্রকাণ্ড গামলা ধরে নিয়ে এল। দেখলাম গামলা ভরতি কালো চকচকে মোটা মোটা মাগুর মাছ। এক একটা মাছ এক হাতেরও বেশি লম্বা।

'বাঃ, বেশ বড় মাগুর পেয়েছেন তো! সব কটাই খুব পুষ্ট—এত বড় মাগুর আমাদের এ-বাজারে আসে না।'

আমার কথা শুনে কিশোরীবাবু হাসলেন।

'ঐ যে অগ্নিমূল্য বললেন, বারো টাকা কেজি নিয়েছে বেটা, একটা আধুলি ছাড়ল না।'

'তা হলেও বেশ মাছ হয়েছে।' যেন কিশোরীবাবুকে খুশি করতে বললাম, 'একসঙ্গে অনেক মাছ নিয়ে এসেছেন দেখছি।'

'হু, এবেলা চারটে খাব ওবেলা চারটে।' কিশোরীমোহনের চোখদুটো বড় হয়ে উঠল। 'অন্য কিছুই তো খেতে পারি না, প্রেসার, ডায়বেটিস দুটোই আছে, জ্যান্ত মাগুরের ঝোল আর চাট্টি ভাত, একবেলা ভাত একবেলা রুটি, গুনে দেখলাম ত্রিশটা মাছ রয়েছে, বাড়িতে বলে দিয়েছি, এই মাছের ভাগ আর কেউ পাবে না—আমার একলার তিন চারদিন বেশ চলে যাবে, কি বলেন?'

'তা চলবে।' মাথাটা ঈষৎ নাড়লাম। মানুষটার চোখ দুটো দেখতে আমার ভয় করছিল।

ডলি মলি, বসন্তকাল ও টি মজুমদার

আপনারা তাকে দেখেন নি? নিশ্চয় দেখেছেন। কলকাতার রাস্তায়-ঘাটে হরদম যাঁরা চলাফেরা করেন ট্রামে-বাসে ঘোরাঘুরি করেন তাঁদের কথাই বলছি, যারা ঘরকুনো তাঁদের কথা এখানে ওঠেনা, তাঁরা এই শহরের অনেক কিছুই দেখেন না, দেখতে চানও না। কিন্তু আপনারা যাঁরা কাজে কর্মে সর্বদা বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন, কোনো না কোনো সময়, এই রাস্তায় সেই রাস্তায় কি এই ট্রামে সেই বাসে টি মজুমদারকে দেখে থাকবেন। দেখতে হবেই। কেউ কেউ হয়তো মিঃ মজুমদার বলে তাকে চেনেন জানেন। বা মজুমদারবাবু। কাউকে কাউকে মজুমদারমশাই ডাকতেও শোনা যায়। মানুষটা যে অসাধারণ কিছু তা নয়। বরং উল্টো। খুবই সাধারণ। আর পাঁচটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মতন মাঝারি মাপের চেহারা। পোশাক-আশাকও সাদাসিধে। শার্ট ট্রাউজারস বেল্টের জুতো, শীতকালে গায়ে একটা কোট এবং আরও বেশী ঠাণ্ডা পড়লে গলায় মাফলার, তার অতিরিক্ত কিছু না। তবে যেটা তার নিত্য সঙ্গী, শীতে গ্রীষ্মে রোদে বর্ষায় সারাক্ষণ হাতে ঝুলছে, একটা অ্যাটাচি কেস। কালো রং চারধারে সোওয়া-ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি চওড়া সাদা বর্ডার। অনেকের হাতেই এই জিনিস দেখতে পাবেন। কিন্তু অ্যাটাচি এখানে বড় কথা নয়, আসল হল মানুষটা, টি মজুমদার—এই শহরে আপনারা চলাফেরা করেন অথচ মজুমদারকে দেখেন নি—হতেই পারে না, তা হলে বলতে হয় ময়দানের মনুমেণ্ট, বিড়লা প্ল্যানেট্যারিয়ামের বেঁটে গম্বুজ, হাওড়ার পোল, শেয়ালদার মোড়ের গাড়িঘোড়া ও মানুষের অকথ্য ভিড়, এ জি অফিসের লাল বাড়ি, টালার ট্যাঙ্ক হ্যারিসন রোডের মহেন্দ্র কি লক্ষ্মীকান্তর ছাতার দোকান ইত্যাদি কিছুই আপনাদের চোখে পড়ে না। চোখ থেকেও আপনারা অন্ধ।

তা কি হয়! সাদা বর্ডার দেওয়া কালো রঙের অ্যাটাচিটা হাতে ঝুলিয়ে টি মজুমদার মুহু মুহু আপনাদের সামনে পড়ে যাচ্ছে। এই দেখলেন বাস থেকে নামছে, এই দেখলেন তক্ষণি ছুটে একটা ট্রাম ধরছে, ট্রামটা যদি ধরতে না পারল সঙ্গে সঙ্গে একটা রিকশা ডেকে তাতেই চেপে বসল। হয়তো তখন মুষলধারে

বৃষ্টি, হয়তো ট্রামে চেপে কাছাকাছি কোথাও যাবার কথা, ভিড়ের দরুণ উঠতে না পেরে, বলা যায় না মজুমদার হয়তো হেঁটেই যেখানে যাবার সোজা চলে যেত, বৃষ্টির জন্য তা আর সম্ভব হল না বলে রিকশা, হয়তো দেখছেন বাদলার জন্য ক'দিন ধরেই তার কাঁধে একটা ছাই রঙের বর্ষাতিও ঝুলছে। কিন্তু কুকুর বেড়ালের ফোঁসানি নিয়ে বৃষ্টি শুরু হলে বর্ষাতি করবে কি। ক' ফোঁটা জল আটকাবে!

তা না হলে অনেক দিন অনেক সময় খটখটে রোদ্দুরের দুপুরেও টি মজুমদার অ্যাটাচি হাতে ধর্মতলার ফুটপাথ ধরে হাঁটছে কি হাতিবাগান বাজারের কাছে বাস থেকে নেমে গ্রে স্ট্রীটের দিকে এগোচ্ছে বা হরিশ মুখার্জি রোডের এক সারি নোনা-ধরা পুরোনো বাড়ির স্যাঁতসেঁতে ছায়া ধরে বড় বড় পা ফেলে ওদিককার কোনো মেডিকেল স্টোর্স—ওষুধের দোকানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য আপনারা অনেক দেখেছেন।

এটা বরাবরের দৃশ্য। কুড়ি বছর ধরে এই এক ছবি।

কখনও ধর্মতলায়, কখনও হাতিবাগানের মোড়ে, কখনও হরিশ মুখার্জি রোডে। বা শহরের আর কোনো রাস্তায়। বা বাসে করে আপনারা নারকেলডাঙ্গার দিকে যাচ্ছেন, দেখলেন রাজাবাজারের মোড়ে লাফিয়ে কেউ গাড়িতে উঠল! ভিড়ের জন্য প্রথমটা নজরে পড়ল না, ভিড় কমে গেলে পরিষ্কার দেখতে পেলেন কোণার দিকের একটা সীটে অ্যাটাচিটা কোলের কাছে ধরে রেখে চুপ করে টি মজুমদার বসে।

হুঁ, গম্ভীর। চিরকাল একরকম।

তবে কুড়ি বছর আগের চেহারা এখন থাকবে কেন! সেদিন মুখটা একটু গোলগাল ছিল। ময়লা রং। তা হলেও সেদিন গায়ের চামড়ায় একটা তেজী চকচকে ভাব ছিল। আজ যেটা একেবারে নেই। কেমন ধূসর ধূসর দেখায়। মাথার চুল কমে গেছে তো বটেই, যেন আস্তে আস্তে একটা টাক দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, গাল দুটো বসে গেছে, কপালের দু' পাশে দুটো রগ জেগে উঠেছে।

সেদিন যদি কুড়ি-একুশ বয়স ছিল মজুমদারের, আজ চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হয়েছে খুব।

এবং এই বয়সে যে একজন বাঙ্গালীর এই চেহারাই দাঁড়াবে এটা আপনারা সবাই আশা করতে পারেন। কাঁধের হাড় দুটো উঁচু হয়ে উঠেছে, ঘাড়টা সামনের

দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়েছে। যে জন্য চোখে মুখে একটা ক্লান্তির, অবসন্নতার ছাপ এবং সময় সময় তা বেশ প্রকট হয়ে ওঠে।

তা বলে মানুষটা কি বদলে গেছে! সেই কাঠামো, সেই তাকান, হাঁটা চলা—কুড়ি বছর আগে যেভাবে ছুটে এসে ট্রাম ধরত, হাতল ঝুলে যেভাবে বাস থেকে নামত—সব একরকম আছে।

বা একটা স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করা আজও মিনিটের পর মিনিট হয়তো কখনও আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পার হয়ে যায়, দেখা গেল টি মজুমদার একভাবে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে। যখন অধৈর্য হয়ে উঠছে ধারে কাছের দোকান থেকে সিগারেট কিনে ধরিয়ে নিচ্ছে। কুড়ি বছর আগেও তাই করত না? যদি আপনারা কেউ সেখানে উপস্থিত থাকেন, বলা যায় না, হয়তো দেখবেন আপনার প্রায় গা ঘেঁষেই মানুষটা দাঁড়িয়ে, তখন একটু লক্ষ্য করলেই মজুমদারের বাঁ কপালের কাটা দাগটা আপনার চোখে পড়বে।

আপনার তখন মনে হবে কুড়ি বছর কেন, তারও আট-দশ বছর আগে অর্থাৎ মজুমদারের বয়স যখন ন-দশ তখন থেকেই বুঝি কপালের ঐ দাগটা।

এটা হয়। কিছু কিছু কাটা ও ক্ষতের চিহ্ন আমাদের শরীরে চিরকালের মতন থেকে যায়, কোনোদিনই মেলাতে চায় না, বরং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাগটাও যেন বড় হতে থাকে, বুড়ো হতে থাকে।

হ্যাঁ, বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে মানুষটাকে দেখছেন, সেই পুরোনো ক্ষতচিহ্ন না তার জামা জুতো হাতের এ্যাটাচি দাঁড়াবার ভঙ্গি বিরল হয়ে আসা মাথার চুল, রুক্ষ হয়ে আসা গায়ের চামড়া ও একটানা কুড়ি বছর শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় হেমন্ত ছুটোছুটির দরুণ বিয়াল্লিশে পা দিয়ে একটা শরীরে একটা মনে যে পরিমাণ ক্লান্তি বিষাদ তিক্ততা নৈরাশ্য ও শূন্যতা-বোধ জমতে পারে, তার সব কিছুই একটু একটু করে আপনার চোখে পড়ছে, কিন্তু তারপর?

যেহেতু আপনার বাস এসে গেল, তাড়াহুড়ো করে গাড়িতে উঠে পড়লেন অথবা আপনার আগেই নির্দিষ্ট বাসখানা পেয়ে টি মজুমদার চলে গেল—সঙ্গে সঙ্গে কি আপনি মানুষটাকে ভুলে গেলেন? আপনার মন থেকে মূর্তিটা মুছে গেল?

কতক্ষণ? ক'দিন?

হয়তো আর এক দুপুরে ক্রিক-রো ধরে যাচ্ছেন, আপনি তখন রিকশায়, দেখলেন ওদিকের শ্রীদুর্গা মেডিকেল হল নামে একটা ওষুধের দোকান থেকে টি

মজুমদার বেরিয়ে আসছে। অথবা এক বিকেলে গ্যাস স্ট্রীটের ফুটপাথ ধরে হাঁটছেন, আপনার চোখে পড়ল সেই একই ব্যক্তি। টি মজুমদার। এই মাত্র ইস্টার্ন ড্রাগ হাউস নামে আর একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে পড়ল।

হয়তো ইতিমধ্যে আপনি বুঝে গেছেন কোনো ওষুধ কোম্পানীর চাকরি মানুষটার। ওষুধের স্যাম্পল নিয়ে মজুমদারকে দোকানে দোকানে ঢুঁ মারতে হয়। হাতের ব্যাগটায় নানা ওষুধের ফাইল ক্যাপস্থল, ট্যাবলেট ও কাগজপত্রে ঠাসা। যে জন্য সর্বদা ওটা সঙ্গে।

যাই হোক আর একদিন, ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে তখন ঠিক সন্ধ্যে, ধর্মতলার একটা চায়ের দোকানে বসে আপনি হয়তো চা খাচ্ছেন, আস্তে আস্তে একজন ভিতরে ঢুকল, চোখ তুলে দেখলেন সেই চেহারা, হাত থেকে অ্যাটাচিটা নামিয়ে ভেজা বর্ষাতিটা গুটিয়ে নিয়ে টি মজুমদার উল্টো-দিকের একটা চেয়ারে বসল।

অস্বাভাবিক কিছু না, দোকানে ভিড় থাকা সত্বেও মজুমদারের সঙ্গে আপনার এক সময় চোখাচোখি হয়ে যাবে। তারপর? আপনি কি আগ বাড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলবেন? সেই সদিচ্ছা আপনার হবে? আমার মনে হয় না। আমরা —আমি আপনি যদু মধু রাম শ্যাম সবাই, এ-যুগে যারা জন্মেছি, ভয়ানক স্বার্থ-পর, ভীষন-রকম আত্মকেন্দ্রিক যে! একটা মারাত্মক ব্যাধি বলতে পারেন এবং সংক্রামক বটে। আমরা সকলেই এই রোগে সংক্রামিত। হাজার দিন একটা মানুষকে এখানে-সেখানে দেখছি, কিন্তু যেহেতু সাক্ষাৎ পরিচয় নেই সেই কারণে গায়ে পড়ে তার সঙ্গে কথা বলি না, কি জানি যদি আমাদের আত্মসম্মান ক্ষয়ে যায়।

অথচ সেদিন মাণিকতলার মোড়ে আপনাদের দুজনের প্রায় মুখোমুখি দেখা। আর একদিন, ধরুন না গড়িয়াহাটের বাস স্ট্যাণ্ডে অন্তত কুড়ি মিনিট মানুষটির পাশে দাঁড়িয়ে আপনিও বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ঠিক তার পরদিনই আবার গ্যাস স্ট্রীটে দেখা।

এখন এই চায়ের দোকানে। আপনার সামনে মানুষটা বসে। কিন্তু চোখা-চোখি হল কি অমনি আপনি মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন। অথবা যেন দেখেও দেখছেন না। বা এমন চোখে তাকাচ্ছেন যেমন রাস্তার ট্রাম বাস দমকল অ্যাম্বুলেন্স ট্রাফিক পুলিস ভিকিরি কি হিপি দেখলে নিস্পৃহ নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে আমরা এক-আধবার তাকাই, তারপর অন্যদিকে চোখটা ঘুরিয়ে নেই।

সত্যি কি মানুষটা রাস্তার ট্রাম বাস দমকল হিপি ভিকিরির পর্যায়ে পড়ে?

যেহেতু সারাদিন একটা অ্যাটাচি হাতে ঝুলিয়ে এই রাস্তায় সেই রাস্তায়, এই ট্রামে সেই বাসে ঘোরাঘুরি করছে? পোশাক-আশাকের চটক নেই? নিতান্তই আটপৌরে সাদাসিধে চেহারা?

তা হলে ভিড়টা কমতে দিন। নির্জনতার মধ্যে মজুমদারকে দেখুন। জানি, সঙ্গে সঙ্গে আপনারা মাথা নাড়বেন। কলকাতা শহরে কখনও ভিড় কমে না, না সকালে না দুপুরে না রাত্রে। আর এ তো চায়ের দোকান। তা-ও আবার ধর্মতলার মতন জায়গা। কথায় বলে মানুষের মাথা মানুষে খায়।

অস্বীকার করব না। সেদিন এমন খটখটে রোদের দুপুরেও ক্রিকরো'র মতন নিরিবিলি রাস্তাটা চোখের নিমেষে লোকারণ্য হয়ে ওঠে! ওদিকের কোন্ বস্তিতে আগুন লেগেছিল। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে ওই তল্লাটের অবস্থাটা কী দাঁড়ায় আপনি স্বচক্ষে যদি দেখতেন। দশটা দমকল ছুটে এসেছিল। পাড়ার মানুষ তো বটেই, যেন বেপাড়া থেকেও দশ হাজারের বেশি লোক হুড়মুড় করে গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। সেই সঙ্গে হাজারগণ্ডা চোর-ছ্যাঁচড়, গুণ্ডা বদমাশ। আর তাদের শায়েস্তা করতে চোখে চোখে রাখতে পুলিস, পুলিসের পেছনে এক দঙ্গল এন সি সি।

একটা খোলার ঘরে একটুখানি আগুন। তা হলে হবে কি, এই শহরের যা দস্তুর, অদরকারেও এমন হৈ-চৈ বেধে যায়, আবার দেখবেন দরকারের সময় কেউ কোথাও নেই, আগুন লেগে বা বসন্ত-টসন্ত লেগে চুপিচুপি গোটা পাড়াটাই সাফ হয়ে গেল। মাছিটাও টের পেলে না।

না, সেদিনের ক্রিক রোর সেই জঘন্য ভিড় ও গোলমাল এমনভাবে আমাদের দুজনের মাঝখানে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল শার্টপ্যান্ট পরা, মাথায় ছোটখাট টাক, সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা ময়লা চেহারার মানুষটি কোথায় যে হারিয়ে গেল! মজুমদারকে আর খুঁজেই পাওয়া গেল না।

বাস-স্ট্যাণ্ডে? সেখানেও যথেষ্ট ভিড় ছিল। অবশ্য আগুন লাগার ভিড় না। আমি আবার সেই গড়িয়াহাট বাস-স্ট্যাণ্ডের কথা বলছি। প্রায় বিশ মিনিটের মতন গা ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য আপনারা দুজন সেদিন অপেক্ষা করলেন। এটা কম কথা হল! খুবই কাছাকাছি এসে ছিলেন একজন আর একজনের। কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হয়েছিল কি? এভাবে একটা মানুষকে দেখা হয় না। সম্ভব না। বলছি এই জন্য, আপনার মন তখন চঞ্চল ছিল। বাসের চিন্তায় সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে আপনি নার্ভাস হয়ে পড়ছিলেন।

মনে রাখবেন এই অস্থিরতা, এই ত্রাসও আমাদের শহুরে মানুষের আর এক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি। বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে একবার যদি টি মজুমদারকে দেখতে আপনি ঘাড় ঘুরিয়েছেন পর মুহূর্তে বাসের দুর্ভাবনায় অন্তত দশবার আপনাকে রাস্তার দিকে তাকাতে হয়েছে। আরও বেশি। ঐ অবস্থায় কি করে একটা মানুষকে ভাল করে দেখা যায় বা বোঝা যায় বলুন!

এই জন্য আমরা শহুরের মানুষ পরস্পরের খুব কাছে এসেও অপরিচিত থেকে যাই। বাস-স্ট্যাণ্ডে কেন, বাসের ভিতর একজন আপনার কাঁধের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে দিব্যি দাঁড়িয়ে থাকে না! সেখানে দুজনের মধ্যে, কি বলব, সমুদ্রবৎ ব্যবধান কখনও ঘোচে কি? কারো সঙ্গে কারো মৌখিক পরিচয়টাও হয় না। আমরা হতে দেই না। বরং উলটো ঝগড়া করে বাস থেকে নেমে পড়ি।

কাজেই টি মজুমদারকে দেখতে হলে জানতে হলে আপনাকে ভিড়ের বাইরে যেতে হয়। শহরের রাস্তায় হবে না। শহর থেকে দূরে, অন্তত কিছুটা দূরে, মনে করুন জায়গাটার নাম বাঁশদ্রোণী, কাজে বা অকাজে—যে কারণে হোক আপনি হঠাৎ একদিন সেখানে গিয়ে হাজির। এভাবে কোন না কোন সময় শহর পেরিয়ে আমরা কি কলকাতার প্রায় কাছাকাছি কোনো নির্জন জায়গায় যাই না! বামনগাছি হতে পারে। বেড়াচাঁপা হতে দোষ কি। হয়তো কাঁচা মাটির রাস্তা ধরে আপনি হাঁটছেন। একটা মানুষ চোখে পড়ছে না। রাস্তার দুধারে বাঁশ ও বাসকের ঘন জঙ্গল। দুপুরবেলা ঝিঁঝি ডাকে ঘুঘু ডাকে। শেয়ালের ডাকও আপনার কানে আসতে পারে। আর টের পাবেন গাছের কচিপাতা ও বুনো লতার অপূর্ব গন্ধ। আপনি কবি হলে দারুণ উত্তেজনা পাবেন, শিহরণ জাগবে মনে।

সে সব আলাদা ব্যাপার যদিও।

আসল কথায় আসা যাক। মনে করুন খানিকটা এগোবার পর একটা নালা ডিঙোতে গিয়ে আপনাকে একটা বাঁশের সাঁকো পার হতে হচ্ছে। অতি সাবধানে পা ফেলে একটু একটু করে এগোচ্ছেন, সাঁকোটা নড়ছে, বাঁশের মচমচ শব্দ হচ্ছে, কিন্তু সাঁকোর মাঝামাঝি পৌঁছে আপনাকে থমকে দাঁড়াতে হল। বিপরীত দিক থেকে একজন আসছে, যে জন্য সাঁকোটা বেশি নড়ছে দুলছে শব্দ করছে। মানুষটাকে দেখে আপনি অতিমাত্রায় বিস্মিত হলেন। গায়ে আধময়লা টেরিলিনের শার্ট, পরনে ছাইরঙের ট্রাউজার্স, হাতে অ্যাটাচি।

কিন্তু আমি যদি বলি আপনার বিস্মিত হবার কারণ নেই? আপনার কাছে

জায়গাটা দূর—অনেক দূর, কালেভদ্রে হয়তো এখানে আসেন, অথবা আজ এই প্রথম এলেন। টি মজুমদারকে হপ্তায় দুদিন তিন দিন আসতে হয়। এখানেও ওষুধের দোকান আছে। সাঁকো পার হয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেই ডালপালা ছড়ান প্রকাণ্ড ছাতিম গাছ বা তেঁতুল গাছের নিচে টিনে ছাওয়া একটা ঘর দেখা যাবে—দরজার মাথায় বেশ বড় সাইনবোর্ড ঝুলছে। হয়তো তাতে লেখা রয়েছে মহামায়া ড্রাগ-হাউস, শিবগৌরী ফার্মেসী বা কালিকা মেডিকেল স্টোর্স। অবিশ্বাস করার কিছু নেই। পাড়াগাঁর মানুষেরও অসুখ করে, তাদেরও ওষুধ কিনে খেতে হয়। যে জন্য কোম্পানির ওষুধের স্যাম্পল নিয়ে দুদিন পর পর মজুমদারকে এখানে ছুটে আসতে হয়।

সাঁকোর একটা খুঁটি ঘেঁসে আপনি চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সরু পথ পাশাপাশি হয়ে দুজনের চলার উপায় নেই, কাজেই আর একটা মানুষকে চলে যেতে দেবার জন্য আপনি পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন। কিন্তু দেখা গেল টি মজুমদার ঠিক আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। আপনি অস্বস্তিবোধ করবেন জানা কথা। আমিও করতাম, যে মানুষটাকে এতকাল শহরের ভিড়ের রাস্তায় ট্রামে বাসে রিকশায় চায়ের দোকানে দেখতে অভ্যস্ত, অথচ যার সঙ্গে একেবারেই বাক্যালাপ নেই, সেই মানুষ কিনা হঠাৎ এমন নিরালায় একটা পুরোনো বাঁশের সাঁকোর ওপর ঝিঁঝির ডাক শেয়ালের ডাক বুনো লতাপাতার গন্ধের মধ্যে চলে এসে আপনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। সমস্ত পৃথিবীটা আপনার কাছে তখন বেখাপ্পা ঠেকতে পারে, মনে হবে বিশ্বপ্রকৃতির কোথায় যেন তাল কেটে গেল, চরাচরে সব কিছু অস্বাভাবিক অসংলগ্ন লাগছে। কতকটা বোকা হয়ে গিয়ে বোবা হয়ে গিয়ে আপনি ফ্যালফ্যাল করে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

টি মজুমদার কিন্তু সেভাবে তাকাল না, বরং বেশ একটা সপ্রতিভ ভঙ্গি নিয়ে আপনার কাছে দেশলাই চাইল। শব্দ না করে পকেট থেকে দেশলাই তুলে আপনি তার হাতে দিলেন। সিগারেট ধরিয়ে মজুমদার দেশলাইটা ফিরিয়ে দিল।

অথবা দেশলাই চাইল না। 'এখন কটা বাজে' জিজ্ঞেস করল। হাতের ঘড়ি দেখে আপনি সময় বলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মজুমদার কাঁটা ঘুরিয়ে তার ঘড়ি ঠিক করে নিল। বোঝা গেল ঘড়িটা বন্ধ ছিল বা স্লো যাচ্ছিল বা ঘোড়ার গতি নিয়ে আগে ছুটছিল।

যাই হোক, আপনি একবার একটা কথাই শুধু বললেন। সময়। সেটা প্রায় চুপ থাকারই শামিল। অবশ্য সেই মুহূর্তে আপনার চুপ থাকা বা কথা বলা সমান। তখন আপনার চোখ দুটো ভীষণ কাজ করছে। দেশলাই জ্বেলে মজুমদার যখন সিগারেট ধরাচ্ছে কি ঘাড় গুজে ঘড়ির কাঁটা ঠিক করছে তখন আপনার দু চোখ খুঁটিয়ে তার মাথার স্বল্প চুলের ফাঁকে চকচকে টাক কাঁধের চোখা হাড় দুটো এবং একদিকে হেলে থাকা লম্বা নাকটা দেখছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি দেখছে কপালের সেই কাটা দাগটা। চামড়ার সঙ্গে যা কামড় খেয়ে লেগে আছে।

আমি জানি, আমার একদিন এমন হয়েছিল, বাঁ কপালের পুরোনো ক্ষতচিহ্নটা দেখতে দেখতে আমার মতন আপনিও মজুমদারের শৈশবের কথা, বাল্যের কথা ভাবছেন। অর্থাৎ মানুষটা কি চিরকালই এমন শার্ট প্যাণ্ট পরে হাতে অ্যাটাচি ঝুলিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে? খেলাধূলা করত না। বাবা মা ছিল না! কবে কোথায় কপালটা কেটেছিল? খেলার মাঠে! না কি আম জাম পাড়তে গিয়ে? না কি পুকুরে সাঁতার কাটার সময় কাদায় পোঁতা বাঁশের খোঁচাটোচা লেগেছিল! একটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের আট দশ বছরের কচি জীবনের ছবি চিন্তা করতে গিয়ে আপনার বুকের ভিতর তিরতির করে উঠবে। বেদনার ছোট ছোট ঢেউ উঠবে। কেননা, তখন আপনার নিজের শৈশব, পিছনে ফেলে আসা কোমল দিনগুলির কথা মনে পড়তে পারে। পড়বেই। সব শিশু সব কিশোরই এক রকম থাকে যে! আপনি গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছেন বড় চাকরি করেন, আমি মাঝারি চাকরি করি, মাঝে মাঝে ট্যাক্সি চড়ি, মজুমদারের ছোট চাকরি, হেঁটে বা ট্রামে বাসে বা কখনও-সখনও রিকশায় এই ওষুধের দোকান সেরে সেই ওষুধের দোকানে ছুটছে—কিন্তু ছেলে বেলায় সবাই আমরা আছাড় খেয়েছি কপাল কেটেছি পাখির বাসা ভেঙ্গেছি, তারপর সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে মায়ের হাতের চড়চাপড় খেয়েছি।

তাই বলছি, বাঁশদ্রোণী বা বামনগাছির সেই বনের পথে, সাঁকোর ওপর মজুমদারকে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে একটি স্নেহশীল শাসনরত মায়ের মূর্তির সঙ্গে আর একটি মায়ের মুখ আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে। আপনার বুকে ব্যথা জাগবে। এবং অন্তত কিছুক্ষণের জন্য মানুষটার সঙ্গে আপনি একাত্মতা অনুভব করবেন।

সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইটা ফেরত দেবার সময় বা ঘড়ি মেলানোর পর টি-মজুমদার আপনাকে একটা মৌখিক ধন্যবাদ জানাতে পারে, নাও-পারে তাতে যে-

আপনি খুশি বা অখুশি হবেন তা নয়—কারণ এগুলি লঘু জিনিস, নিছক পোশাকী ব্যাপার! আপনি গভীরভাবে মানুষটা সম্পর্কে তখন চিন্তা করছেন। টি মজুমদার চলে গেল। সেদিকে চোখ রেখে, আমি জানি, আপনি বাঁশের খুঁটিটা ধরে কিছু-ক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন। তারপর এক সময় গাঢ় নিশ্বাস ফেলবেন। এটা হয়। কোনো মানুষ সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে গেলে আমাদের বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে।

যেমন একদিন—উঁহু, আপনার মতন শহর ছাড়িয়ে আমি দূরে যাইনি, এই শহরেই আশ্চর্য নির্জনতা পেয়েছিলাম, আকস্মিকভাবে যদিও, এই কলকাতার রাস্তায়। আপনারা লক্ষ্য করেন কিনা জানি না, মাঝে মাঝে এক একটা গলি বা লেন এত বেশি চুপচাপ, এমন ভীষণ জনশূন্য হয়ে পড়ে—দেখলে রীতিমত গা ছমছম করে।

ভরতপুর। ডিকসন লেন। রোদ খাঁ খাঁ করছিল। কিন্তু এত নীরব, এত নির্জন—আপনার মনে হতেপারত মধ্য রাত্রির জ্যোৎস্না নিয়ে বুঝি রাস্তাটা টলটল করছে। তবে তা মনে হত না যেহেতু সেটা চৈত্র মাস, রোদের ঝাঁঝ ছিল সেদিন বেয়াড়া রকম, গা মাথা পুড়ে যাচ্ছিল, কি একটা কাজে আমাকে ওদিক যেতে হয়েছিল, দরদর করে ঘামছিলাম, একটা ডাস্টবিনের এইটুকুন ছায়ায় শুয়ে ছালবাকল ওঠা একটা বেওয়ারিশ কুকুর ধুঁকছিল। এ ছাড়া আর কোনো জনপ্রাণী আমার চোখের সামনে ছিল না। হঠাৎ জুতোর শব্দ কানে আসতে চমকে উঠলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি টি মজুমদার। ভাল রে ভাল, এই মানুষটা এখানে! কেউ যেন সুড়সুড়ি দিয়ে আমায় হাসাতে চাইল, হাসলাম না যদিও, তবে আমার মনের অবস্থা তখন প্রায় তাই দাঁড়িয়েছিল। দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে আর এত লোক থাকতে কিনা এই গলির ভিতর শার্ট প্যাণ্ট পরা, মাথায় টাক, অ্যাটাচি হাতে সেই রুক্ষ ধূসর মূর্তি! হাসি পাচ্ছিল, আবার ভিতরে ভিতরে, কেন বলতে পারব না, যেন একটু বিরক্ত হয়েছিলাম, রাগও পাচ্ছিল—কই, এখানে তো কোনো কালিকা মেডিকেল স্টোর্স কি চণ্ডীমাতা ফার্মেসী কি ইস্টার্ন ড্রাগ হাউস নজরে পড়ছে না! তা হলে?

সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য পাশের একটা বাড়ির দরজার মাথায় টাঙ্গান রং-চটা ছোট সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ল। টি মজুমদার এইমাত্র যেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে। মহামায়া ভোজনালয়—পাইস হোটেল।

কেমন যেন জব্দ হলাম। যেন নিঃশব্দ ডিক্‌সন লেন আমাকে ধমক দিল,

চোখ রাঙাল। মানুষটার কি ক্ষুধাতৃষ্ণা পেতে নেই হে, তাকে খাওয়া-দাওয়া করতে হয় না! সারাদিন কোম্পানির ওষুধ নিয়ে কেবল রাস্তায় ঘুরবে?

হাঁ করে তাকিয়ে দেখলাম টি মজুমদার ততক্ষণে মোড়ের কাছে চলে গেছে। একটা পান সিগারেটের দোকান থেকে সিগারেট কিনছে। লাইট পোস্টের দড়ির আগুনে সিগারেট ধরিয়ে আবার হাঁটছে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা অনুভব করলাম। তাই তো কোনদিন কি এই লোকটাকে চিনতে বা বুঝতে আমি চেষ্টা করেছি! কুড়ি বছর যাকে দেখছি?

যেহেতু এক দুপুরবেলা, তা-ও তখন বেলা দুটো, অসময়, ভাত খাবার পক্ষে খুবই অবেলা, একটা হোটেলে দুটো খেয়ে মজুমদার আবার রাস্তায় বেরোলো, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল মানুষটার কি ঘরবাড়ি বলে কিছু নেই! বউ ছেলে-মেয়ে?

দিনের বেলা কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকে, হয়তো ঘরে যেতে পারল না, বাইরেই মধ্যাহ্নের আহারটা সেরে নিল, কিন্তু রাত্রে? নিশ্চয় একটা আস্তানা আছে! সেখানে তার আপন জনেরা অপেক্ষা করে, জানলায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। থাকে কি? চব্বিশঘণ্টা কেউ কিছু পথে কাটাতে পারে না।

ডিক্‌সন লেনের মহামায়া ভোজনালয়ের সামনে একলা চুপ করে দাঁড়িয়ে আমি একটা ঘরের অন্তরঙ্গ ছবি দেখলাম, দেখতে চেষ্টা করলাম, এই প্রথম অনুভব করলাম কেবল ভিড়ের মানুষ বলে টি মজুমদারকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, রাস্তার ট্রাম বাস ট্রাফিক পুলিস দমকল বা হিপি ভিকিরিদের সমগোত্র ভেবে তার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকলে অবিচার করা হয়, একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে মানুষটার, থাকা উচিত।

অস্বীকার করব, না, তার এই বিয়াল্লিশ বছরের জীবনে টি মজুমদার কতটা স্নেহ মমতা সেবা যত্ন পাচ্ছে, ভালবাসা সুখ, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে জিনিস-গুলির জন্য আমরা সবাই কম বেশি কাঙ্গাল হয়ে পড়ি, দেখতে জানতে আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।

যেমন বাঁশদ্রোনী বা বামনগাছির বাঁশের পোলের ওপর মজুমদারের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কপালের কাটা দাগটা দেখে তার সুকুমার শৈশব, সবটা কৈশোর জানতে আপনি একদিন আকুল হয়ে উঠবেন। যেহেতু জায়গাটা খুব বেশি নির্জন।

অথবা আর একটা বিকেলের কথায় আসুন, চারটে বেজে গেছে তখন, বাড়ির

মাথায় মাথায় হলদে রোদ, গিরীশ পার্ক, এই সময়টায় কেমন চেহারা ধরে জায়গাটার বলুন তো, কলকাতার মানুষ, নিশ্চয় আপনাদের অদেখা নেই, মাছির মতন লোক গিসগিস করে, বায়ুসেবী ভ্রমণবিলাসীর দল থেকে আরম্ভ করে চোর দালাল গাঁজাখোর পলিটিক্যাল দাদারা, তাদের ভক্ত শিষ্যরা, তাস-পাশা নিয়ে বাবুদের বাড়ির বামুন চাকরের দল, তিন তাস নিয়ে জুয়াড়ীর আড্ডা, বাচ্চা-কাচ্চা সঙ্গে গণ্ডায় গণ্ডায় ঝি আয়া—তার ওপর বাদামভাজা আইসক্রীম বুটপালিশ তেল-মালিস, এমন কি হাত দেখে ভূত ভবিষ্যৎ বলে দেয় এমন দু চারটি সাধু সন্যেসীরও দেখা পেয়ে যেতে পারেন, রীতিমত হরিহর ছত্রের মেলা। একটা কোণায় আমি চুপচাপ বসে আছি, হঠাৎ দেখি সেই মানুষ, হাতে অ্যাটাচি টি মজুমদার পার্কে ঢুকল, কিন্তু কেমন যেন খুঁড়িয়ে হাঁটছে, ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না, রেলিং পার হয়ে ভিতরে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, কোথাও জায়গা পাচ্ছে না, বুঝলাম একটু বসতে চায়, জিরোতে চায়, শেষ পর্যন্ত আমার পায়ের কাছে ফাঁকা একটুখানি ঘাস দেখতে পেয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে এসে ধপ করে বসে পড়ল।

আমি নিঃশব্দ। কেবল তাই না, পাছে চোখাচোখি হয়, চট করে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে রাখলাম। একটু পরে, এবং তা-ও খুব ভয়ে ভয়ে, ঘাড়টা সামান্য বেঁকিয়ে চোখ আড় করে দেখি ডান পায়ের জুতো খুলে মজুমদার তুলো দিয়ে ডেটল লাগাচ্ছে, গন্ধে টের পেলাম ডেটল, গোড়ালির দিকে খানিকটা জায়গা ছড়ে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।

'শালা, উজবুকের মতন সাইকেল চালায় অ্যাঁ, আমার গায়ের ওপর সাই-কেলটা তুলে দিলে......।' বিড়বিড় করে মজুমদার নিজের মনে বলছিল, অনেক গোলমালের মধ্যেও কথাটা কানে এল, কেননা কানটা আমি সেদিকে ধরে রেখে-ছিলাম। তারপর দেখলাম ডেটলের শিশি ও কটনের বাণ্ডিলটা অ্যাটাচির মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে মজুমদার পকেট থেকে দেশলাই ও সিগারেট বের করে সিগারেট ধরাচ্ছে। প্রায় মিনিট দুতিন চুপ করে থেকে সিগারেট টানার পর অ্যাটাচিটা তুলে নিয়ে তেমনি খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক সময় পার্ক থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রায় পঞ্চাশটা মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিল। তার মধ্যে আমি একজন। মানে মজুমদারের ধারে কাছে যারা বসে ছিলাম দাঁড়িয়ে ছিলাম তাদের কথা বলছি, তা না হলে সবটা পার্কের মানুষ গুণতে গেলে দু তিনশ'র ওপর দাঁড়াত। যাই হোক, আমরা যারা মজুমদারের এত কাছাকাছি ছিলাম তাদের মধ্যে কেউ কিন্তু একটা কথাও বললাম না। দেখলাম তার পা ছড়ে গেছে, রক্ত বেরোচ্ছে, বেমক্কা

সাইকেল চালিয়ে কেউ তার পা-টাকে জখম করেছে, সব জানার পর দেখার পরেও আমরা কেমন চমৎকার মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে পারলাম।

তবেই দেখুন ভিড়ের মধ্যে একটা মানুষকে আমরা কতখানি অবহেলা করতে পারি, তার সম্পর্কে কী পরিমাণ উদাসীন কঠিন হৃদয় না হয়ে উঠি! কিন্তু একলা কোথাও দেখা হলে—

এই জন্যই বলছি ওয়েলিংটন স্ট্রীটের গল্পটা শুনুন। এই গল্প না শুনলে টি মজুমদার আপনাদের চোখে অস্পষ্ট, অপরিচিত, চিরকাল ভিড়ের মানুষ থেকে যাবে!

গেল শনিবারের ঘটনা। রাত তখন কটা? আটটা সোওয়া আটটা হবে, আর একটু বেশি। কিন্তু কী অবিশ্বাস্য রকম স্তব্ধতা সারাটা রাস্তায় ও লাগোয়া পার্কটায় একটা প্রাণী নেই, চারদিক থমথম করছিল।

আমি জানি আপনারা চমকে উঠবেন, বলবেন, সে কি মশাই, রাত বারোটা সাড়ে বারোটার আগে ওপাড়ার ট্রাম বাসই যে বন্ধ হয় না, ট্রাম বাস বন্ধ হল তো ট্যাক্সি রিকশা ট্রাক লরী হাজার গণ্ডা প্রাইভেট গাড়ির ছুটোছুটি সমানে চলতে থাকে তখনও রাস্তায় কত শত লোক, তাদের পায়ের শব্দ গলার শব্দ হাঁচি কাশি— এদিকে ধর্মতলা ওদিকে বউবাজারের মতন দুটো বড় বড় হই-হল্লার জায়গা রাত দুটোর আগে ওয়েলিংটন ঠাণ্ডা হয়েছে কবে!

না, ঠাণ্ডা হয় না, আমিও স্বীকার করি, রাত দুটো আড়াইটে পর্যন্ত ওপাড়া ভয়ংকরভাবে জেগে থাকে।

কিন্তু আপনারা কি জানেন না এই শহরটাকে মাঝে মাঝে ভূতে ধরে! বলা কওয়া নেই গাড়ি ঘোড়া অদৃশ্য হয়ে যায়, রাস্তায় চরছিল হাজার মানুষ, হঠাৎ সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, দোকানপাট দুদ্দাড় বন্ধ হয়ে গিয়ে বড় বড় তালা ঝুলতে লাগল, পথের দু পাশে বাড়িগুলিকে মনে হয় তখন সাদা সাদা কঙ্কাল, লাইট-পোস্টের মাথার আলোগুলি ভূতের চোখ হয়ে জ্বলতে থাকে, ধারেকাছে গাছটাছ থাকলে মনে হবে গাছের মাথায় ভূতের ফিসফিসানি চলছে, আপনার গায়ে এক ফোঁটা বাতাস লাগছে না, অথচ পাতাগুলি কেমন ফুরফুর করে নড়ছে। রকম-সকম দেখে আপনার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে, আড়ষ্ট হয়ে যাবেন, যেদিকে চোখ ফেরাবেন সব খাঁ খাঁ করছে।

কেন? তার উত্তর আমিও দিতে পারব না, আপনারাও পারবেন কিনা, জানি না। তবে আপনারা দেখেছেন, রাত আটটা তো ভাল, বেলা দশটায়,

কি বিকেল তিনটেয়ও এভাবে কতবার যে শহরটাকে ভূতে ধ' ছ, এখনও মাঝে মাঝে ধরে, এবং আগামী পঞ্চাশ বছরেও কলকাতার এই ভূতে ধরা রোগ সারবে বলে আমার মনে হয় না।

হুঁ যা বলছিলাম, প্রথমে ট্রাম বন্ধ হল তারপর বাস, ধর্মতলা থেকে ফিরছি, দেখতে দেখতে সব ট্যাক্সি উধাও, তারপর রিকশা এবং সেই সঙ্গে যাবতীয় ট্রাক লরী প্রাইভেট—চোখের নিমেষে রাস্তাটা মরুভূমি হয়ে গেল, মানুষ দূরে থাক একটা কুকুর বিড়ালও চোখে পড়ছিল না। একা একা হাঁটছিলাম, নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠছি, আর ঐ যে, পথের দু ধারে বাড়িগুলি—মস্ত মস্ত কঙ্কালের মতন দেখাচ্ছিল, খুঁটির মাথায় মাথায় আলোর ডুমগুলি অবিকল ভূতের চোখ হয়ে জ্বলছে। ওদিকে গাছটাছ বেশি, ওয়েলিংটন পার্ক, যেটাকে এখন আমরা রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার নাম দিয়েছি—শ্মশানের মতন লাগছিল, গাছের পাতায় পাতায় কিসের ফিসফিস চলছে, ফুরফুর করে পাতাগুলি নড়ছে, অথচ আমার গায়ে বাতাসের আঁচড়টি লাগছে না; আরও মজা, ঘাড় ফেরাতে দেখি কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার, দ্বিতীয়া কি তৃতীয়া হবে এত বড় একটা চাঁদ পূব আকাশে ঠেলে উঠে ফিকফিক হাসছে।

আমি কবি নই, তা হলে দিব্যি কবিতা-টবিতা মাথায় আসত, বা যদি চিত্রকর হতাম, নিরিবিলি গাছের সারি, শ্মশানের মতন গা ছমছম-করা রাস্তা পার্ক, দুধারের কঙ্কালের মতন ঘরবাড়ি ও তামার পিণ্ডের মতন চাঁদটাকে দেখে ছবি আঁকার জন্য আঙুল চুলবুল করত।

জলতেষ্টা পেয়েছিল, খিদেও পেয়েছিল মন্দ না, অনেকটা রাস্তা হাঁটার দরুণ এটা হচ্ছিল যদিও, কিন্তু জলই বা পাই কোথায়, খাদ্যই বা তখন আমাকে কে দেয়, কতকটা নিরুপায় হয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা একদম ভুলে থাকলাম, তবে যেটা বেশী অস্বস্তি দিচ্ছিল, আগুনের অভাবে সিগারেট খেতে পারছিলাম না, বুকের ভিতরটা, ফুসফুসটা শুকিয়ে খরখরে হয়ে যাচ্ছে টের পাচ্ছিলাম, পকেটে সিগারেট আছে, দেশলাই নেই—এদিকে দোকানপাট সব বন্ধ।

আর একটা জিনিস, হাত ঘুরিয়ে দেখি ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। অকূল সমুদ্রে পড়লাম—অথবা ঘুরিয়ে বললে বলা যেত, এক অন্তহীন সময়হীনতার সমুদ্রে আমি তখন হাবুডুবু খাচ্ছি, যেন একটু পরেই তলিয়ে যাব, ভয়ে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। অথচ, এটা খুব মনে ছিল, ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে যেতে ধর্মতলার মোড় থেকে যখন হাঁটা শুরু করি তখনও আমার ঘড়ি চলছিল, তখন আটটা বেজে তিন

মিনিট—কিন্তু তারপর ? কতটা রাস্তা হাঁ।টলাম, কতক্ষণ হাঁটছি ? এখন রাত কটা ? দশটা ? এগারোটা ? বারোটা ? সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। ঘড়ি বন্ধ থাকলে দু মিনিটকে দু ঘণ্টা মনে হয় না কি !

হুঁ, ঘড়ি বন্ধ, কঙ্কালের মতন ঘরবাড়ি চতুর্দিকে শ্মশানের নৈঃশব্দ্য, সিগারেট খেতে পারছি না, প্রকাণ্ড একটা ঠাট্টার মতন তামাটে রঙের চাঁদটা ফ্যা-ফ্যা করে হাসছে, এই অবস্থায় প্রস্রাবের বেগ পায়, আমার পেয়েছিল, আপনাদের পেত কিনা জানি না, সামনেই একটা ডাস্টবিন ছিল, সেটাকে আড়াল করে ঝুপ্ করে বসে পড়লাম।

দেখুন কেমন নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম, মানুষজন দূরে থাক যেখানে আর-সোলা টিকটিকিটাও চোখে পড়ছিল না, সেখানে কিনা ভদ্রভাবে জল ছাড়বার জন্য আমি একটা আবরু খুঁজলাম, রাস্তার মাঝখানে ঠ্যাং ফাঁক করে দাঁড়িয়ে গেলে তখন আমাকে আটকাত কে !

যাই হোক, কাজটি শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের একটা বেঞ্চিতে বসে কে একজন বেশ আরাম করে সিগারেট টানছে, যেন হাতে ঘড়িও রয়েছে; গাছতলা, জায়গাটা অন্ধকার মতন, তা হলেও ঘড়ির ডায়ালটা এক একবার বেশ চকচক করে উঠে তখনি আবার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিল, তবে জন্তু জানোয়ারের চোখের মতন সিগারেটের মাথার লাল আগুনটা দারুণ ঝকমক করছিল।

বুঝতে পারেন, ঐ অবস্থায় আমার ধূমপানের পিপাসাটা কেমন নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এক লাফে ডাস্টবিনটা ডিঙিয়ে পার্কে ঢুকে পড়লাম।

'স্যার, দেশলাই আছে ?'

'হুঁ।'

একটা হাত আমার দিকে সরে এল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চমকে উঠলাম। সেই ব্যক্তি না ! কোলের ওপর অ্যাটাচিটা শুইয়ে রাখা, গায়ে শার্ট প্যাণ্ট, আবছা অন্ধকারেও টাকপড়া মাথাটা পরিষ্কার চোখে পড়ল।

পর পর দুটো কাঠি নষ্ট করলাম। আমার হাত কাঁপছিল। তিনবারের বার সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইটা ফিরিয়ে দিলাম।

'কটা বাজে, স্যার, এখন ?' চোখমুখ বুজে প্রশ্ন করলাম।

'আটটা কুড়ি ?'

তক্ষুণি ঘাড় গুঁজে কাঁটা দুটো ঘুরিয়ে সিগারেটের আগুনে হাতের ঘড়ি ঠিক

করে নিলাম। আমার মুখ থেকে একবারও 'ধন্যবাদ' শব্দটা বেরোল না। কি জানি, বাঁশদ্রোনী বা বামনগাছির পোলের ওপর সিগারেট ধরিয়ে কি ঘড়ি মিলিয়ে টি মজুমদার যদি আপনাকে ধন্যবাদ না জানায়! চিন্তা করে দু' দুটো উপকার পাওয়া সত্ত্বেও আমি কোনো রকম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে গম্ভীর মুখে পার্ক থেকে বেরিয়ে আসছিলাম।

'আহা চলে যাচ্ছেন, শুনুন মশাই।'

সাঁকোর ওপর আপনি তাকে ডাকবেন না, আমি জানি। চুপ করে দাঁড়িয়ে কেবল তাকিয়ে থাকবেন। ডিকসন লেনের এত নির্জনতার মধ্যে পেয়েও আমি তাকে ডাকি নি, পাইস হোটেল থেকে ভাত খেয়ে বেরিয়ে যাবার পর পিছন থেকে তাকিয়ে মানুষটাকে শুধু দেখেছি। কাজেই বেশ অবাক হয়ে শুনলাম কেমন দরাজ গলায় আমায় ডাকছে টি মজুমদার যেচে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে? বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম।

'কি বলুন!'

'আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে?'

'তা আমি কি করে বলব, আমি আপনাকে চিনি না।' মাথা নেড়ে অক্লেশে বলে ফেললাম।

'আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পেরেছি মশাই, এখন এখানে দেখেই ঠিক চিনে ফেলেছি।' মজুমদার খিকখিক করে হাসল। 'আসলে নির্জনতা ছাড়া একটা মানুষকে ভাল চেনা যায় না বোঝা যায় না, ভিড়ের মধ্যে চিনতে অসুবিধে হয়, হয় কিনা বলুন?'

'কি চিনেছেন, শুনি?' রুক্ষ গলায় উত্তর করলাম।

'হেঁ হেঁ, একটা কাটা দাগ, একটা ক্ষত চিহ্ন নিয়ে আপনি সর্বদা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করেন।'

ক্ষতচিহ্ন! স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে প্রথমটা কোনো কথা বলতে পারলাম না, পরক্ষণে অবশ্য মারমুখো হয়ে উঠলাম। 'কোথায় আপনি আমার কাটা দাগ দেখতে পাচ্ছেন, মশাই!'

'ঐ আর কি, এখন চৈত্র মাস, বসন্ত কাল, ডলি মিলিরা সেজেগুজে হামেশা রাস্তায় বেরোয়, তাদের পিছুপিছু, চব্বিশ ঘণ্টা চরকির মতন আপনি—'

'তার অর্থ! খুব যে আবোল তাবোল বকছেন—কাকে দেখতে কাকে দেখেছেন, কার ক্ষত কার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন শুনি?' দাঁত খিঁচিয়ে উঠলাম।

'আমি ঠিকই দেখছি, এত কাছে এসেছেন, আপনাকে ঠিক চিনেছি, ডলি মিলি কি লিলির দল যখন এলোমেলো রাস্তায় ঘোরাফেরা করে—'

'খবরদার, তুমি বাজে বকবে না।' এবার আমি সরাসরি 'তুমি'-তে চলে গেলাম। 'ফ্যামিলিম্যান আমি, আমার কাজকর্ম আছে, মেয়েছেলের পেছনে ঘোরার মানুষ আমি নই।'

'হুঁ, হুঁ।' গলাটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে টি মজুমদার দাঁত ছড়িয়ে হাসল, অন্ধকারে তার ময়লা দাঁতের সারি চোখে পড়ল। 'আমিও মশাই ফ্যামিলিম্যান, আমারও ওষুধ কোম্পানির চাকরি, সেসব কথায় যাচ্ছে কে, চাকরি ফ্যামিলি-এর মধ্যে আসে না, হি-হি, ডলি মিলি বা লিলিরা যখন বাহারের পোশাক পরে প্রজাপতি হয়ে ফরফর করে এদিক ওদিক ঘোরে, আপনি তখন—'

'ইতর। ছোটলোক।' লোকটার মাথায় দু ঘা বসিয়ে দিতে পারলে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হত। 'চল্লিশের ওপর আমার বয়স হয়েছে।' অসম্ভব জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম, উত্তেজনায় আমি থরথর করে কাঁপছিলাম। 'সারা দিন কাজকর্ম করে এখন ঘরে ফিরছি, আমার স্ত্রী আমার জন্য অপেক্ষা করছে, আমার ছেলেমেয়েরা—'

'আহা', ছেলেমেয়েরা, আপনার স্ত্রী—মশাই আমারও তাই, কখন ঘরে ফিরব পথ চেয়ে সব বসে আছে, আমারও চল্লিশ ওভার, এখন ফরটি টু, মাথায় টাক দেখছেন তো—তা হলে হবে কি, যত বয়স বাড়ছে অসুখটা বাড়ছে, ক্ষতটা বড় হচ্ছে কাটাটা ছড়িয়ে যাচ্ছে—' হো হো করে হাসছিল মজুমদার, তার হাসির শব্দে কানে তালা লাগল, মনে হল শ্মশানের মতন শূন্য পার্কটা বুঝি হঠাৎ ঝমঝম করে বাজছে, মনে হল গাছপালার ভিতর দিয়ে তার প্রচণ্ড হাসি বড় বড় ঢেউ হয়ে রাস্তার ওপারে ছুটে গিয়ে কঙ্কালের মতন এক একটা বাড়ির গায়ে জোরে আছাড় খেয়ে পড়ছে। 'বুঝেছেন মশাই,' মজুমদারের কথা থামছিল না। 'ধেড়ধেড় করে বয়স বাড়ে, বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের অসুখটাও বাড়ে, কানের কাছে রাতদিন শিঙা ফুঁকে কে যেন কেবল চেঁচিয়ে বলছে, গেল গেল আর একটা বসন্ত গেল, আর একটা চৈত্র কাবার, কিছুই পেলে না তুমি চাঁদ, কেউ কাছে এল না, ডলি, মিলি, জুলি, লিলি, নেলি, চামেলিরা ফুরফুরে প্রজাপতি হয়ে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে—'

'তোমার অসুখ নিয়ে তুমি মর শালা।' বলতে চাইছিলাম, মুখ দিয়ে

হঠাৎ শব্দ বেরোল না, তা হলেও লোকটার মুখে যদি থুথু ছিটোতে পারতাম খুশি হতাম। কিন্তু কোথায় থুথু ছিটোতাম! তার মুখের নাগাল পেতাম কোথায়! ভয়ে চুপসে গেছি। আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, দেখি চোখের পলকে পাঁচ ফুট লম্বা রোগা মানুষটা একটা বটগাছের মতন বিশাল প্রকাণ্ড মূর্তি ধরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে, কপালটা গিয়ে আকাশে ঠেকেছে, হাত দুটো এত লম্বা দেখাচ্ছিল, ধর্মতলার মোড়ের সাজুভেলী চায়ের দোকানের উঁচু ছাদটা অনায়াসে সে ছুঁতে পারে তখন, পা বাড়ালেই সোজা ওয়েলেস্‌লি চলে যায়, কী কাণ্ড। পায়ের জুতো জোড়া আর জুতো মনে হচ্ছিল না, যেন দু পায়ে দুটো লাইফবোট পরে আছে, হাতের অ্যাটাচিটাকে মনে হচ্ছিল গদরেজ মার্কা একটা ঢাউস আলমারি।

এখন এসব বলে আপনাদের বিশ্বাস জন্মানটা খুবই কঠিন জানি, নিজের চোখকেই আমি তখন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমার হৃৎপিণ্ডের নড়াচড়া থেমে গিয়েছিল, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।

হুঁ, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, আবার জিনিসটাকে যে দেখার ভুল, আমার চোখের ভ্রম বলে এককথায় উড়িয়ে দেব সেই শক্তিও কি তখন ছিল! ভাবলাম একটু আগে যেখানে যাবতীয় হই-হল্লা সব কিছু শব্দটব্দ থেমে গিয়ে এত বড় একটা শহর রাত আটটার মধ্যেই দুপুর রাতের স্তব্ধতা নিয়ে খাঁ খাঁ মরুভূমি হয়ে গেল, মহাশ্মশানের চেহারা ধরতে পারল, সেখানে টি মজুমদারের মতন একটা রোগা লোক অতিকায় দৈত্য হয়ে উঠবে, বটগাছের মতন বিশাল আকার ধারণ করবে এ আর অসম্ভব কি! হয়তো এটাই সত্য, জলন্ত সত্য। আমার দৃষ্টিভ্রম না, অ্যাপরিশন না, ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস দিয়ে ছোট জিনিসকে যেমন বড় দেখান হয় তেমনি টি মজুমদারও আমাকে ভাল করে দেখা দেবার জন্য চেনা দেবার জন্য, তার আসল রূপটা আমার চোখের সামনে প্রকট করে তোলার জন্য ইচ্ছে করে নিজে থেকে এমন বড় হয়ে উঠল বিরাট হয়ে উঠল, তার এই মূর্তি আসল মূর্তি।

একটু একটু করে পিছু হঠছিলাম। বলেছি, আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল, গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল, অন্যদিকে যে মুখটা ঘুরিয়ে নেব সেই শক্তি তখন লোপ পেয়েছে, মনে হচ্ছিল চুম্বকের মতন মজুমদার আমার চোখ দুটোকে তার দিকে টেনে ধরেছে। কাজেই পালাবার জন্যে পিছু হঠা ছাড়া আমার তখন উপায় ছিল না। এক সময় রেলিংটার নাগাল পাওয়া গেল। রেলিংটা পিঠে ঠেকল।

তখন আর দেরি করলাম না, ঘুরে দাঁড়িয়ে নেংটি ইদুরের মতন সেটা টপকে রাস্তায় পড়ে দে ছুট।

কিন্তু ছুটতে আরম্ভ করে মনে হল লোকটা আমার পিছু নিয়েছে, ছুটছে, তার জুতোর ভয়ঙ্কর ঢবঢব আওয়াজ কানে আসছিল, সেই সঙ্গে উদ্দাম হো হো হাসি —কেবল তাই নয়, জুতো ও হাসির শব্দ ছাপিয়ে ঢেউ ভাঙা সাদা সাদা ফেনার মতন, অফুরন্ত ফুলের মতন সেই সব নাম : ডলি, মিলি, জুলি, লিলি, পলি, মলি আমার কানের কাছে অনবরত উপছে পড়ছিল।

মিথ্যা বলব না, কান পেতে নামগুলি শুনতে ইচ্ছে করছিল খুব, কিন্তু ঐ যে ভয়—ভীষণ আতঙ্ক নিয়ে আমি ছুটছি, আমার হৃৎপিণ্ড দবদব করছে, কেবলই মনে হচ্ছে যেমন দৈত্যের চেহারা ধরেছে মজুমদার, তার ওপর এমন চটিয়ে দিলাম, লম্বা হাত বাড়িয়ে খপ করে না আমায় মাটি থেকে তুলে নিয়ে বলের মতন আকাশে ছুঁড়ে দেয়।

কিন্তু আপনাদের বলতে বাধা কি, ত্রাস আতঙ্ক ও অস্থিরতার সেই সাংঘাতিক কয়েকটা মুহূর্ত আমার এক হিসেবে মন্দ লাগছিল না, যেন বুড়ো বয়সে একটা রোমান্টিক উন্মাদনা নিয়ে প্রাণপনে ছুটছি, শ্মশান হয়ে কলকাতা খাঁ খাঁ করছে, মাথার ওপর কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদ ঝুলছে, রাজ্যের সুন্দর সুন্দর মেয়ের নাম—নামগুলি যখন সুন্দর মনে হচ্ছিল মেয়েগুলি সুন্দর না হয়ে যায় না—কানের কাছে ক্রমাগত বাজছে, এবং পৃথিবীতে টি মজুমদার ও আমি ছাড়া তৃতীয় প্রাণীটি নেই। অদ্ভুত পরিবেশ।

হুঁ, তৃতীয় প্রাণীটি নেই, যে জন্য ভয় ঘেন্না ও উত্তেজনা নিয়েও ঠিক ঐ সময়টায় মানুষটার সঙ্গে আমি বেশ একটু একাত্মতা অনুভব করছিলাম। যেমন বাঁশদ্রোনীর বাঁশের সাঁকোর ওপর দেখা হলে তার গালের কাটা দাগ দেখে তাঁর শৈশব ভাবতে গিয়ে নিজের শৈশব মনে পড়ে আপনি মজুমদারের সঙ্গে এক ধরনের অন্তরঙ্গতা, আত্মীয়তা অনুভব করবেন। তবে আপনার ভাবনাটার মধ্যে বেদনা থাকবে, দীর্ঘশ্বাস থাকবে, আমারটার মধ্যে ছিল একটা সুখকর ঈর্ষার মিশেল।

আহা, সব সুখেরই শেষ আছে, সব আতঙ্কের অবসান আছে। ছুটতে ছুটতে সামনে একটা উঁচু রক, ভাল কথায় আপনারা রোয়াক বলেন, দেখতে পেয়ে লাফিয়ে সেটার ওপর উঠে দাঁড়ালাম।

আজ মনে হচ্ছে নিয়নের আলোয় ঝলমলে পরিচ্ছন্ন নির্জন রকটা না পেলে

অনন্তকাল আমি ছুটতাম, টি মজুমদার আমার পিছু পিছু ছুটত। খারাপ ছিল কি। ছুটতে ছুটতে দুজন এই কলকাতা ছেড়ে কোথায় কোন পাহাড় সমুদ্রের কাছে চলে যেতাম কে জানে!

যে জন্য, অস্বীকার করব না, ওয়েলিংটন স্ট্রীটের ডক্টর রায়ের বাড়ির চওড়া চৌকোণা সেকেলে রোয়াকের ছবিটা মনে হলে আমার বুকের ভিতরটা উদাস হয়ে যায়, মন বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

কেননা রকে উঠে দাঁড়িয়েছি কি সঙ্গে সঙ্গে সব আবার অন্য রকম, রাস্তাঘাটের চেহারা বেমালুম বদলে গেল। বলেছি আপনাদের, ভুতুড়ে শহর মায়াবী শহর, মোহিনী কলকাতা। বস্তুত ব্যাপারটা যে এত তাড়াতাড়ি ঘটবে জানা ছিল না। দারুণ হকচকিয়ে উঠলাম। আবার বেপরোয়া গাড়ি ঘোড়া ছুটছে, লোকের মাথাগুলোকে খাচ্ছে, যেদিকে চোখ ফেরাও হল্লা চিৎকার ছুটোছুটি মোটরগাড়ির হর্ন রিকশার ঠুনঠুন, ফেরিওয়ালার চেঁচামেচি ফিনিক দিয়ে রক্ত ছোটার মতন সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে চা কফি সিগারেট সাবানের লাল নীল হলুদ বেগুনি বিজ্ঞাপনের ঝলসানি—অর্থাৎ চিরকাল আমরা যা দেখি, কলকাতা শহরের সন্ধ্যা রাতের শ্বাসরোধী মত্ততা। দরজা জানালা খুলে যাচ্ছে, বড় বড় ফটক, ভারি ভারি কলাপসিবল গেট খুলে গিয়ে ঘরবাড়ি দোকানপাট রেস্তরাঁ আবার গমগম করছে।

ভাল। কিন্তু টি মজুমদার?

নতুন করে মানুষটাকে মনে পড়ল। আর তখনই রক থেকে লাফিয়ে রাস্তায় নামলাম। হালুইকরের দোকানের সামনে উড়ে-এসে-বসা কাকের মতন চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাই। কোথায়! চেহারাটা চোখে পড়ছে না তো!

হতাশ হলাম। ভিড়ের মানুষ আবার ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল? অপরিচিত হয়ে গেল? এটা কি একটা কথা হল! যাকে এত কাছে পেলাম, এই মুহূর্তে যাকে এত বড় করে দেখেছি—

আপনাদের বলে বোঝাতে পারব না, মনের মধ্যে কেমন একটা শূন্যতা, হাহাকার নিয়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। ট্রামে বাসে উঠছিলাম না, কি জানি যদি ধারে কাছে কোথাও মানুষটাকে পেয়ে যাই।

বলেছি, গত শনিবারের ঘটনা, হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে হচ্ছিল কি একটু আগের অন্তহীন নির্জনতা, আলো আঁধারে মেশান শূন্য পার্কটার চমৎকার ভয়াবহ

দৃশ্য ও টি মজুমদারের সেই বিশাল মহান মূর্তি—আমি মহানই বলব, চিরকালের মতন হারিয়ে গেল, এই ছবি আর কোনোদিন দেখব না।

তা না হলে কাল বিকেলের কথায় আসুন না—কাল বিষ্যুদবার গেছে না? স্থান গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়, এই ধরুন তিনটে সাড়ে তিনটে বাজে তখন শার্ট ট্রাউজারস-পরা মাথায় টাক হাতে অ্যাটাচি, আমার আপনার দেখা নিত্যিকার সেই মূর্তি ঠিক আবার চোখে পড়ল।

কিন্তু মনে কোনো রেখাপাত করল কি! একটুও না।

বলা ভুল হল, অ্যাটাচিটা হাতে ছিল না, বগলে ধরা ছিল, একটা তেলেভাজা দোকানের সামনে লোকটা দাঁড়িয়ে, হাতে এত বড় ঠোঙা বোঝা গেল তেলেভাজা খাচ্ছে, হয়তো ঠোঙায় মুড়িও ছিল, ঘোরাঘুরি করে খিদে পেতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে জল-খাবারটা সেরে নিচ্ছে অনুমান করতে কষ্ট হল না।

সে যাই হোক, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে টি মজুমদার দাঁত ছাড়িয়ে হাসল। চমকে উঠলাম, আমায় চিনতে পারল? বুকটা ধক্ করে উঠল। না, সঙ্গে সঙ্গে ঢোঁক গিললাম, আমার ভুল ভাঙল, ভিড়ের রাস্তা, কত লোক আসছে যাচ্ছে, লক্ষ্য করলাম যার সঙ্গেই চোখাচোখি হয় মজুমদার দাঁত ছড়িয়ে একবার হেসে নেয়, তারপর আধখানা তেলেভাজা মুখে পুরে বাকি আধখানা অনায়াসে পেভমেণ্টের একদিকে ছুঁড়ে দিয়ে আবার হিহি করে হাসে।

কি ব্যাপার। এত ফুর্তি মনে? কাকে তেলেভাজা খাওয়াচ্ছে! ঘাড়টা একটু ঘুরিয়ে ওদিকে তাকাতে আমার দু' চোখ বড় হয়ে গেল। ডলি মিলি লিলি? অবশ্য তিনটিই যুবতী। সঙ্গে দু' তিন গণ্ডা আণ্ডাবাচ্চা। ইটের উনান। মাটির হাঁড়ি-কুড়ি। নেতা পাতা। আমাদের আ মরি কলকাতা শহরের সোনার অঙ্গে খোস-পাঁচড়ার মতন এই জিনিস কী পরিমাণ ছেয়ে যাচ্ছে আপনারা রোজ দেখছেন। মজুমদারের তাই ভাল লেগে গেল। কিন্তু তেলেভাজার বৃষ্টি হচ্ছে দেখে ফুটপাতের সংসারের তখন দারুণ উত্তেজনা। বাচ্চাগুলির মধ্যে মারামারি কাটাকাটি লেগে গেছে। তা লাগুক। মেয়ে তিনটি অনর্গল খিলখিল হাসছে, মজুমদারের কাণ্ড দেখে হাসছে, মজুমদার চোখ টেপে, তখন তারা রীতিমত হাসির ফোয়ারা হয়ে ওঠে, এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে, দেখে মজুমদার ভীষণ আমোদ পায়। ঘাড় বেঁকিয়ে একটু কুঁজো হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে মজুমদার যখন চোখ টিপছিল সার্কাসের ক্লাউনের মতন দেখাচ্ছিল তাকে এবং আমার মনে হল আমোদটা পথ-চারীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে যার সঙ্গেই চোখাচোখি হচ্ছিল, একবার করে হেসে

নিয়ে ফুর্তি··· মানুষটা আবার ঠোঙা থেকে একটা তেলেভাজা তুলে নিয়ে আধখানা খেয়ে বাকিটা ছুঁড়ে দিচ্ছে।

খুবই অল্প সময়ের আনন্দ, বুঝতে কষ্ট হল না, জলখাবার খেতে খেতে যতটা মজা করা যায় কারণ রাস্তার ওধারে বড়সড় সাইনবোর্ডটা তখন আমার চোখে পড়েছে : লক্ষ্মীনারায়ণ মেডিকেল স্টোর্স। খাবারটা শেষ করেই অ্যাটাচি হাতে টি মজুমদার সেখানে ঢুকবে বা এ-ও হতে পারে ভাবলাম ওখানকার কাজ সেরে তেলেভাজা মুড়ির ঠোঙা হাতে এখানে দাঁড়িয়ে রীতিমত মেজাজ নিয়ে আনন্দ করছে।

আমি আর দাঁড়াইনি, চৈত্র মাস। তবু যদি একটা রাঙা শিমুল কি পলাশ গাছ ধারে কাছে থাকত, এতটা একঘেঁয়ে গতানুগতিক অরুচিকর ঠেকত না লোক-টাকে, ভিড়ের মধ্যেও অন্তত একবার ঘাড় ঘুরিয়ে আপনারা তার দিকে তাকাতেন।

গাছ

একটা গাছ। অনেকদিনের গাছ। গাছটা সুন্দর কি অসুন্দর কেউ প্রশ্ন তোলেনি।

গাছের মনে গাছ দাঁড়িয়ে আছে। এর প্রয়োজন আছে কি নেই তা নিয়েও কেউ মাথা ঘামায় না।

যেমন মানুষ মাথার ওপর-আকাশ দেখে মেঘ দেখে, পায়ের নিচে ধুলো দেখে ঘাস দেখে, তেমনি তারা চোখের সামনে একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে দেখছে। সন্ধ্যায় দেখছে দুপুরে দেখছে সকালে দেখছে। কেবল চোখ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে অনুভূতি দিয়ে দেখা নয়, বোঝা নয়।

বা এমন করে একটা গাছকে বুঝতে হবে কেউ কোনদিন চিন্তাও করে না।

দিনের পর দিন যায়, ঋতুর পর ঋতু কাটে, বছরের পর বছর যায় আসে—গাছের জায়গায় গাছ দাঁড়িয়ে।

বর্ষায় পাতাগুলি বড় হয় পুষ্ট হয়, শরতে পাতাগুলি ভারি হয় মোটা হয়, সবুজ রং অতিরিক্ত সবুজ হয়ে কালোর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়, হেমন্তের মাঝা-মাঝি হঠাৎ সেই সবুজ-কালো গভীর ধূসর হয়ে ওঠে তারপর শীতে হলদে ফ্যাকাসে নিরক্ত প্রসূতির পাণ্ডুর চেহারা ধরে পাতাগুলি ঝরে ঝরে পড়ে। গাছ রিক্ত হয়।

তখনও গাছ গাছই থাকে।

গাছের চেহারা তখন শুধু কাঠের চেহারা হয়।

ছোট কাঠ বড় কাঠ চিলতে কাঠ সরু কাঠ পাতলা চিকন—মানুষের আঙুলের মতো টুকরো টুকরো অজস্র কাঠ কাঠির একটা জবরজং কাঠামো হয়ে গাছ দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু তা বলে কি মানুষ তখন তার ওপর রাগ করে? করে না। কারণ মেঘ-মেদুর আকাশের নিচে অরণ্যের চেহারা ধরে গাছ যখন দাঁড়িয়ে থাকে তখন মানুষ তাকে যে চোখে দেখে শীতের শুকনো আকাশের নিচে সরু মোটা কতকগুলি কাঠ কাঠির বোঝা মাথায় করে দাঁড়িয়ে থাকলেও মানুষ তাকে সেই চোখে দেখে। তাই বলছিলাম ওপর ওপর দেখা। মন দিয়ে দেখা নয় বোঝা নয়। তাহলে ফাল্গুনে লালে সবুজে মেশানো নতুন পাতার সমারোহ দেখে মানুষ নাচত অথবা বৈশাখ পড়তে অজস্র মঞ্জুরী মাথায় নিয়ে গাছটা আশ্চর্য গোলাপী আভায় আকাশ আলো করে তুলেছে দেখে আনন্দে চিৎকার করত। তা কেউ করে না, এ পর্যন্ত করে নি।

দু-তিনটা বাড়ির মাঝখানে এক ফালি পড়ো জমির ওপর একটা গাছ ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে তাদের একটু সুবিধা হয়, এই শুধু তারা জানে। এ-বাড়ির মানুষ জানে ও-বাড়ির মানুষ জানে, আশেপাশের আরো গোটা দু-তিন বাড়ির মানুষগুলিও একটু-আধটু সুবিধা আদায় করতে গাছের কাছে আসে বৈ কি, যেমন সকাল হতে খবর কাগজ হাতে করে দু-চারজন প্রৌঢ় বুড়ো গাছতলায় একত্র হয়ে রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি আলোচনা করে, যেমন দুপুরের দিকে এবাড়ির বুড়ি ও বাড়ির বুড়ি, এবাড়ির বৌ ও বাড়ির মেয়েকে গাছের নিচে সরু গালিচার মতন ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে রান্নার কথা সেলাইয়ের কথা ছেলে হওয়ার কথা ছেলে না হওয়ার কথা বলে সময় কাটায় আর বিকেল পড়তে ছুটে আসে ছেলে-ছোকরার দল। গাছটাকে ঘিরে হৈ-হল্লা ছুটোছুটি, গাছে উঠে ডাল ভাঙা পাতা ছেঁড়া, বা কোনদিন গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দোল খাওয়া।

বা শীতের দুপুরে গাছের ছায়ায় মাথা রেখে শরীরটা রৌদ্রে ছড়িয়ে দিয়ে কারো কারো গল্পের বই পড়া। আবার গ্রীষ্মের রাত্রে ঠিক এই গাছের তলায় শীতল পাটি বিছিয়ে হ্যারিকেন জেলে পাড়ার পাঁচ-সাতজন গোল হয়ে বসে তাস খেলছে এই দৃশ্যও চোখে পড়ে।

যখন মানুষ থাকে না তখন গাছতলায় ছাগলটাকে গরুটাকে মাথা গুঁজে মনের আনন্দে ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে দেখা গেছে।

আর ওপরে নানাজাতের পাখির কিচির-মিচির কলরব, ডানা ঝাপটান, ঠোঁট ঘসার শব্দ।

আর মাঝে মাঝে হাওয়ায় পাতা নড়ে, ডাল দুলে ওঠে।

বা এমনও এক-একটা সময় আসে যখন পাখি থাকে না, বাতাস নেই। গাছ স্থির স্তব্ধ। পড়ো জমিতে নিবিড় ছায়াটুকু ফেলে অনন্তকালের সাক্ষী হয়ে নিঃসঙ্গ গাছ যেন যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বা মনে হয় কোন দার্শনিক। নীরব থেকে অবিচল থেকে জগতটাকে দেখছে। সংসারের উত্থান-পতন লক্ষ্য করছে। পাপের জয় পুণ্যের পরাজয় দেখে বিমূঢ় বিস্মিত হয়ে আছে।

চিন্তাশীল মানুষের মনের অবস্থা যেমন হয়। চিন্তাশীল মানুষ যেমন চুপ করে থাকে। সত্যি গাছটাকে সময় সময় এমন একটি মানুষ বলে কল্পনা করা যায়। তখন তার ধারেকাছে অন্য মানুষ পশু-পাখি হাওয়ার চাপল্য কল্পনা করতে কষ্ট হয়।

হয়তো এমন করে কেউ গাছটাকে দেখছিল গাছটাকে নিয়ে ভাবছিল। এতদিন জানা যায় নি, এতদিন বোঝা যাচ্ছিল না। কে জানে হয়তো গাছটার সেই অন্তর্দৃষ্টি ছিল, গাছ বুঝতে পারছিল পুবদিকের একটা বাড়ির সবুজ জানলায় বসে একজন তাকে গভীরভাবে দেখছে লক্ষ্য করছে। না, আগে হয়তো সে আর দশটি মানুষের মতো সাদা চোখে গাছের পাতা ঝরা দেখত নতুন পাতা গজানো দেখত। এখন আর তার চোখ সাদা নেই। কাজল পরে গভীর কালো হয়েছে। এখন আর হাল্কা বেণী ঝুলিয়ে ফ্রক উড়িয়ে সে ছটফট করছে না যে, বাড়ির সামনের পড়ো জমিতে একটা গাছ আছে কি বাঁশের খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে ওপর ওপর দেখে শেষ করবে! এখন সে শান্ত গম্ভীর, মাথায় দৃঢ়বদ্ধ সংযত কঠিন খোঁপার মতো তার মনও বুঝি সতর্ক সুসংবদ্ধ স্থির ও নিবিড় হয়ে উঠেছে। আর সেই নিবিড় মন সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে সারাক্ষণ সে গাছের দিকে তাকিয়ে আছে। গাছটাকে নিয়ে ভাবছে। যেন ভাবতে ভাবতে একদিন তার দৃষ্টি কেমন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। চোখের কালো পালকগুলি আর নড়ছে না, কালো মনি দুটি পাথরের মতো স্থির কঠিন হয়ে আছে। গাছ বুঝতে পারল একটা ভয়ঙ্কর ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছে, ওই কালো পালক ঘেরা চোখ দুটোর তাকানোর মধ্যে কেবল ভয় না বিদ্বেষও যেন মিশে আছে। গাছ ভয় পেল, দেখল, কেবল দিনের আলোয় না রাত্রির গভীর অন্ধকারেও দুটি চোখ জানালায় জেগে আছে। নিরাকার অস্পষ্ট ছায়া-মূর্তি হয়ে রাত্রির গাঢ় তমসায় লুকিয়ে থেকেও যেন গাছ ওই দৃষ্টি থেকে নিজেকে

রক্ষা করতে পারছে না। আতঙ্কের সঙ্গে পুঞ্জ পুঞ্জ ঘৃণা ছুঁড়ে দিচ্ছে একজন তার দিকে।

তারপর কথাটা জানাজানি হয়ে গেল। বুঝি সবুজ জানালার ওই মানুষটি সকলকে জানিয়ে দিল।

এই গাছ দুষ্ট। এই গাছ শয়তান। একে এখান থেকে সরিয়ে দাও।

পড়ো জমির আশে-পাশের মানুষগুলি সজাগ হয়ে উঠল।

মানুষের মতো শয়তান হয়ে একটা গাছ মানুষের মধ্যে মিশে থাকতে পারে তারা এই প্রথম শুনল, জানল।

তাইতো, সকলে ভাবতে আরম্ভ করল, বুড়োর দল গাছের নিচে বসে পলিটিকস আলোচনা করে, বুড়িরা যুবতীদের সঙ্গে বসে ছেলে হওয়া না হওয়ার গল্প করে, ছেলে-ছোকরার দল গাছের কাছে এসে খেলা করে এখন গাছটা যদি ভাল না হয়. যদি তার মধ্যে দুষ্ট বুদ্ধি লুকিয়ে থাকে তবে তো—

কেটে ফেলতে হবে, পুড়িয়ে দিতে হবে, মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেললে সবচেয়ে ভাল হয়। সাদা ফুলের মালা জড়ানো স্ফীত শক্ত খোঁপা নেড়ে জানালার মানুষটি বলল, তা না হলে এই গাছ কখন কি বিপদ ঘটায় বলা যায় না।

সবাই শুনল সবাই জানল।

শিশুরা খেলা করে। এই গাছের একটা বড় ডাল তাদের মাথায় ভেঙে পড়তে কতক্ষণ। বজ্রপাত হতে পারে এই গাছের মাথায়। আর তার নিচে তখন যে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকবে সঙ্গে সঙ্গে তার অবধারিত মৃত্যু। অর্থাৎ গাছই বজ্রকে ডেকে আনবে। শয়তান কী না পারে! শুনে মানুষগুলির চোখ বড় হয়ে গেল।

কিন্তু সেই সবুজ জানালার মানুষটি চুপ করে থাকল না। গাছ সম্বন্ধে এতকাল যারা উদাসীন ছিল তারা আরো ভয়ংকর কথা শুনল।

কেবল বজ্র কেন, শয়তান মধ্যরাত্রে যে কোন একটি মানুষকে ডেকে নিজের কাছে আনতে পারে।

হুঁ, সকালে উঠে সবাই দেখবে সেই মানুষ ওই গাছের কোন না কোন একটা ডালে ঝুলছে।

গলায় দড়ি দেবার পথে গাছের ডাল যে একটি চমৎকার অবলম্বন কথাটা নতুন করে সকলের মনে পড়ে গেল।

ওই গাছ পুড়িয়ে ফেলতে হবে, কেটে ফেলতে হবে, সম্ভব হলে মূলসুদ্ধ।

হয়তো গাছের জানা ছিল না, পড়ো জমির পশ্চিম দিকের আর একটা বাড়ির

লাল রং-এর জানালায় বসে আর একজন তা ে গভীরভাবে দেখছিল। সেদিকে দৃষ্টি পড়তে গাছ চমকে উ । এবং খুশি হল। লাল রঙের জানালার মানুষ-টির চোখ দুটি বড় সুন্দর। সেই চোখে ভয় আতঙ্ক ঘৃণা বিদ্বেষ কিছুই নেই। আছে স্নেহ প্রেম মমতা সহানুভূতি। দেখে গাছ বিস্মিত হল। কেননা কদিন আগেও মানুষটির দৃষ্টি অশান্ত ছিল চলায় বলায় চাপল্য ছিল। হাফ প্যাণ্ট পরে সময়ে অসময়ে তার কাছে ছুটে এসেছে, ঢিল ছুঁড়েছে ডালপাতা লক্ষ্য করে, পাতার আড়ালে পাখির বাসা খুঁজে বার করে ভেঙে দিয়েছে আর যখন-তখন দোলনা বেঁধে দোল খেয়েছে। আজ সে মার্জিত ভদ্র স্নিগ্ধ সুন্দর। আদ্দির পাঞ্জাবির হাত দুটো কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে দু হাতের তেলোয় চিবুক রেখে জানালার ধারের টেবিলের কাছে বসে গাছের দিকে গাঢ় দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। গাছটাকে নিয়ে ভাবে। ভাবতে ভাবতে টেবিলের ফুলদানি থেকে একটা গোলাপ নাকের কাছে তুলে ঘরে গন্ধ শোঁকে, যেন গাছটাকে যত দেখছে যত ভাবছে তত সে পরিতৃপ্ত হচ্ছে আনন্দিত হচ্ছে। যেন গাছকে নিয়ে ভাবনার সঙ্গে গোলাপের গন্ধের একটা আশ্চর্য মিল রয়েছে। বুঝি গাছ তার কাছে গোলাপের মতো সুন্দর।

গাছ নিশ্চিন্ত হল আশ্বস্ত হল। লাল জানালার মানুষটার মুখে সবাই অন্য কথা শুনল।

এই গাছ ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই গাছের নিচে সকালে বিকালে মানুষগুলি একত্র হয়। একটি মানুষকে আর একটি মানুষের মনের কাছে টেনে আনছে গাছটা। তার অর্থ আমাদের সামাজিক হতে শেখাচ্ছে। গাছটা আছে বলে ছেলেরা খেলাধুলা করতে পারে। মায়ের মতো শিশুদের স্নেহ ও আনন্দ বিতরণ করছে মাঠের ওই বনস্পতি।

সত্যি সে সুন্দর।

তার ছায়া সুন্দর, ডাল সুন্দর। তাই না নিরীহ সুন্দর পাখিগুলি তাকে আশ্রয় করে সারাক্ষণ কূজন গুঞ্জন করছে। প্রজাপতি ছুটে আসছে।

পাড়ার মানুষগুলি নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করল।

পশ্চিমের লাল জানালার সুন্দর মানুষটি সেইখানেই চুপ করে থাকল না।

ইট, লোহা, সিমেণ্টের মধ্যে বাস করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের চোখের সামনে একটি সবুজ গাছ আছে বলে প্রকৃতিকে আমরা মনে রাখতে

পারছি। আমরা যে এখনো পুরোপুরি কৃত্রিম হয়ে যাইনি মিথ্যা হয়ে যাইনি তা ওই গাছের কল্যাণে। এই গাছ থাকবে। এই গাছ আমাদের ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত জীবনে একটা কবিতার মতো।

তবে কি লাল জানালার মানুষটি কবি? গাছ ভাবল। রাত্রে জানালার ধারে টেবিলে বসে মানুষটি কাগজ কলম নিয়ে কি যেন লেখে যখন লেখে না চুপ করে বাইরে গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মন্দ কথা শুনে মানুষ যেমন বিচলিত হয় তেমনি ভাল কথা শুনে তারা নিশ্চিন্ত হয় খুশি হয়।

তাই একজন গাছটাকে মন্দ বলতে মানুষগুলি যেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, আবার আর একজন গাছ তাদের অনেক উপকার করছে শুনে শান্ত হল।

তাই তারা গাছ নিয়ে আর মাথা ঘামাল না।

গাছের মনে গাছ দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু পুবের জানালার মানুষটি চুপ থাকল না। গাছ শুনল, দাঁতে দাঁত ঘসে সে প্রতিজ্ঞা করছে, যদি আর কেউ তাকে সাহায্য না করে তো সে নিজেই কুড়ুল চালিয়ে গাছটাকে শেষ করে দেবে। এই গাছ সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। শয়তানকে চোখের সামনে থেকে যেভাবে হোক দূর করবে।

গাছ শুনে দুঃখ পেল, আবার মনে মনে হাসল। যেন পুবের জানালার মানুষটিকে তার ডেকে বলতে ইচ্ছে হল, তোমার খোঁপায় ফুলের মালা শোভা পায়, তোমার চোখের কাজল, কপালের কুমকুমটি চমৎকার, তোমার হাতের আঙুলগুলি চাঁপার কলির মতো সুন্দর। সুন্দর ও নরম-এই হাতে কুড়ুল ধরতে পারবে কি?

যেন পশ্চিমের জানালার মানুষটির কানেও কথাটা গেল। তার সুন্দর আঙুল-গুলি কঠিন হয়ে উঠল। গাছের বেশ জানা আছে ওই হাত, হাতের আঙুল দরকার হলে ইস্পাতের মতো দৃঢ় দৃপ্ত হতে জানে। আজ ওই হাত দিয়ে—সে কবিতা লিখছে বটে, গোলাপ ফুলকে আদর করছে—একদিন ঐ হাতে ঢিল ছুঁড়ে সে অনেক পাখির বাসা তছনছ করে দিয়েছে, গাছের ডাল ভেঙেছে, পাতা ছিঁড়েছে আর রুদ্রের মতো হাতের দুটো মুঠো কঠিন করে দোলনার দড়ি আঁকড়ে ধরে দানব শিশুর মতো দোল খেয়েছে। তাই বুঝি আজ বজ্রমুষ্টি শূন্যে তুলে সে প্রতিজ্ঞা করল, এই গাছকে যেমন করে হোক রক্ষা করবে। যদি কেউ এই গাছ নষ্ট করতে আসে তাকে ক্ষমা করবে না। জীবন থেকে কবিতাকে নির্বাসন

দেওয়া চলে না। যদি কেউ গাছের গায়ে হাত তুলতে আসে শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সে তাকে প্রতিহত করবে। গাছের গায়ে আঁচড়টি পড়তে দেবে না।

গাছ নতুন করে ভয় পেল! তাকে কেন্দ্র করে পুবে ও পশ্চিমের জানালার দুটি মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধবে না তো!

সেদিন দুপুর গড়িয়ে গেল। দুটো বাচ্চা নিয়ে একটা ছাগল নিচের ছায়ায় ঘুরে ঘুরে ঘাস খেল। বিকেল পড়তে শিশুর দল হুটোপাটি করল। অগুন্তি পাখি কিচিরমিচির করে উঠে তারপর এক সময় চুপ হয়ে গেল। রাত্রি নামল। নির্মেঘ কালো আকাশে অসংখ্য তারা ফুটল। হাওয়া ছিল। গাছের পাতায় সরসর শব্দ হচ্ছিল। রোজ যেমন হয়। পড়ো মাঠের চারপাশের বাড়িগুলিতে নানারকম শব্দ হচ্ছিল, আলো জ্বলছিল। ক্রমে রাত যত বাড়তে লাগল এক একটি বাড়ি চুপ হয়ে যেতে লাগল, আলো নিভল। তারপর চারদিক নিঃসীম অন্ধকারে ছেয়ে গেল। অন্ধকার আর অমেয় স্তব্ধতা। মাথার ওপর কোটি কোটি নক্ষত্র নিয়ে গাছ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় হাওয়াটাও মরে গেল। গাছের একটি পাতাও আর নড়ছিল না।

এমন সময়।

নিরন্ধ্র অন্ধকারে দিনের আলোর মতো গাছ সব কিছু দেখতে পায়। গাছ দেখল পুবদিক থেকে সে আসছে। আঁচলটা শক্ত করে কোমরে বেঁধেছে। মালাটা খোঁপা থেকে খুলে ফেলে দিয়েছে। যেন যুদ্ধ করতে আসছে। এখন আর ফুলের মালা নয়। হাতে ধারালো কুঠার। গাছ শিউরে উঠল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একদিকে মানুষের পায়ের শব্দ হল। গাছ সেদিকে চোখ ফেরাল। এবার গাছ নিশ্চিন্ত হল। সে এসে গেছে। পশ্চিমের জানালার সেই মানুষ এসে গেছে। তার হাতে এখন কলম নেই। হাতকাটা গেঞ্জি। তার চোয়াল শক্ত। দৃষ্টি নির্মম। যেন এখনি সে বজ্রের হুঙ্কার ছাড়বে।

গাছ কান পেতে রইল।

বিষণ্ণ স্তব্ধতা। অনিশ্চিত মুহূর্ত।

গাছের মাথায় একটা পাখির ছানা কিচমিচ শব্দ করে উঠল। যেন কোন দিক থেকে একটা নাম না জানা ফুলের গন্ধ ভেসে এল। আকাশের এক প্রান্তের একটা তারার কাছে ছুটে গেল। একটু হাওয়া উঠল বৈ কি। নরম শাখাগুলি দুলতে লাগল।

—যেন ভিতরে ভিতরে গাছ এমনটা আশা করেছিল। তাই খুব একটা অবাক হল না।

শাড়ি জড়ানো মানুষটির অধরে হাসি ফুটেছে।

পশ্চিমের জানালার মানুষের শক্ত চোয়াল নরম হয়েছে। বজ্র নির্ঘোষ শোনা যাচ্ছে না।

একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে আছে। দুজনের মাঝখানের ব্যবধান এত কম যে গাঢ় অন্ধকারেও তারা পরস্পরের মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। যেন একজন আর একজনের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনছিল।

'হাতে কুড়ুল কেন?'

'গাছটাকে কাটব।'

'লাভ কি?'

'গাছটা শয়তান।'

'গাছটা দেবতা।'

'শয়তানকে যে দেবতা মনে করে সে মূর্খ।'

'দেবতাকে যে শয়তানের মতন দেখে সে পাপী। তার মনে পাপ তার হৃদয়ে হিংসা। তাই সাদাকে কালো দেখে—আলো থাকলেও তার চোখে সব কিছু অন্ধকার।'

'তবে কি পৃথিবীতে অন্ধকার বলতে কিছু নেই? কালো বলতে কিছু নেই?'

'নেই।'

'এ কেমন করে সম্ভব।' হাত থেকে কুড়ুলটা খসে পড়ল ওর। ভাবতে লাগল। গাছ খুশি হল। গাছ দেখল একজন কুড়ুল ফেলে দিতে আর একজন হাতের লাঠি ফেলে দিল। 'এ কেমন করে হয়!' ভাবতে ভাবতে পুবের জানালার মানুষটি মুখ তুলে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে তারার ঝিকমিকি দেখতে লাগল। তারপর এক সময় বিড়বিড় করে বলল, 'সব আলো সব সুন্দর—কিছু কালো নেই কোথাও অন্ধকার নেই এমন কখন হয়!'

'নিজের ভিতরে যখন আলো জাগে।'

'সেই আলো কী?'

'প্রেম'।

মেয়েটির চোখের পাতা কেঁপে উঠল। গাঢ় নিশ্বাস ফেলল। তার গলার স্বর করুণ হয়ে গেল।

'আমার মধ্যে কি প্রেম জাগবে না?'

'অভ্যাস করতে হবে, চর্চা করতে হবে।' ছেলেটি সুন্দর করে হাসল। 'ভালবাসতে শিখতে হবে।'

'তুমি আমায় শিখিয়ে দাও।'

গাছ চোখ বুজল। তার ঘুম পেয়েছে। গাছও ঘুমায়। কত রাত দুশ্চিন্তায় সে ঘুমোতে পারে নি। অথবা যেন ইচ্ছা করে সে আর নিচের দিকে তাকাল না। মানুষ যেমন গাছ সম্পর্কে উদাসীন থাকে, গাছকেও সময় সময় মানুষ সম্পর্কে উদাসীন থাকতে হয়, অভিজ্ঞ গাছকে তা বলে দিতে হল না।

মিষ্টি জ্বালা

রমেন আমার বন্ধু। এই জীবনে বন্ধু অনেক পেয়েছি, কিন্তু রমেনের মতন কাউকে নয়। যেন আমার জন্য প্রাণ দিতে সে প্রস্তুত। এতটা সহানুভূতি এতটা মমতা আমার প্রতি।

বেকার। ইদানিং আমার জামাকাপড়ের যা জীর্ণ দশা হয়েছিল—রমেন সহ্য করতে পারেনি। সেদিন আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের একটা দোকানে ঢুকে এক প্রস্ত নতুন শার্ট প্যান্ট কিনে দিয়ে তবে সে ঠাণ্ডা হয়। পূজোর আগে বৃষ্টিটিষ্টি ভেজার দরুন কদিন খুব কাশিতে ভুগেছিলাম। রমেন আমাকে টেনে নিয়ে যায় তার পরিচিত এক ডাক্তারের চেম্বারে। আমার গলা বুক পরীক্ষা করে ডাক্তার এক হাত লম্বা প্রেসক্রিপশন লিখে দেয়। ডাক্তারের ওখান থেকে বেরিয়ে রমেন আবার আমায় টানতে টানতে একটা ওষুধের দোকানে নিয়ে যেয়ে কুড়ি টাকার ওষুধ কিনে দেয়।

আপত্তি করিনি। আগে আগে করতাম। রমেন ক্ষুব্ধ হত, রেগে যেত, এমন কি আমার সঙ্গে কথাটথা বন্ধ করে দিত। বুঝতাম বন্ধু আঘাত পায়। আমার উপকার করে, আমার দৈন্যদশায় আমাকে সাহায্য করে সে তৃপ্তি পায়। এই তৃপ্তির স্রোতে বাধা পড়তে দেওয়া উচিত নয়। বুঝতে পারার পর আমি আর আপত্তি করতাম না। তার সবরকম সাহায্য ও উপকার মাথা পেতে নিতাম। এখনও নিচ্ছি। তা ছাড়া আপত্তি সঙ্কোচ লজ্জা—এসব আমাকে মানায়ও না। বছরের পর বছর বেকার থেকে দরিদ্র থেকে কারো কোনো

রকম সাহায্য না নিয়ে মাথা উঁচু করে চলব—সেই মনের বল আমার কোথায়। এমন সময় আসে যখন, রাস্তায় বেরিয়ে এক কাপ চা খেতে বা একটা সিগারেট খেতে হলেও আমাকে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে হয়। অধিকাংশ সময় ট্রাম বাসের পয়সা সঙ্গে থাকে না। অন্যের কাছে হাত পাততে হয়। এই অবস্থায় কথায় কথায় অন্যের দেখাটা আমি পাচ্ছি কোথায়। কে আর পয়সা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাকে আদর করে চা খাওয়াবে, চা খাওয়াবার পর হাতে সিগারেট তুলে দেবে বা বরানগর থেকে ধর্মতলা আসব কি বালিগঞ্জ থেকে বরানগর ফিরব, বাসের পয়সা দিয়ে আমাকে সাহায্য করবে?

একমাত্র রমেন। একজনই আছে পৃথিবীতে যার কাছে চাওয়ার আগে আমি সাহায্য পাই, এবং আমিও চোখ বুজে যখন তখন এই একটি লোকের কাছে হাত পাততে পারি। এখানে আমার কোনোরকম লজ্জা সঙ্কোচ দ্বিধা থাকে না।

বাবার হোটেলে দু'বেলা ভাত খাই। বছরে একটা প্যাণ্ট ও একটা জামা জোটে। দু' বছর অন্তর একজোড়া চটি। ব্যস্, ঐ পর্যন্ত। কেবল এই সম্বল করে আজকের দিনে কোনো ছেলে, ছাব্বিশ সাতাশ যার বয়েস হল চলতে পারে? আমার বয়সী রমেন এটা বোঝে বলে সারাক্ষণ আমার দিকে দু' হাত বাড়িয়ে আছে। কারণ সে চাকরি করে।

এবং এ-ও সত্য, ঐ যে তৃপ্তির কথা বললাম, দরকার হলে আমার জামাটা প্যাণ্টটা সে কিনে দিচ্ছে, ডাক্তারের ভিজিট ওষুধের দাম চালিয়ে যাচ্ছে, চা সিগারেটের খরচ জোগাচ্ছে, ডাইং-ক্লিনিং-এর বিল মেটাচ্ছে কি ব্লেডের অভাবে দুদিন আমার শেভ করা হচ্ছে না দেখতে পেলে একসঙ্গে দু' তিনটে ব্লেড কিনে দিচ্ছে—এসবের পিছনে তার মানসিক তৃপ্তি যেমন আছে, একটা অহংকারও যে কাজ করছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, লক্ষ্য করেছি, আমার বা রমেনের পরিচিত কোনো মানুষ ধারেকাছে থাকলে আমার ওপর তার সহানুভূতি দয়াদাক্ষিণ্য বা করুণা—যা-ই আখ্যা দেওয়া যাক, মাত্রাটা যেন বেড়ে যায়। যেমন একদিন তার অফিসে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আমাকে দেখেই সে রীতিমত চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। কি রে, চা খাবি, বোস বোস, পাখার নিচে বোস, মুখটা শুকিয়ে গেছে এই নে সিগারেট, তারপর? বাসের পয়সা ছিল তো, না কি হেঁটেই শ্যামবাজার টু ডালহৌসী মেরে দিলি। রমেনের কথা শুনে তার অফিসের লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে আমাকে দেখছিল। আমি চা খাচ্ছিলাম, রমেনের দেওয়া দামী সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেটও ধরিয়ে-

ছিলাম মনে আছে। দেখে খুশি হয়ে রমেন তার অফিসের লোকদের শুনিয়ে শুনিয়ে তখনি আবার আমাকে বলছিল, তারপর? টাকাকড়ির দরকার আছে আজ?

হয়তো দরকার ছিল, ধার কর্জ করার উদ্দেশ্য নিয়েই অফিসে তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। কিন্তু যেমন চেঁচামেচি করছিল সে ও সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল, হঠাৎ কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ওদিকে চোখেমুখে উৎকট কৌতূহল নিয়ে রমেনের সহকর্মীরা আমাকে দেখছে তখন। এই অবস্থায় আমি চুপ করে আছি দেখে রমেন ভীষণ চটে যায়। ন্যাখ, আমি তোর ফ্রেণ্ড বেস্ট ফ্রেণ্ড— চেঁচিয়ে অফিসশুদ্ধ লোককে শুনিয়ে সে আবার বলল, আমার কাছে ধার চাইতে যদি লজ্জা করে তবে তোর মরে যাওয়াই উচিত। তোর চাকরি-বাকরি নেই, এই অবস্থায় আমার কাছে এসেও এমন মুখ বুজে থাকা মানে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া…

ঠিক আছে। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছিল আমার। রমেনের বক্তৃতা বন্ধ করতে তাড়াতাড়ি টাকাটা টেবিল থেকে তুলে পকেটে পুরলাম। রমেন তখন ঠাণ্ডা হয়।

আর একদিন। মনে আছে চৈত্র মাস। শাস্ত্রে বলে মধুমাস। কলকাতার রাস্তায় অবশ্য মধুটা বোঝা যায় না। বুঝেছিলাম বোটানিক্যাল গার্ডেনে। রমেনের কথায় তার সঙ্গে সেখানে বেড়াতে যাই। আমি কি জানতাম রমেন আর একজনকেও নেমন্তন্ন করেছিল। তাঁর নাম মীনাক্ষী। আমার মতন রমেন ব্যাচেলার। আমি বেকার। কোনো মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার সাহস ও সামর্থ্য আমার ছিল না। তা বলে রমেন চুপ করে ছিল না। কেনই বা থাকবে। তার একাধিক গার্ল-ফ্রেণ্ড জুটছিল। এখনও জুটছে। কিন্তু এক সঙ্গে মীনাক্ষীকে ও আমাকে সেই চৈত্রের দুপুরে বোটানিকস-এর জঙ্গলে ডেকে নিয়ে যাওয়ার কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাইনি। পরে কারণটা বুঝেছি। রমেন মুহুর্মুহু তার গোল্ড-ফ্লেকের প্যাকেট ও সুদৃশ্য লাইটারটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। টিফিন ক্যারিয়ার ভরতি করা প্রচুর খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল সে। মীনাক্ষীও অনেক সন্দেশ টন্দেশ নিয়ে যায়। মীনাক্ষী না, যেন এই জন্যই জিনিসটা আমার চোখে অদ্ভুত ঠেকছিল, রমেন নিজের হাতে কাগজের প্লেটে আমার খাবার বেড়ে দিচ্ছিল। এবং লক্ষ্য করছিলাম, ওদের দুজনের জন্য যত না রাখছিল তার চেয়ে ঢের বেশি সে আমাকে দিয়ে দিচ্ছিল। কেমন ফাঁপড়ে পড়লাম। হাত তুলে

যত বলছি, আর নয়, অত খেতে পারব না, আমি রাক্ষস নই রমেন—রমেন আমার কথা কানে তুলছিল না। হেসে বলছিল, খা খা, মীনাক্ষী ভীম নাগের কড়াপাক এনেছে। কতকাল ভীম নাগের সন্দেশ খাস না বল তো? আমি দু বছরের মধ্যেও একটা সন্দেশ খেতে পারলাম না, অথচ আমি চাকরি করি—আজ মীনাক্ষীর দৌলতে—কি বলো মিনু?

চোখ আড় করে দেখছিলাম আমার দিকে একবার তাকিয়েই রমেনের বান্ধবী তৎক্ষণাৎ মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে। দৃশ্যটা দেখে মাথাটা কেমন ঝিম-ঝিম করে উঠল। মুখের সন্দেশ তেতো ঠেকল। অর্থাৎ মেয়েটির চোখে এমন কিছু ছিল—আমার যেন মনে হল সেই মুহূর্তে সেখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু তার উপায় ছিল না। মুখ কালো করা ঘাড় গুঁজে পাতের সন্দেশ খুঁটি আর লুকিয়ে নিজের জীর্ণ ময়লা জামা প্যাণ্ট ও পায়ের নোংরা জুতোটা দেখি। রমেনের গায়ের দামী ঝকমকে পোশাকের বুঝি সেদিন তুলনা ছিল না। সোনালী সিল্কের শাড়ি ও কচি কলাপাতার রঙের ব্লাউজে মীনাক্ষীকে বসন্তের রানীর মতন দেখাচ্ছিল। সেখানে আমার ঐ দীনদরিদ্র বেশ। দেখে রমেনের বান্ধবী আমাকে অনুকম্পা করত না তো কে করত!

এই, অমন ঘাড় গুঁজে আছিস কেন। খাচ্ছিস না? রমেন চেঁচিয়ে উঠেছিল। যেন সে আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরে গলা চড়িয়ে গম্ভীর হয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করল: ভাখ নবেন্দু আমি তোর ফ্রেণ্ড—বেস্ট ফ্রেণ্ড—তোর গোমড়া চেহারা আমি একদম সহ্য করতে পারি না। তোর মুখ কালো দেখলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। তুই ভাল করে জানিস তোকে চীয়ার আপ করতে আমার চেষ্টার ত্রুটি নেই। আর পাঁচটা বেকারের মতন সারাক্ষণ নৈরাশ্যে ভুগবি, এ আমি কখনো হতে দিতে চাই না, যে জন্য মীনাক্ষীর সঙ্গে বেড়াতে এসে তোকেও আজ এখানে ডেকে আনলাম।

মীনাক্ষী তখন আবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়েছিল কিনা, চোখ তুলে সেদিকে তাকাতে সাহস পাইনি। রমেনের কথা মতন আর একটু সন্দেশ ভেঙে তাড়াতাড়ি মুখে পুরেছিলাম। তা না হলে, জানতাম সে কিছুতেই চুপ করত না।

কালকের আর একটা ঘটনা। কালই আমি রূপাকে প্রথম দেখি। তিন মাস আগের মীনাক্ষীর জায়গায় এখন রূপা। আগেই বলেছি, ঋতুতে ঋতুতে ফুল ফোটার মতন নতুন নতুন বান্ধবী আসছে রমেনের জীবনে। আসুক। কিন্তু আমাকে ওদের সামনে টেনে নিয়ে যাওয়া কেন। মীনাক্ষীর সঙ্গে আমাকে বোটানিক্যাল

গার্ডেনে বেড়াতে নিয়ে গেল। আর কাল রবিবার ছুটির দিন তার রূপার সঙ্গে রমেন আমাকে ধরে নিয়ে গেল লাইটহাউসে ইংরেজী বই দেখাতে। ছবি দেখার সময় অন্ধকারে জিনিসটা তত বুঝতে পারিনি। শো ভাঙবার পর হল থেকে বেরিয়ে তিনজন একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকেছি, তখন। দোকানের নীলাভ ঝকমকে আলোয় লক্ষ্য করলাম রমেনের নতুন বান্ধবী আমাকে দেখে মীনাক্ষী যেমন করত নাক কুঁচকে ঘাড়টা মোটেই ঘুরিয়ে নিচ্ছে না। বরং বেশ মনোযোগ দিয়ে একবারের জায়গায় দু তিনবার করে আমাকে দেখছে। ওর এভাবে তাকানটা রমেনের চোখে পড়বে জানা কথা। তাই বুঝি রমেন মিটিমিটি হাসছিল। তারপর আর সে চুপ থাকতে পারল না।

এটা তোর সেই জামাটা, আমি যেটা কিনে দিয়েছিলাম। তাই না নবেন্দু?

হুঁ। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে তৎক্ষণাৎ উত্তর করলাম।

যা দশা করেছিস না জামার! রমেন আবার বলল, তা জামার দোষ কি। মাসের পর মাস একটা শার্ট একটা প্যান্ট গায়ে থাকলে এই অবস্থা দাঁড়াবে জানা কথা। ঠিক আছে, কালই আবার একটা শার্ট একটা প্যান্ট তোকে কিনে দেব।

তা দিও। ঠোঁট থেকে চায়ের কাপটা সরিয়ে রূপা বলল, তা হলেও এই আধাময়লা ছেঁড়া পোশাকে তোমার বন্ধুকে একটুও খারাপ দেখাচ্ছে না। মুখটা ভারি মিষ্টি তো।

চমকে উঠলাম। বুকের মধ্যে ঢিপ করে উঠল। ঘাড় তুলে দেখি চা খাওয়া ভুলে গিয়ে লম্বা পালকের বড় বড় চোখ মেলে রমেনের বান্ধবী সেই একভাবে কেবল আমার দিকে তাকাচ্ছে। কিন্তু অবাক লাগল, রমেন যেন জিনিসটা মোটেই গ্রাহ্য করছে না। আমরা দুটি পুরুষ টেবিলের এধারে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে। রূপা বসেছে আমাদের মুখোমুখি হয়ে। রমেনকে ফেলে রূপা সারাক্ষণ আমাকে দেখবে, এ কেমন কথা। আমার ভয় ভয় করছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে, আমার ভয়টাকে প্রায় ঝড়ের মতন উড়িয়ে দিতে রমেন হোহো করে হাসল।

রূপা তোকে ঠাট্টা করছে নবেন্দু। ময়লা ছেঁড়া পোশাকেও তোকে নায়ক নায়ক দেখাচ্ছে।

রূপা কথা বলল না। আমি নীরব থেকে ঘাড় গুঁজে চা খাই।

তা বলে রমেন চুপ থাকল না। আমার দিকে চোখ ঘুরিয়ে বলল, মুখটাও তো একেবারে জঙ্গল করে রেখেছিস। সেই যে তিনটে ব্লেড কিনে দিয়েছিলাম— শেষ হয়ে গেছি বুঝি?

হুঁ, ঘাড় গুঁজে উত্তর করি।

আমার কিন্তু খারাপ লাগছে না। রূপার রূপালী গলার স্বর আমার কানে এল। রমেনকে ও বোঝাচ্ছিল, পুরুষের গাল চিবুক সাধারণ ডিমের মতন পালিশ চকচকে হয়ে আছে দেখতে মোটেই ভাল লাগে না। খোঁচা খোঁচা দাঁড়িতে নবেন্দুকে সুন্দর লাগছে।

হো হো। রূপার কথা শুনে রমেন ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠল। চোখটা কাত করে আমি রমেনের মুখটা দেখলাম। এত জোর হাসছিল সে! আমার বুক কাঁপতে লাগল।

বেকার মানুষ পেয়ে নবেন্দুকে এভাবে ঠাট্টা করা তোমার উচিত নয় রূপা। রূপার দিকে চোখ রেখে রমেন বলল, আমি আজই ওকে এক ডজন ব্লেড কিনে দেব।

রূপা চুপ। আমি চুপ। রূপার চোখ দেখে ওর চোখের ভাষা আমি এত বেশি বুঝতে পারছিলাম! রমেনের কাছে এই জিনিস দুর্বোধ্য ছিল। ততক্ষণে আমাদের চা খাওয়া শেষ। রমেন বিল মিটিয়ে দিল। তারপর তিনজন রাস্তায় নামলাম।

এবার কোনদিকে? রমেন বলল।

গড়ের মাঠে—তারপর গঙ্গার ধারে। রূপা প্রস্তাব করল।

আমি না। সঙ্কুচিত হয়ে রূপাকে বললাম, এবার আমি কাটব রূপা।

না, না, সে কি! তুমি না থাকলে আমাদের বেড়ানটা মাটি হবে।

বলে শক্ত করে রূপা আমার হাত চেপে ধরল। আমার কোন আপত্তি ও মানবে না। চৌরঙ্গীর হাজারটা লাল, নীল, বেগুনি আলোর ছটা ওর চোখে মুখে এসে ছিটকে পড়ছিল। পরিষ্কার দেখছিলাম রূপার মুখের রং মুহুর্মুহু বদলে যাচ্ছে। অথচ মূর্খের মতন রমেন তখনও হোহো করে হাসছে। রূপার রংকরা ঝকঝকে কটা নখ আমার হাতের চামড়ায় বসে যাচ্ছে দেখে যেন সে ভীষণ মজা পেল।—শক্ত মেয়ের পাল্লায় পড়েছিস আজ তুই নবেন্দু। চোখ নাচিয়ে রমেন বলছিল, হিপিদের মতন তোর লম্বা চুল দাড়ি ও ময়লা পোশাক দেখে রূপার খুব পছন্দ হয়েছে। হিপিসঙ্গ করতে ইচ্ছে হয়েছে ওর। কিছুতেই তোকে ছাড়বে না।

হুঁ, কিছুতেই ছাড়বে না। মনে মনে বললাম, তারপর করুণ করে রূপার চোখের দিকে তাকালাম। বললাম, আজ নয়, রূপা, আর একদিন, আজ আমার তাড়া আছে।

জোর করে ওর মুঠোর বাঁধন থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বড় বড় পা ফেলে রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম। রমেনের বোকা হাসিটা তখনও কানে বাজছিল। এও কষ্ট লাগছিল বেচারার জন্য। সে জানে না বেকার বাউণ্ডুলে একটি পুরুষের হাতে কখন একটি মেয়ে নখের আঁচড় বসায়, আর তার জলুনি কী মিষ্টি!

বাবু

শীতের রাত। জ্যোৎস্না থিকথিক করছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বসন্ত এসে গেছে।

তার মানে কি। হাওয়া আছে বলে কুয়াশা ধোঁয়াশা জমতে পারে নি। অথচ শহরতলি। বস্তি কলকারখানায় গিজগিজ চারদিক। ফুরফুরে বাতাস না থাকলে জ্যোৎস্নার বারোটাই বাজিয়ে দিত।

হুঁ, হাওয়া নেই। তাই চাঁদের আলোর এই চাকচিক্য। ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট নালা-নর্দমা ছবির মতন লাগছে।

তা বলে কি কাঁচা নর্দমার দুর্গন্ধ নাকে লাগে না। খুব লাগে। এদিক ওদিক খাটাল আছে কয়েক গণ্ডা। গোময় গো-মূত্রের কটকটে গন্ধ টের পাওয়া যায়।

তবু ভাল লাগে।

রাস্তার দুধারে মস্ত-মস্ত দেবদারু গাছ মাথা উঁচু করে সৈন্যসামন্তের মতন দাঁড়িয়ে। শহরতলির রাত বারোটায় নির্জন রাস্তা পাহারা দিচ্ছে। আর কি তোমাদের ভয়ডর করার কোনো কারণ নেই হে আমরা আছি। ঝুপসি পাতায় ঢাকা মাথা নেড়ে দেবদারু গাছেরা চৌকিদারের মতন থেকে থেকে জানান দেয়।

নির্জন তো হবেই। আজ ছুটির দিন। ঈদের ছুটি। কলকারখানার কাজ বন্ধ। তার ওপর সন্ধ্যার পর থেকে কনকনে হাওয়া। বস্তির মানুষ খেয়েদেয়ে কখন কাঁথা কম্বলের তলায়। বাইরে একটা মানুষ চোখে পড়ে না। দু-একটা বেওয়ারিশ কুত্তা এ পাড়া থেকে ওপাড়ায় যাবার সময় রাস্তাটা পার হয় শুধু। ওরাও শব্দটুকু করে না। আর চোখে পড়ে একটি দুটি বেড়াল। যেন কোন গেরস্ত বাড়ির মাছের কাঁটা গিলে এসে এখন ফাঁকায় কাঁচা ঘাসপাতা খেয়ে বমি

করতে বেরিয়েছে। গলায় কাঁটা আটকে খক খক কাশছে না যদিও। গরগর শব্দ করছে।

আর মাঝে মাঝে শেয়াল ছুটছে হাঁস মুরগি চুরি করতে। মোটের ওপর চরাচরের দৃশ্যটা সুন্দর। কালো পিচ ঢালা লম্বা রাস্তা শহরতলির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে ফিতের মতন দূর গাঁ গঞ্জের দিকে চলে গেছে। দুধারে দেবদারু পাতা হাওয়ায় কাঁপছে ঝিলমিল করছে। পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো মাটিতে পড়ে নানা-রকম নকশা কারুকাজ তৈরী করছে। আর কুকুর বেড়াল যখন যেটা রাস্তা পার হয় এইসব ছায়া ও জ্যোৎস্নার ছাপ তাদের গায়ে পড়ে সুন্দর দেখায়। যে জন্য জগৎটা এখন অন্যরকম মনে হতে পারে।

এমনিও অবশ্য জগৎটা অন্যরকম হয়ে গেছে। কেবল রিকশার ঠুনঠুন ও গাছের পাতার সরসর ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

তাই যেন রিকশায় বসা বাবুটি জড়ান খুশির গলায় রিকশাওয়ালার সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা কইছে। বাবুর গায়ের দামী শালের আঁচল কাঁধের ওপর দিয়ে নিশানের মতন পতপত করছে। বাবুর দু হাতের আঙুলে নানা সাইজের নানা রঙের পাথরের আংটি। জ্যোৎস্না লেগে কোনোটা বেগুন ফুলের মতন দেখাচ্ছে। কোনটা টুকটুকে লাল ডালিম দানা হয়ে জ্বলছে। একটা আংটি থেকে জোনাকির আলোর মতন রুপালি সবুজ দ্যুতি ঠিকরে বেরোচ্ছে জ্যোৎস্না লেগে বাবুর পায়ের জুতো চকচক করছে কম কি।

সুটবুট না পরে ধুতি, গরম পাঞ্জাবি ও তার ওপর কাশ্মীরী শাল চাপিয়ে জামাইবাবুটি সেজে কেন বাবু আজ বেরিয়েছে রিকশাওয়ালার মাথায় আসছে না।

তা যাই করুক। বাবু তার রিকশায় চেপেছে এটাই বড় কথা।

আর একটু হলে ফসকে যাচ্ছিল। জগা যেমন হাঁ হাঁ করে দামী সওয়ার পাকড়াও করতে ছুটে এসেছিল। নিদানও কম যাচ্ছিল কি। হাসিমের রিকশার সামনে বাবু এসে পয়লা দাঁড়ায়। দাঁড়ালে হবে কি। গাঁজা টানলে হাসিম রাজা বাদশা বনে যায়। পয়সা-কড়ি রোজগারের দিকে মন থাকে না। রিকশার গদীতে পিঠ ঠেকিয়ে আধশোয়া হয়ে ঠ্যাং-এর ওপর ঠ্যাং তুলে দিয়ে গাড়ির পাটাতনের ওপর আঙুল ঠুকে সে গান গাইছিল। হাসিম যে এই সময় তার গাড়িতে সওয়ার তুলবে না, সবাই জানত। মৌজে আছে। বাবুকে দেখে সে মাথা নাড়তেই পিছনের সারির জগা, তারপর নিদান ছুটে আসে। 'আসেন—বাবু আসেন! নয়া রিকসা।' ওরা খুব ডাকাডাকি করছিল।

কিন্তু বাবুরা নিয়মকানুন মেনে চলে। হাসিমের রিকশা পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে জগা ও নিদানের ডাকাডাকি কানে না তুলে বাবু হাসিমের রিকশার পিছনেই যে রিকশা দাঁড়িয়ে—সরাসরি তাতে চেপে বসে। নিদান ও জগার তখন কী রাগ। মুখে কি আর তা প্রকাশ করছিল। বোঝা গেছে তাদের কাশির শব্দে। নানারকম শব্দ করে দুজনে কাশছিল। গলা খাঁকার দিচ্ছিল।

তা রাগ হবার কথাই দুজনের। হাসিম ইচ্ছে করে সওয়ার ছেড়ে দিলে। তারপর যে খুশি সওয়ার ধরতে পারে। এখানকার রিকশার এই নিয়ম। তা কিনা এমন দামী ঘড়ি আংটি পরা গায়ে শাল চাপান এক বাহারের বাবু।

বাবুও যে তখন হাসিমের মতন মৌজে ছিল। বাবুর টলোমলো অবস্থা দেখে রিকশাওয়ালারা বুঝতে পারে। সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে বাবু ট্যাকসি স্ট্যাণ্ডের দিকেই আগে যায়। দুখানা মোটে ট্যাকসি ছিল আজ স্ট্যাণ্ডে। দুখানার একখানা বাবু ধরতে পারল না। তার আগেই দুই বাবু ট্যাকসি দুটো ধরে ফেলে। এক বাবুর সঙ্গে জেনানা ছিল। আর এক বাবুর সঙ্গে জেনানা ছাড়াও তিন চারটে গুঁড়াগাড়া ছিল।

এই বাবু একলা। ট্যাকসি না পেয়ে শেষটায় রিকশার কাছে আসে। বাড়ি ফিরতে হবে তো। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা তখন। আরও বেশি। ভয়ানক লম্বা রীলের ছবি ছিল। সাড়ে এগারোটায় শো ভাঙে। তার পরেও পনেরো কুড়ি মিনিট পার হয়ে গেছে। তার মানে এখন বারোটা বাজবে।

'তুই বোসপাড়া চিনিস তো?'

'হ্যাঁ বাবু। বোসপাড়া, হালদারপাড়া, কাজীপাড়া—সব আমার চেনা—আমি কি নতুন রিকশা টানছি এই তল্লাটে।'

'মাঝেসাঝে দরকার হলে আমি ট্যাকসিতেই চলি। আমার নিজের গাড়ি আছে। বুইক।' বাবু জড়ান গলায় বলল, অনেকদিন পর আজ রিকশায় চাপছি—হি-হি।' বাবু হাসে।

'গাড়ি কোথায়?' রিকশাওয়ালা খুব একটা অবাক হয় না।

'সারাই করতে গ্যারেজে গেছে। সেদিন অ্যাকসিডেণ্ট করেছিলাম। নিজেই ড্রাইভ করি কিনা। আমার বিশেষ কিছু হয় নি। ডান হাঁটুতে সামান্য চোট লাগল। এখন ঠিক হয়ে গেছে। রাস্তার ধারে একটা গাছের সঙ্গে গাড়িটা ধাক্কা লাগল। ইঞ্জিনটা জখম হয়েছে।'

মাল টেনে গাড়ি চালালে গাছের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগবেই। রিকশাওয়ালা মনে মনে বলল।

'বুঝলি', বাবু আবার বলল, 'চৌদ্দ বছর পর রিকশায় চাপলাম। তোদের রিকশাওয়ালাদের দেখলে আমার খুব দুঃখ হয়, কান্না পায়।'

আহ! রিকশাওয়ালা মনে মনে বলল, মুখে মুখে তোমরা বাবুরা অনেক দুঃখ কর। তারপর এক টাকার জায়গায় পাঁচসিকে ভাড়া চাইলেই বাবুদের চোখ লাল। রিকশাওয়ালাকে ধরে মারতে আস।

'বুঝলি রিকশাওয়ালা—গরীবের দুঃখ আমার একদম সহ্য হয় না—তোদের অবস্থা দেখে আমার বুকের ছাতি ফেটে যায়। আমার প্রাণটা যে তখন কেমন করে না।'

চুপ কর চুপ কর। রিকশাওয়ালার চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হল। তোমার এই শখের কান্না শুনলে হাসি পায়। কত টাকা রোজ মাল খেয়ে ওড়াও চাঁদ। আজ তো তোমার একেবারে বেসামাল অবস্থা। তোমাকে দেখেই নিদান ও জগা টের পেয়েছে। হাসিমের কথা আলাদা। গাঁজা টেনে ব্যোম। আজ তার রুজিরোজগারের দরকার নেই। কিন্তু আমাদের চোখকান সজাগ। তুমি বাবু প্রাণভরে মাল টেনে গাড়ি নিয়ে সিনেমা দেখতে আস। যেদিন গাড়ি থাকে না ট্যাকসি। আমরা রিকশাওয়ালারা তোমাকে দেখি আর হায় আফশোস করি। বলতে হবে আজ আমার জোর বরাত। নিশুতি রাতে তোমায় নিয়ে মোদকপাড়ার খালপোলের কাছে চলে এলাম।

'এটা কি মোদকপাড়া?'

'না না এটা নন্দীপাড়া।' বলে রিকশাওয়ালা চুপ করে রিকসা নিয়ে পোলের ওপর ওঠে। ঠুন ঠুন শব্দ হয়।

হুঁ, নন্দীপাড়া, ঠিক বলেছিস।' আধবোজা চোখে বাবু ঘাড় দোলায়! নন্দীপাড়ায় নতুন ব্রীজ হয়ে কি সুবিধে না হয়েছে। গাড়ি নিয়ে চোঁ করে খাল পার হতে আর কোনো কষ্টই রইল না। কি বলিস!'

'হুঁ, হুঁ,' ঘাড় নেড়ে রিকশাওয়ালা মনে মনে হাসল। মালের দৌলতে মোদকপাড়া আর নন্দীপাড়া বড়বাবুর চোখে এক হয়ে গেছে। নন্দীপাড়ায় কবে খাল ছিল গো বড়বাবু।'

'ঐ যে রিকশাওয়ালা!' বাবু আঙুল তুলে দেখায়। 'হালদারপাড়ার সেনচক্রবর্তীদের ফ্লাওয়ার মিলের চিমনি দেখা যায়।'

'তাই তো!' রিকশাওয়ালা মহানন্দে ঘাড় বেঁকায়। কাজীরঘাটের তাল গাছ দুটো সেনচক্রবর্তীদের ময়দা কলের চিমনি হয়ে গেছে। তা না হলে আর মাতাল।

'আজ আমি একলা। বুঝলি রিকশাওয়ালা।' বাবু বলল, 'অন্যদিন আমার সঙ্গে জেনানা থাকে।'

হুঁ তা থাকে। রিকশাওয়ালা মনে মনে বলল, সুন্দর মুখের একটি জেনানা তোমার সঙ্গে থাকে। আজ তুমি একা বলেই তো আমার সুবিধে হয়েছে। পোলের নিচে নেমে রিকশাওয়ালা এক মিনিট দাঁড়ায়। ঠাণ্ডায় হাত মেরে নিচ্ছে। দু হাত একত্র ঘষে গরম করে নেয়।

'একটা সিগারেট খাবি?'

'না' রিকশাওয়ালা আবার রিকশার হাতল চেপে ধরল। একেবারে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেই—তারপর একটা ধরাব।'

'হুঁ তাই ভাল।' ঠুন ঠুন রিকশা চলে।

'হ্যাঁরে, বাড়ি পৌঁছে কি এই ঠাণ্ডায় তোকে আমি এমনি এমনি ছেড়ে দেব।' বাবু আবার বলে 'আমার চাকর চা করে দেবে ডিমের মামলেট ভেজে দেবে, চা ডিম খেয়ে শরীর চাঙা করে ওখান থেকে ফিরবি।'

'হুঁ তাই খেতে দিও রাজা।' রিকশাওয়ালা ঘাড় নাড়ল।

'এত রাত্তিরে হরিপদ যদি চা করতে ডিম ভাজতে গাঁইগুঁই করে তবে বেটাকে জুতোপেটা করে ছাড়ব না। হুঁ আমি মনিব—আমার কথামতন তোমাকে চলতেই হবে—ঠিক কিনা রিকশাওয়ালা?'

'ঠিক ঠিক।'

'রিকশাওয়ালারা মানুষ গরীবরাও মানুষ। বুঝলি রিকশাওয়ালা? আমার ইচ্ছে করে দুনিয়ার সব গরীবের দুঃখ একদিনে ঘোচাই—সবাইকে খেতে পরতে দেই। মালকড়ি একটু বেশি টানি—তা না হলে আমার ভেতরটা, আমার এই মনটা যে কত ভাল তোকে বোঝাতে পারব না।'

আহ! মাল গিলে কত সুখের আলাপই না বাবুরা করতে পারে। রিকশাওয়ালা চিন্তা করল। তারপর বাড়ি পৌঁছে নায্য ভাড়াটি চাইতে গেলেই চোখ লাল। আড়াই টাকার জায়গায় পাঁচ সিকে পকেট থেকে বার করবে। সোরগোল করতে গেলে বাড়িশুদ্ধ লোক রিকশাওয়ালাকে মারতে আসবে। তোমাদের বাবুদের ঐ হাড্ডিচামড়ার নিচে কোন জিনিস

লুকোনো থাকে—আর কেউ না জানুক—আমরা রিকশাওয়ালারা টের পাই।

'এই যে এই যে!' গদির পিঠ থেকে পিঠ আলগা করে সোজা হয়ে বসল বাবু। এই বেল গাছটার সঙ্গে সেদিন—আমার গাড়ির ঠোক্কর লেগেছিল।' আঙুল দিয়ে বাবু রাস্তার ধারের একটা শিরীষ গাছ দেখায়। রিকশাওয়ালা হেসে বাঁচে না।

আর হাসবে কি। মাতালের চোখে শিরীষ গাছ, বেল গাছ সমান।

'আমরা তাহলে কদমখালির কাছে এসে গেছি রিকশাওয়ালা।' পিঠ এলিয়ে দিয়ে আবার ঢুলুঢুলু চোখ করে বাবু বলল 'ঠিক এই খানটায় সেদিন অ্যাক্সিডেন্ট করলাম—'

কদমখালি পর্যন্ত তোমাকে আজ আর যেতে হচ্ছে না। রিকশাওয়ালা নিজের মনে বলল কাজীরঘাট বাঁয়ে রেখে রিকসা ঘুরিয়ে তোমাকে নিয়ে সোজা কাঁটাপুকুরের রাস্তায় চলে এসেছি।

'দেখলি তো।' বাবু তখনও কদমখালির বেলগাছের কথা ভাবছে! 'গাছটার কিছুই হয়নি। একটু ছালবাকল উঠল না পর্যন্ত। আর শালার আমার গাড়ির ইঞ্জিন বিগড়ে গেল। ড্যাসবোর্ডে বাড়ি খেয়ে আমার হাঁটুতে চোট লাগল। ঐ বেলগাছে নির্ঘাত বেহ্মদৈত্য আছে।'

'হুঁ, হুঁ' এবার রিকশাওয়ালা গলা ছেড়ে হাসল। 'বেহ্মদৈত্য, বেহ্মদৈত্যানি—উনারা দুজনেই আছেন ঐ গাছে।'

'তুই হাসছিস! কিন্তু তখন কি হল। গাড়িটা এমন জোরে ঝাকুনি খেল। উঁহু ইঞ্জিনের দিকে আমার চোখ নেই। হাঁটুর দিকে মন নেই; তখনি ঘাড় ফিরিয়ে পেছনের সীটে বসা মানুষটাকে দেখলাম।'

'জেনানা।' রিকশাওয়ালা আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। ঠাণ্ডা হাত ঘষে ঘষে গরম করে।

'আমার ওয়াইফ—আমার স্ত্রী—বুঝলি, আমার ধর্মপত্নী।' বাবু আকাশের দিকে চোখ তুলে দিল। 'মালকড়ি মেলাই খাই। কিন্তু নিজের ওয়াইফ ছাড়া অন্য মেয়েছেলের দিকে নজর দেই না—কোনোদিন না।'

'তো গাছের সঙ্গে গাড়ির ঠোক্কর লাগল। উনার গায়ে কোন চোটটোট লাগেনি তো, রিকশাওয়ালা সমবেদনা জানায়।' গাড়ি নিয়ে আবার এগোয়। ঠুনঠুন শব্দ হয়।

'সেই তো ভয় ছিল রে।' বাবু বলল, পেটে ন মাসের বাচ্চা—দেখলাম না গিন্নী ঠিকই আছে। তবে ভয় পেয়েছিল দেদার। মুখটা কাগজের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল।'

'তা তো ভয় পাবেনই—এতবড় ঝাঁকুনি। গাড়িটা যে উল্টে যায়নি।'

'তা আমিও চুপ করে থাকিনি। এই শুক্রবারের ঘটনা। পরদিনই ওয়াইফকে নিয়ে ডাঃ রামেশ্বরমের কাছে ছুটে গেলাম। নাম শুনেছিস? ডাঃ রামেশ্বরম। কলকাতার সেরা গাইনি।'

'আচ্ছা।' চলতে চলতে রিকশাওয়ালা ঘাড় ফেরায়। কি বললেন গাইনোবাবু?'

'গাইনোবাবু কি রে! দুগাল ছড়িয়ে বাবু হাসল। তা না হলে আর রিকশা টানিস। বল ডাক্তারবাবু। হুঁ রামেশ্বরম গিন্নির পেট টিপেটুপে দেখল। বাচ্চা ঠিক আছে। সেদিনই গিন্নীকে তার নার্সিংহোমে ভর্তি করে নিলে।'

'যাক গে—মস্তবড় ফাঁড়া কাটল। এমন জোর ঝাঁকুনির পর বাচ্চা ঠিক আছে। যেন রিকশাওয়ালা খুশিতে বাঁচে না। 'আজ বড়বাবুর বাড়ি যেয়ে কেবল চা ডিম না—মেঠাই মণ্ডা খাব।'

'খাবি, খাবি।' রিকশার ঝাঁকুনিতে বাবুর অ্যালকোহলিক ভুঁড়ি নাচতে থাকে। বাবু গুজগুজ করে হাসে। 'আরো সুখবর আছে। আজ সকালে গিন্নীকে দেখতে গিয়েছিলাম। ছেলে হয়েছে। পাক্কা আট পাউণ্ড ওজন। এই বড় বড় চোখ। অবিকল আমার মতন।

হুঁ তোমার মতন। রিক্শাওয়ালা মনে মনে বলল তার মানে তোমার গিন্নী আর একটা মদের পিপের জন্ম দিল। মাতালের বেটা মাতাল হবে জানা কথা।

ঠুন ঠুন শব্দ করে সমানতালে রিকশা ছোটে। বাবুর নেশাতুর চোখের সামনে জ্যোৎস্না কাঁপে। কাঁটামাদারের ঝোপে ঝোপে জোনাকি নাচে।

'বুঝলি রিকশাওয়ালা। আজ আমার এমন ফুর্তি লাগছে। দশ পেগ ঢুকিয়েছি পেটে। ইচ্ছে করছে দুনিয়ার গরীব দুঃখী কাঙাল ঠেলাওয়ালা রিকশাওয়ালাদের এক জায়গায় ডেকে পেটভরে মেঠাই মণ্ডা খাওয়াই আর দু'হাতে তাদের টাকা-পয়সা কাপড় চোপড় বিলাই।'

বিলাবে বিলাবে। সব কিছু বিলিয়ে দেবে বলেই তো কাঁটাপুকুরের শ্মশানের কাছে তোমাকে নিয়ে এলাম। রিকশাওয়ালা নিজের মনে হাসল।

'এই রিকশা!'

'বলুন বলুন।'

'চারদিকে এত ফণিমনসা পাথরকুচির জঙ্গল কেন রে। অ্যাঁ, গাছের মাথায় পেঁচা ডাকছে! কোথায় নিয়ে এলি তুই। এতক্ষণে তো আমাদের বোসপাড়ার ধানক্ষেত পাটক্ষেতের কাছে এসে পড়ার কথা।'

'বোসপাড়ার ধানক্ষেত পাটক্ষেত তোমাকে আর দেখতে হবে না বাবু। এইবেলা রিকসা থেকে নেমে পড়।'

একটা নেড়া মাদার গাছের নিচে গাড়িটা দাঁড়ায়।

'পাগলের মতন বিজবিজ করে কী বকছিস!' বলতে গিয়ে বাবু থমকে যায়। গদির পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে তখনও হেলান দিয়ে বসে। হঠাৎ যেন নেশার চাপটা কমে গেছে বাবু টের পায়। মাথাটা হাল্কা ঠেকে। অপার নিঝ্‌ঝুম নিশুতি চোখের সামনে। কানের কাছে মশা পিন-পিন করে।

রিকশার হাতল দুটো মাটিতে ঠেকিয়ে রিকশাওয়ালা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। থুতু ফেলে। হাতে হাত ঘষে নতুন করে গরম করে।

এতক্ষণে বাবু সবটাই আঁচ করতে পারল। তাই বাবু খুকখুক হাসল। 'আমার নেশা কেটে গেছে। তোকে জোর নেশায় ধরেছে এবার তাই না রিকশাওয়ালা?'

'হুঁ' রিকশাওয়ালা কোমর থেকে ছোরা বার করল। 'এমন চাঁদনি রাত, আর তোমার অত খুশির মেজাজ। এবার সব খুলেটুলে দাও—'

'এর জন্য একেবারে কাঁটাপুকুরের শ্মশানে আমাকে নিয়ে এলি!' মুখের হাসিটা বাবু তখনও ধরে রাখে।

তা নয়তো কি! রিকশাওয়ালা মনে মনে বলল, ওদিকটায় কিছু করতে গেলে চেঁচামেচি করে তুমি লোক জড়ো করতে ঠিক। নিদান ও দুগা অবিশ্যি তোমার চেঁচামেচি গ্রাহ্য করত না। ওদের সাহস বেশি। মোদকপাড়ার খালপোলের কাছেই তোমাকে ন্যাংটা করে ছাড়ত।

'আমি তো তোকে বলেছি, আজ বেজায় ফুর্তি আমার মনে। দশ পেগ টেনে এয়েছি।' বাবু ধীরেসুস্থে রিকশা থেকে নামল। পা দুটো তখনও বেশ টলছে। 'আমার ছেলে হয়েছে বুঝলি, কিছুই তোকে চাইতে হত না। সব দিয়ে দিতাম।'

বাঁ-গাল ঘুরিয়ে রিকশাওয়ালা এইমাত্র থুতু ফেলেছিল। এবার ডান গাল ঘুরিয়ে কাঁটাঝোপের গায়ে থুতু ছিটোল। চাঁদের আলোয় এখন বান

ডেকেছে। বদখত গলায় পেঁচাটা আবার ডাকল। 'দাও দাও—এত বক্তৃতার দরকার কি।'

ছোরাটা বাঁ-হাতে চালান দিয়ে রিকশাওয়ালা ডান হাত বাড়িয়ে দেয়।

'নে—ধর।' বাবু, হাতের ঘড়ি খুলল। টেনে টেনে লাল বেগুনি পাথরের আংটি খুলল। খুলে রিকশাওয়ালার হাতে তুলে দিল।

'ওটা চাই—দামী কাপড়।' থুতনি নেড়ে রিকশাওয়ালা বাবুর গায়ের শাল দেখায়।

'সব দিচ্ছি ভাবছিস কি তুই। ছেলের বাপ হয়ে আমি আজ দাতাকর্ণ হয়ে গেছি না!' বাবু গায়ের শাল তুলে রিকশাওয়ালার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দেয়। সোনার বোতামসুদ্ধ পাঞ্জাবিটা খুলে ছুঁড়ে দেয়। এই নে বিরাশী টাকার ক্রোম-লেদারের পাম্পশু তোকে দিলাম।' বাবু পা থেকে জুতো জোড়া আলগা করে ফেলে।

ড্যাব ড্যাব করে রিকশাওয়ালা চেয়ে থাকে। মাতালের কাণ্ড। ক পিপে গিলে এলে মানুষের এই দশা হয়, ভাবে সে।

উহুঁ, ছোরার ভয়ে যে সব দিচ্ছে বাবু তা নয়। হাসতে হাসতে দিচ্ছে। যেমন রাস্তায় আসতে আসতে বলছিল।

আর একদলা থুতু ফেলে রিকশাওয়ালা ছোরাটা কোমরে গুঁজল। যেন হঠাৎ তার মন খারাপ লাগে।

'এই নে একেবারে দিগম্বর হয়ে সব তোকে দিলাম।' বাবু একটানে পরনের কাপড়টা খুলে ফেলল। আণ্ডারওয়্যার খুলে ফেলল।

'এই এই—করছ কি!' রিকশাওয়ালা হৈ-হৈ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল।

পেঁচাটা আর ডাকে না। টলটলে চাঁদের আলো গায়ে মেখে প্রকৃতি টিপে টিপে হাসে। বাবু খিকখিক হাসে। হাসতে হাসতে ধমক লাগায়।

'এই বেটা এদিকে তাকা—ঘাসের ওপর থেকে সব তুলে নে—দামী জামা-কাপড় হিমে ভিজে নষ্ট হচ্ছে।'

'আমার দরকার নেই ওসব।' রিকশাওয়ালা ঘাড় ফেরায় না। তুমি কাপড়-চোপড় পরে নাও। আমার লজ্জা করছে তোমাকে দেখতে।'

বাবু হো-হো করে হাসল।

'লজ্জা! লজ্জা ধুয়ে জল খাবি—মায়ের পেট থেকে ন্যাংটো এসেছিলি না? মরে গেলে যখন শ্মশানে পোড়াবে তখন আবার ন্যাংটো হবি যে।'

রিকশাওয়ালা কথা বলে না। মুখটা ঘুরিয়ে রাখে।

'যাক এক হিসেবে ভালই হল। আমার উদোম দেহখানা দেখে তোর নেশাটা কাটল।' বাবু আর হাসে না, মাটি থেকে তুলে নিয়ে ধুতি পাঞ্জাবি পরে। শালটা গায়ে জড়ায়। বিরাশী টাকা দামের জুতোর মধ্যে ধীরেসুস্থে পা গলায়।

এবার রিকশাওয়ালা ঘাড় ফেরাল।

'নাও, এখন গাড়িতে উঠে বোসো। আর এই নাও তোমার ঘড়ি আংটি।'

'অ্যাঁ! বাবুর মুখে খুশি ধরে না। কি রে বেটা—তুই যে আমায় তাজ্জব বানিয়ে ছাড়চিস।' রিকশাওয়ালার হাত থেকে বাবু ঘড়ি আংটি তুলে নেয়। এই ছোরা ধরেছিলি—এই এখন একেবারে ধম্মপুত্তর যুধিষ্ঠির। ব্যাপারখানা কি!'

শ্মশানের গা ঘেঁষে আসস্যাওড়ার ঝোপের মাথায় জ্যোৎস্না চিকচিক করে। রিকশাওয়ালা চুপ করে সেদিকে চেয়ে থাকে।

'নে—একটা আংটি অন্তত রাখ।' যেন নিজের মনে বাবু চোখ টিপল, বলল, 'আমি আদর করে দিচ্ছি, নিয়ে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা কর।' বলে বাবু হাতে ঘড়ি বেঁধে নেয়। একটা একটা করে আংটিগুলি আঙুল ঢোকায়।

'থাক বাবু, আমার আংটির দরকার নেই।' রিকশাওয়ালা মাথা নাড়ল। তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেই। আমায় চা ডিমের বড়া খাইয়ে দিও।' বলে ঝুপ করে হাতের পিঠ দিয়ে সে চোখ মুছল।

'আ মলো! তুই যে একেবারে নাটক শুরু করে দিলি।' বাবু এবার হৈ-হৈ করে উঠল। 'আজ আমার ছেলে হয়েছে। কত আহ্লাদের দিন। কেমন একখানা অস্পিশাস্ ডে। আর তুই কিনা চোখের পানি ফেলছিস—কি হয়েছে তোর শুনি?'

রিকশাওয়ালা একটা লম্বা নিশ্বাস ছাড়ল।

'বাবু, ছেলে হয়ে তোমার এত আহ্লাদ আর ঐ ছেলে হতে গিয়ে আমার খোকার মা মরে গেল—কথাটা মনে হলে এখনো বুকটা কাঁপে।'

'তাই নাকি!' তালুর সঙ্গে জিভ ঠেকিয়ে বাবু চুকচুক শব্দ করল। 'ভারি আফসোশের কথা তো।'

'হ্যাঁ বাবু—এই কাঁটাপুকুরের শ্মশানে এনে বউকে পুড়িয়েছিলাম!' রিকশাওয়ালা আবার চোখ মুছল।

'তবে তো খুব ভাল জায়গায়ই আমায় টেনে এনেছিলি খুন করতে।' বাবু খিকখিক হাসল। 'এখানে এলে সব বেটার মনে বৈরাগ্য আসে তুই কি জানতিস না—নে এখন গাড়ি চালা। অনেক রাত হল।'

রিকশাওয়ালা এবার উল্টো পথে রিক্শা ঘুরিয়ে টানে। ঠুন ঠুন শব্দ হয়।

'আসল কথা কি জানিস—'

বাবু গদীর পিঠে আরাম করে পিঠ এলিয়ে দেয়। 'তোরা, রিকশাওয়ালারা বেজায় বোকা। এই জন্যই তোদের কিছু হল না। সারাজীবন মানুষ টেনে টেনে মরলি।'

'হ্যাঁ, বাবু আমরা বেকুব।'

'বেকুব নয়তো কি!' বাবু ভেংচি কাটল। 'এমন নিরিবিলি শ্মশানমশান জায়গা—আমার ঘড়ি আংটি জামাকাপড় শাল জুতো কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে আমায় কেটে রেখে দিলেও কেউ টের পেত না—আর দুম করে কিনা তোর মরা বৌয়ের কথা মনে পড়ে গেল—আরে মানুষ তো মরেই—আমি মরব তুই মরবি —চিরকাল কে বেঁচে থাকে।'

'হ্যাঁ, বাবু মানুষ মরে।'

'তবে আর কি।' বাবু বোঝাল, আসলে তোরা রিকশাওয়ালারা গরু-ছাগলের মতন। ঐ যে সেদিন রাজাবাজারের রাস্তায় টাকার থলে কুড়িয়ে পেল তোদের এক রিকশাওয়ালা। আর তক্ষুনি বেটা ছুটল থলেসুদ্ধ টাকাটা জমা দিতে থানায়। বেকুব নয়?'

সরু রাস্তা ছেড়ে রিকশা বড় রাস্তায় ওঠে। কনকনে হাওয়া। বাবু জম্পেশ করে শালটা জড়িয়ে নেয়। ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে রিকশাওয়ালা ঠিরঠির কাঁপে। ছুটতে পারে না। রিকশা নিয়ে হেঁটে হেঁটে এগোয়।

'বুঝলি!' বাবু আবার বোঝায়, 'থলের ঐ দু হাজার তনখা পেলে বেটা কদিন পায়ের ওপর পা তুলে মৌজ করে খেত। ঠিক কিনা?'

'হ্যাঁ, বাবু।' রিকশাওয়ালা একটা মর্মভেদী নিশ্বাস ছাড়ল। 'কিন্তু এখন আমি টাকাকড়ি ভাবছি না—ভাবি আমার মন্দ নসিব।'

'ঐ আবার তোর মরা বৌয়ের চিন্তা মাথায় এল।' মুখ দিয়ে বাবু চুকচুক শব্দ করল।

'না বাবু—ভাবি ঐ হারামজাদা ছেলের কথা। তোকে বিয়োতে গিয়ে আমার বৌ চোখ বুজল। তুই এখন পোস্টাপিসের পিওন। মাস গেলে তো কড়কড়ে

মাইনে। বাপকে দেখিস না। বৌ নিয়ে মজা করে খাস। বাপ পৌষের রাতে রিকশা টানে।'

'অ, এই দুঃখ! বাবু হি-হি করে হাসল। 'আরে এটাই জগতের নিয়ম। ছেলে হয়েছে বলে আজ আমি আহ্লাদে নাচি। বড় হয়ে ঐ সোনারচাঁদ ছেলে পিপে পিপে টানবে—কিছু বলতে গেলে জুতোপেটা করে আমায় বাড়ি থেকে তাড়াবে। ঠিক কিনা!'

'কিন্তু, ধম্ম বলে একটা বাক্যি আছে বাবু—'

'ধুত্তরি ধম্ম—ধম্ম ধুয়ে জল খাবি—ত্যাখ্‌, ত্যাখ্‌ একটা ট্যাকসি যায়—হেই ট্যাকসি।' দু হাত উঁচিয়ে বাবু চেঁচায়। তারপর ঝুপ করে রিকশা থেকে নেমে ছুটতে থাকে : ট্যাকসি দাঁড়াল। বাবুকে তুলে নিয়ে তখনি আবার ছুটে চলল।

প্রথমটা বোকা হয়ে গিয়ে হাঁ করে হাওয়া গাড়ির পিছনের লাল আলোর ফুটকিটা দেখল ঘেনু। বাবু কি ভাড়া দিয়েছে। রিকশা-ভাড়া দিতে বাবু ভুলে গেছে। তাই এত দুঃখের মধ্যেও ঐ ফুটকি আলোর মতন ঘেনুর শুকনো পুরু ঠোঁটের মাঝখানে একটা হাসি উঁকি দেয়। কিন্তু উঁকি দিয়েই থেমে থাকে না। হাসিটা বাড়তে থাকে, ক্রমে বড় হয়ে হয়ে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। তখন বাবুর মতন খিকখিক শব্দ করে সে হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে এমন হয় তার পেটে খিল ধরে যায়। সেজন্য রিকশা ছেড়ে দিয়ে রাস্তার ধারে ঘাসের ওপর বসে পড়ে। তবু হাসির ধমক কমে না। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে ঘেনু। হেসে হেসে তার চোখে জল এসে গেল। সে বুঝতে পারল বাবুর তখনকার মূর্তিটা মনে পড়ে তার মধ্যে এই হাসির ভূমিকম্প। তাই এবার দাঁতমুখ খিঁচি হাসিটা রুখতে চেষ্টা করল। আকাশ দেখল। শীতের দুধপুলির মতন চাঁদটা ঝুলছে!

মনে মনে সে বলল, ছেলে হয়েছে যখন বেঁচে থাক। খোকা কোলে নিয়ে গিন্নীমা ভালয় ভালয় হাসপাতাল থেকে ফিরে আসুক। আমরা রিকশাওয়ালারা বার বার ঠকে গিয়েও বাবুদের ভালটাই দেখি—ইষ্টটো চাই।

চাওয়া

প্রভুদয়াল তার বৌকে নিয়ে কি করবে দিশা করতে পারছিল না।

এত রূপ! ডানাকাটা পরী বিয়ে করে ঘরে এনেছে সে।

ঘরে আনার পর থেকে নিজে তো সে হকচকিয়ে গিয়েছেই, দশটা মুখ দশবার করে বলছে, হ্যাঁ, রূপসী বটে! একশটা ঘর খুঁজে ছাখ, এমন সুন্দর বৌ কারো পাবে না।

শুনে শুনে প্রভু আরো কেমন যেন হয়ে গেছে। ভাবে সে, এই স্ত্রীর জন্য, অর্থাৎ হেনাকে নিয়ে শেষটায় না সে পাগল হয়ে যায়।

বস্তুত যতক্ষণ অফিসে থাকে, মোটামুটি মাথাটা ঠাণ্ডা থাকে তার, বেশ একটা স্বস্তির মধ্যে সময় কাটায়। যেই মুহূর্তে ঘরে পা দিল, প্রভু অশান্ত হয়ে উঠল, একটা অস্থিরতা তার বুকের ভিতর দাপাদাপি করতে আরম্ভ করল, চেহারা দেখলেই বোঝা যাবে বাস থেকে নেমে বাড়ি পর্যন্ত এই অল্প একটু রাস্তা আসতে আসতেই কী ভীষণ উত্তেজিত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে সে।

হয়তো হেনা তখন একটা হলদে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে আছে বা নীল রঙের একটা ব্লাউজ কাঁধে ফেলে গা ধুতে বাথরুমে যাচ্ছে বা গা ধুয়ে এসে চুল আঁচড়াচ্ছে বা গা ধোয়া প্রসাধন করা চুল বাঁধা সব কিছু সেরে হৃষ্টমনে বারান্দার টব থেকে একটা যুঁইফুল তুলে নিয়ে খোঁপায় গুঁজছে।

অফিস থেকে ফিরে এক অবস্থায় কখনও সে হেনাকে দেখে না। দেখবে সেটা আশাও করে না। ঘড়ি ধরে অফিস ছুটি হয়। কিন্তু ঘড়ি ধরে কারো বৌ কিছু বিকেলের পোশাক বদলায় না বা গা ধোয় না বা চুলে ফুল গুঁজে জানালায় দাঁড়ায় না। সময়ের একটু এদিক ওদিক হবেই।

যাই হোক, প্রভুদয়াল কিন্তু অস্থির হয়ে পড়ে, চোখে মুখে প্রবল উদ্বেগ, দৃষ্টির মধ্যে ভয়ানক চাঞ্চল্য, এমন কি তার শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যেও একটা অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলার আলোড়ন জেগেছে টের পাওয়া যায়।

সেজেগুজে বৌ জানালায় দাঁড়িয়ে আছে দেখা মাত্র তার মুখে একটা উদ্বেল হাসি ফুটে ওঠে। হাসির আগায় কামনার ফেনা। যেন এখনি ছুটে গিয়ে বৌকে জড়িয়ে ধরে সে চুমো খাবে। খায়ও।

কিন্তু কোনো কোনো দিন সেটা।

আবার এক এক দিন এমনও হয়, বৌ বাথরুমে ঢুকছে, দুপদাপ শব্দ করে ঘোড়ার মতন ছুটে প্রভু ঘরে ঢুকল। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে তার। শব্দ পেয়ে হেনা চকিতা হরিণীর মতন ঘাড় ফিরিয়ে কালো ডাগর চোখ মেলে স্বামীকে দেখল, কিন্তু প্রভু তৎক্ষণাৎ বিষণ্ণ স্তিমিত হয়ে গেল, হাসল না, কথা বলল না।

ধপ করে সোফার ওপর বসে পড়ল।

আধফোটা গোলাপ কলির হাসি মুখে নিয়ে হেনা কাছে এসে দাঁড়াল। এই 'আধফোটা' কথাটা প্রভুর দেওয়া। সেই বিয়ের রাতে। প্রভুর এত ভাল লেগেছিল। এর চেয়ে বেশি হাসলে, অর্থাৎ হাসতে গিয়ে হেনার গোলাপী পাতলা ঠোঁট দুটি যদি আর একটু বেশি ছড়িয়ে পড়ত, তবে যেন সেই-হাসির মাধুর্য কমে যেত। তেমনি যদি সে একটু কম হাসত, ঠোঁট দুটি আর একটু বুজে থাকত, তাতেও হেনার হাসির সৌন্দর্য যেন তেমন খুলত না।

হেনা যখন চুলে ফুল গুঁজে জানালায় দাঁড়ায় তখন এই আধফোটা গোলাপ কলির হাসি তার ঠোঁটে লেগে থাকে, বা যখন বারান্দায় নিঃশব্দ দুপুরে নিজের মনে একলা পায়চারি করে। হুঁ, রাতে শোবার সময়ও হেনা গোলাপ কলির হাসি হাসে, বা ঘুম থেকে প্রথম জেগে ওঠার পর। এই হাসি দেখে অস্থির হয়ে প্রভু কতদিন বৌয়ের হাসিমুখে চুমু খেয়েছে।

ঘড়ি ধরে প্রভুর অফিস ছুটি হয়, ঘড়ি ধরে অফিস বসে। কিন্তু আগেই যা বলা হয়েছে, ঘড়ির কাঁটার সময় মিলিয়ে বাড়ির বৌ কিছু চুল আঁচড়ায় না বাথরুমে ঢোকে না। দুপুরের আলস্যভরা হাই তোলার মতন ধীর মন্থর এলোমেলো তার সাজগোজের সময়, খাওয়ার সময় বিশ্রামের সময়—সময়ের কিছু ঠিক থাকে না। সময়টাকে নিজের হাতের মুঠোয় পায় বলে সময় নিয়ে মাছের মতন খেলা করতে হেনা ভালবাসে। কিন্তু এটাই সবচেয়ে অদ্ভুত, অবিশ্বাস্যও বটে, হেনার ঠোঁটের আগায় হাসির একচুল অদলবদল নেই।

ওর আধফোটা গোলাপ কলির হাসিটাই একটা মনোহর ঘড়ি। কোনদিন এর দম বন্ধ হয় না। হেনার বুকের ভিতর কেউ ঠিক ঠিক সময়ে চাবিটা দিয়ে যাচ্ছে। ফলে গোলাপ কলি হয়ে তার হাসি নির্ভুল নিয়মে ফুটছে। এবং এই জন্যই বলা হচ্ছিল, চঞ্চল উন্মাদ হয়ে ঘরে ফিরে প্রভু যদি হেনাকে এক এক দিন জড়িয়ে ধরে চুমো খায়, বা আর একদিন বিষণ্ণ স্তিমিত হয়ে সোফার ওপর বসে

পড়ে—হেনা তার অবিশ্বাস্য রকম সুন্দর হাসিটি অধরোষ্ঠে ফুটিয়ে তুলে প্রভুকে উপহার দিতে উন্মুখ হয়ে উঠবেই।

আজ পর্যন্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল না। দেড়-দু'বছর তাদের বিয়ে হয়েছে। হেনা হাসছে না, প্রভু এমন একদিনও দেখেনি।

কি হল, মাথা ধরেছে? হেনার সাদা ধবধবে গ্রীবা ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে। বিষণ্ণ স্তিমিত প্রভু তখন হয়তো মনোযোগ দিয়ে জুতোর লেস খুলছে। কথার উত্তর দিচ্ছে না। তার বুকের ভিতর প্রচণ্ড আলোড়ন।

ঠিক এই অবস্থায় অন্য মেয়ে, অন্য ঘরের বৌ মুখ কালো করবে? অভিমান নিয়ে কাঠ হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে?

প্রভুর জানা নেই। অন্য কারো স্ত্রীর সঙ্গে তার দেখা হয় না, বা এই অবস্থায় তারা কে কি করে, কাউকে সে জিজ্ঞেস করে না।

কিন্তু এখানে, নিজের ঘরে, যখন সে জুতোর ফিতে খোলা শেষ করে ঘাড় তুলে তাকায়, দেখে ডানাকাটা পরীর মতন তার আশ্চর্য রূপসী বৌ সেই আধফোটা হাসি ঠোঁটে নিয়ে অগাধ কালো চোখ দুটো মেলে একভাবে তাকে দেখছে।

কিছু হয়নি, আমার কিছু হয়নি। প্রভু গা ঝাড়া দিয়ে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল। তার চোখেমুখে বিরক্তি, অসন্তোষ। ঠোঁট বেঁকাল সে, চেহারাটা বিকৃত করে ফেলল।—দুবার দুটো চিঠি টাইপ করতে গিয়ে ছোঁড়া এমন দুটো ভুল করল, সেই তখন থেকে মেজাজ খিচড়ে আছে। সংশোধন করে দেবার পরেও যদি একই ভুল চোখে পড়ে—বুঝতে পারছ?

হেনা কথা বলে না। নীরব থেকে তেমনি হাসে। অফিস থেকে মেজাজ খারাপ করে এসেছে স্বামী। সত্যি তো এই নিয়ে তার বলার, সান্ত্বনা দেবার কী আছে। সুন্দর হাসিটি ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে সে বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

পিছনে তাকিয়ে সে দেখল না আবার পুরুষটির কপালের চামড়া ভুরু ও চোখের ধারগুলো কী ভয়ংকর কুঁচকে উঠেছে। দেখল না, হাতের বদ্ধ মুষ্টি দুটো কোমরের পিছনে ধরে রেখে বুকের মধ্যে অসহ্য রকমের একটা যন্ত্রণা নিয়ে প্রভুদয়াল প্রায় থরথর করে কাঁপছে।

হয়তো গুনগুনিয়ে তখন গান করছে হেনা। দরজার ছিটকিনি আটকে দিয়ে গায়ে সাবান মাখছে।

প্রভুদয়াল দুমদুম করে পাল্লার ওপর আঘাত করল।

কি হল! চট করে বাথরুমের দরজা খুলে গেল, গলায় মুখে সাবানের ফেনা

নিয়ে হেনা সেই আধফোটা হাসি হাসছে। তোয়ালেটা বুকে জড়ানো। চমৎকার লেস লাগানো শায়ার এখানে ওখানে জলের দাগ, আর সেইসব দাগের ভিতর দিয়ে হেনার তলপেটের চামড়া, কোমরের খানিকটা, উরুর কোন কোন মসৃণ অংশ বিকেলের বাদামী রোদ-লাগা আপেলের লোভনীয় দ্যুতি নিয়ে ফুটে বেরিয়েছে।

কি হল! প্রভুদয়াল এমন চোখ করে, এমন নীরব থেকে এবং আচমকা এমন অসহায় ভঙ্গি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল, হেনা অবাক হল না যদিও, মাঝে মাঝে প্রভু এমন তো করেই, কাজেই ঠোঁটের হাসিটা একটু বাড়তে বা কমতে না দিয়ে সুন্দর মাজা গলায় বলল, কিছু চাইছ?

সবচেয়ে অদ্ভুত, প্রভুর চোখ মুখ কুঁচকান একেবারে থেমে গেছে। এই মুহূর্তে শিশুর অনির্বচনীয় সরলতা তার মুখে। একটা অসহায় ভাব। প্রায় কান্নার মতন। দেখলে মায়া হয়।

এমন কি শিশুর মতন তার ঠোঁটটাও দুবার কেঁপে উঠল।

কি চাইছি তুমি কি জান না?

আমি ঠিক বুঝতে পারিনি—একটু থেমে হেনা আবার বলল, দেখলাম অফিস থেকে মন মেজাজ খারাপ করে ফিরছ—

না না না, তা নয়। কোথায় গেল শিশুর মায়া ধরানো চেহারা, আবার সেই উত্তেজিত ক্ষিপ্ত অসহিষ্ণু পুরুষ। প্রভু প্রায় চিৎকার করে উঠল, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ।

অ মা, সে কি! আকাশ থেকে পড়ল হেনা, কিন্তু হাসিটি ঠিক আছে, কেবল ভুরু দুটো ধনুকের মতন বেঁকে উঠেছে।—রাগ করব কেন, কখন রাগ করলাম!

এই তো একটু আগে। জুতোর ফিতে খুলছিলাম, আর তুমি চলে এলে।

ইস, দ্যাখো, কী অদ্ভুত ছেলে তুমি—মেজাজটা খারাপ তোমার, তাই ভাবলাম গা-টা ধুয়ে আসি।

না না না, তা নয়। তুমি অভিমান করেছিলে।

ও মা! তোয়ালের একটা কোণা এক সেকেণ্ডের জন্য কামড়ে ধরে হেনা তখনি আবার দাঁত আলগা করে ঠোঁট দুটো আধফোটা গোলাপ কলির মতন করে সেই সুন্দর অভিনব হাসিটা হাসল।—কেন অভিমান করব? তোমার ওপর আমি কোনদিন অভিমান করেছি কি?

এখন করেছ, আজ করেছ। হাত বাড়িয়ে সাবান মাখা হাতটা মুঠোয় তুলে নিল প্রভু।—আমি চুপ করে ছিলাম, কথা বলিনি, তুমি চলে এলে।

না না, সত্যি বলছি। অনুনয়ের গাঢ় মধুর রস হেনার গলা থেকে ঝরে পড়ল। অফিসে তোমার স্টেনো চিঠি টাইপ করতে ভুল করেছে—ভাবলাম—হেনার মুখের কথা আটকে গেল।

প্রভু চিৎকার করে উঠল, অফিস অফিস, এখানে, এই মুহূর্তে, একটু আগে, আমার ঘরে, তোমার কাছে, তোমার সামনে ছুটে এসে রোজ রোজ আমি কী চাই তুমি কি জান না?

প্রভুর মোটা ভারি গমগম গলার স্বরে দরজা জানালা দেওয়ালে ঝুলানো আয়না প্রায় থরথর করে কাঁপছিল। ঝনঝন শব্দ হচ্ছিল।

গোলাপ কলির হাসি নিয়ে হেনা চুপ।

বল বল, তুমি কি জান না—তার নরম কব্জি ধরে প্রভু প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিল।

হেনার চোখে প্রায় জল এসে গেল, যেন হাতে একটু লাগল, তবু ঠোঁটের হাসি নিবতে দিল না।—আমি ঠিক বুঝিনি, সত্যি তুমি কী চাইছিলে—

প্রভু তাকে কথা শেষ করতে দিলে না।—

কোনদিনই তুমি বুঝবে না, কোনকালে তুমি বুঝতে চাও না। প্রমত্ত অবুঝ অত্যাচারী দস্যুর মতন প্রভু স্ত্রীকে বুকের মধ্যে টেনে নিল, চুমোয় চুমোয় কাঁচের টুকরোর মতন শরীরটা চুরমার করে দিতে চাইল। প্রভুর গলায় গোঙানির মতন শব্দ আরম্ভ হল। যেন রক্ত চুষতে চুষতে পশু শব্দ করছে।—আমি কি চেয়েছি, কি চাইব তুমি রোজ না বোঝার ভান করে থাক দুষ্টু।

চুল থেকে নখ পর্যন্ত হেনা লাল হয়ে উঠল, অতিরিক্ত পিষ্ট হবার পর ঝাঁকুনি খাওয়ার ফলে একটি রূপসী তরুণীর যে অবস্থা হয়।

হেনা হাঁপাচ্ছিল। বৌকে ছেড়ে দিয়ে প্রভু হাঁপাচ্ছিল। হেনার চোখেও শীতের হিমকণার মতন জলের আভাস জেগেছে। তবু সে হাসছিল।

ও, এই এজন্যে, কিন্তু আমি কি ফুরিয়ে গেছি, ফুরিয়ে যাচ্ছিলাম?

প্রতি মুহূর্তে তুমি আমার কাছে ফুরিয়ে যাচ্ছ শেষ হয়ে যাচ্ছ। হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁটের কিনারের সাবানের ফেনা মুছে ফেলল প্রভু।—শেষ হয়ে গিয়ে আমার বুক শূন্য করে দিচ্ছ।

কিন্তু তখনি আবার আমি ভরে উঠছি, আবার আমাকে ষোল আনা ফিরে পাচ্ছ। তোয়ালেটা নতুন করে বুকে জড়িয়ে নিল হেনা।—তাই না?

প্রভু হঠাৎ কথা বলতে পারল না।

এবার আমায় গা ধুয়ে শেষ করতে দাও লক্ষ্মীটি। সান্ত্বনা দেবার মতন গলার স্বর করে আস্তে দোরটা আটকে দিল হেনা। জল পড়ার ছপছপ শব্দ হতে লাগল। কিন্তু তার চেয়েও সুন্দর একটা সুর করে ছন্দ নিয়ে ভিতরে থেকে হেনা বলল, গা ধুয়ে নতুন করে ভরে উঠে আমি তোমার কাছে আসব, আবার আমাকে নিঃশেষ করে দিও।

এই জন্যই তো আমি দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি, পাগল হয়ে যাব। বন্ধ দরজাটার দিকে হিংস্র অসহায় চোখে তাকিয়ে প্রভু মনে মনে বলল, এত রূপ আমি সহ্য করতে পারছি না, তুমি কবে আমার কাছে শেষ হবে, শূন্য হয়ে যাবে, আর আমি শান্তি পাব আমাকে বলতে পারো?

অফুরন্ত ফেণা ও গন্ধ ছড়িয়ে হেনা ভেতরে বসে সাবান মাখছিল। আর প্রভু ছটপট করছিল। একদিন না। এমন রোজ। যতক্ষণ অফিস—অফিস। বাকি সবটা সময়, হেনা যতক্ষণ তার সামনে, সে চঞ্চল ক্ষুব্ধ হিংস্র বিপন্ন। তার যে কী ইচ্ছা করে সে বুঝতে পারে না।

সেদিন কী কাণ্ড করল!

তাদের বিয়ের তারিখে ঘরোয়া উৎসব পরামর্শ করে দুজনেই দুজনের বন্ধু বান্ধবীকে বাড়িতে ডেকে এনেছিল। মাঝের হলঘরে খাওয়াদাওয়া শেষ করে গোল হয়ে বসে সকলে গল্প করছিল আনন্দ করছিল। ঠিক সে মুহূর্তে প্রভু উসখুশ করতে লাগল। ঘন ঘন হাতের ঘড়ি দেখছি। একবার উঠে গিয়ে হেনার কানে কানে কী বলেও এল। ঠোঁটে হাসি নিয়ে হেনা ভ্রূকুটি করল। দু-একজন দেখল। কিন্তু তারপর প্রভু আবার কেমন অস্বস্তি নিয়ে এদিক ওদিক করছে, কারো কাছে স্থির হয়ে বসতে পারছে না, কথা বলতে পারছে না। তখন সকলেরই জিনিসটা চোখে পড়েছে—

আজ আমরা উঠব, প্রভু। প্রায় এক সঙ্গে সকলে গাত্রোত্থান করার ভঙ্গি করল। হেনার দিকে চোখ রেখে তার বান্ধবীরা বলল, আজ চলি রে হেনা।

হেনা নীরব।

প্রভু তার বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা চাওয়ার মতন চেহারা করল।—নাইট শো'র টিকিট কেটেছিলাম ভাই। দুজনে একসঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছি।

নিঃশব্দে সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হাসছিল হেনা ঠিকই। কিন্তু মুখটা কেমন সাদা হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ এমন করলে যে!

ভিড়। প্রভুর গলার স্বর বিকৃত হয়ে উঠল। এত লোকের মধ্যে আমি তোমাকে কাছে পাচ্ছিলাম না হেনা, কেমন যেন বার বার হারিয়ে যাচ্ছিলে।

ওফ্, আবছা একটা শব্দ করল হেনা, গাঢ় নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর সেই আধফোটা গোলাপের হাসিটা ঠোঁটে ধরে রেখেই ধমকের সুরে বলল, এই তো আমি কাছে আছি—ওরা কতক্ষণ থাকত? খামোকা মিছে কথা বলে—তারপর হেনা দেওয়ালের দিকে চোখ ফেরাল। পাগল, বদ্ধ পাগল তুমি—তোমায় নিয়ে যে কী করব আমি বুঝতে পারছি না।

আমিও বুঝতে পারছি না। হেনার পাশে সোফার ওপর ভেঙে পড়ল প্রভু, দু-হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল।—সত্যি আমি পাগল হয়ে গেছি।

এভাবে ঘরে, যতক্ষণ সে আছে, বৌ থাকবে—একটা ভয়ংকর উজ্জ্বল আলোর মতন চোখের সামনে, তার শরীরের কাছে হেনা অবিরত জ্বলবে, আর সেই প্রচণ্ড তাপ লেগে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

তা না হলে, হেনা ভাবে, এই পুরুষ এমন করবে কেন! কেবল সেদিন বন্ধুদের সঙ্গে এই ব্যবহার না, যেন বাইরের জগত, বাইরের আলো, বাইরের সব মানুষের চোখ তার কাছে অসহ্য। যেন সবাই তার প্রতিদ্বন্দ্বী, সকলের ওপর তার হিংসা, সকলকে তার ঈর্ষা সন্দেহ।

আর একদিন কি তাই হল না! হেনাকে নিয়ে পুরী বেড়াতে যাচ্ছিল। ট্রেনের সীট রিজার্ভ করা, টেলিগ্রাম করে ওখানকার হোটেলের ঘর ভাড়া করা, জিনিসপত্র কেনাকাটা—সমস্ত আয়োজন সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। এমন কি ট্যাক্সি ডেকে হাওড়া স্টেশনেও পৌঁছে গিয়েছিল।

কিন্তু ঐ যে ট্রেনে উঠবে বলে তারা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো মাত্র হাজারটা মানুষ গাড়ির জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে চোখ বড় করে প্রভুর আশ্চর্য রূপসী স্ত্রীকে দেখছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর কপালের রগ দপ দপ করে উঠল। তক্ষুনি পুরী ভ্রমণ বানচাল করে দিয়ে হেনার হাত ধরে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি করে সে সোজা ঘরে ফিরে আসে।

বিস্ময় না, বিরক্তি না—কৌতুক, সেই সঙ্গে এক আঁজলা অনুকম্পাও খেলা করে উঠেছিল হেনার গভীর সুন্দর চোখ দুটোর মধ্যে। তাই ঘরে ফিরে গোলাপ কলির হাসি ঠোঁটের আগায় অক্ষুণ্ন রেখেই সে প্রভুকে কথাটা শুনিয়েছিল।

এভাবে আমাকে চারটে দেয়ালের মধ্যে আটকে রাখার বন্দী করে রাখার কোন মানে হয় না। এতে তোমার যন্ত্রণা আরো বাড়বে।

আমি এই যন্ত্রণাই চাই, এই যন্ত্রণার মধ্যেই আমার সুখ। প্রভু প্রায় অট্টহাস্য করে উঠেছিল।

তাই তো বলছি, এত অবুঝ তুমি, এত অস্থির। সারাক্ষণ কেবল আমার চিন্তা আমার ধ্যান। এভাবে চিরে চিরে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ঝরিয়ে তুমি ক'দিন বাঁচবে শুনি?

আমি তো মরে যেতেই চাইছি হেনা, তোমার আশ্চর্য চোখ ভুরু চুল, অসামান্য সুন্দর মসৃণ উজ্জ্বল গায়ের চামড়া, কোমর উরু পা, হুঁ, পায়ের নখ সব নিংড়ে রস খেয়ে—বিষাক্ত কোন ফলের রস খেয়ে যেমন মানুষ মরে, আমি মরে যেতে চাই। আমি মুক্তি চাই।

কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি, তুমি মরে যাবার পরেও আমি বেঁচে থাকব, এই চুল চোখ চামড়া নখ দিয়ে একটি রসালো ফলের মতন আমি ভরে থাকব। তখন কে আমার রূপের গুণ করবে, বা তোমার ভাষায় আমায় নিংড়ে নিংড়ে রস খাবে? তুমি যদি তখন চলেই গেলে—

প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে প্রভু গোল গোল চোখ করে হেনাকে দেখল। তারপর অন্যদিকে চোখ ফেরাল। একটা গভীর নিশ্বাস ফেলল।

তাই তো, নিজেকে ধ্বংস করা যায়, হৃৎপিণ্ড চিরে রক্ত দিয়ে রূপের পুজো করা যায়, কিন্তু তার পরেও তো রূপ বেঁচে থাকে—এই ভাবনা যে আরও গভীর, এর যন্ত্রণা যে আরও মারাত্মক।

চেহারাটা বিকৃত করে সে হেনার দিকে তাকাল। তা হলে আমায় কী করতে বল শুনি? আমায় একটা বুদ্ধি দাও, পরামর্শ দাও হেনা। আমি সত্যি আর পারছি না। শিশুর মত কাঁদল না সে, হিংস্র অত্যাচারী পশুর মতন গর্জন করল না, ঠোঁটটা কামড়ে ধরে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল।

মনটাকে উদার কর বড় কর, বাইরের দিকে একটু তাকাও, শান্তি পাবে। আদর করে প্রভুর পিঠে হাত বুলোল হেনা।—আমি তো রয়েছিই। এত বড় আকাশেও সন্ধ্যাতারাটি ঠিক জলজল করে—করে না কি?

প্রভু শুনল। কিন্তু সান্ত্বনা পেল কি। দু-দিন খুব ভাবল। অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে থাকল। দাড়ি কামাল না। সিগারেট খাওয়া বাড়িয়ে দিল। এমন কি পুরো একটা দিন অফিস কামাই করে ফেলল।

যেন সেদিনই, যেদিন অফিসে গেল না, সারাদুপুর টো-টো করে বাইরে বাইরে ঘুরল। যেন বাইরে থেকে ঘুরে এসে মনটা একটু স্থির হল, অন্তত হেনা তাই দেখল। প্রভু জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদায় মন দিয়েছে।

তা হলে আমরা পুরী যাচ্ছি! খুশি হয়ে হেনা প্রশ্ন করল।

পুরী না হেনু। আমরা পাহাড়ে যাব। সমুদ্রের চেয়ে পাহাড় অনেক বেশি সুন্দর। অত্যাচারী দস্যু না, আদেখলা শিশু না, প্রেমিকের মতন প্রভু সুন্দর করে হেনার ঠোঁটে চুমো খেল।—কাল সকালেই আমরা রওনা হচ্ছি।

আহ্লাদে হেনা প্রায় হাততালি দিয়ে উঠল।

যেন হেনার উপদেশে কাজ হল। রাস্তায় স্টেশনে ওয়েটিং রুমে ট্রেনে লক্ষ মানুষ লক্ষবার করে হেনাকে দেখল। প্রভু গ্রাহ্যই করল না, একটু মাথা ঘামাল না এই নিয়ে। সারারাস্তা গাড়ির জানালার ধারে বসে দুজন গল্প করল, আর, একটু পর পর খাবার খেল।

চমৎকার ডাকবাংলো পেয়ে গেল তারা। দেবদারু আর ইউক্যালিপটাসের ঘন বন চারিদিকে। সারাক্ষণ পাখি ডাকছে। বাতাসের মর্মর। শুকনো খটখটে নীল আকাশ। আর তিনদিক ঘিরে স্তূপ স্তূপ পাহাড়। খাওয়া-দাওয়ার খুব সুখ। হাত বাড়ালেই তিতির মুরগি মিলছে। খরগোস। ঘন দুধ।

দু-দিন—তিন দিন—চার দিন। চার দিনের দিন হেনা আর লোভ সামলাতে পারল না। পাহাড়ের চূড়ায় উঠবে।

প্রভু প্রথম থেকেই যা চাইছিল। হেনার ভয়। চারদিন ক্রমাগত পাহাড দেখে দেখে হেনা ভয়টা কাটিয়ে উঠল।

একদিন বিকেলে প্রভুর হাত ধরে ঘেমে হাঁপিয়ে অতিকষ্টে একটা চূড়ায় উঠল। দুজন একটা পাথরের ওপর বসল। একটু বসে বিশ্রাম করল। তারপর আবার উঠে দাঁড়াল।

এপাশটায় ভয় নেই। ওপাশটাই ভয়ের। ভীষণ খাড়া। সোজা অন্ধকার খাদের দিকে নেমে গেছে। আশ্চর্য, হেনার হাত ধরে প্রভু সেদিকেই চলল।

দু-পা এগিয়ে হেনা দাঁড়িয়ে পড়ল।

কি হল! প্রভু ভুরু কুঁচকোল।

আর যাব না। হেনা আস্তে বলল।

ওদিকেই যেতে হবে, প্রভু রীতিমত গর্জন করে উঠল।—তোমায় নিয়ে ওখানটায় যাব বলে কষ্ট করে এতটা ওপরে উঠলাম।

দেখতে দেখতে বীভৎস বিকৃত হয়ে উঠল তার চেহারা।

হেনা অপলক চোখে স্বামীকে একবার দেখল।

এস। কঠিন সবল হাতে হেনার নরম কব্জি ধরে প্রভু ঝাঁকুনি দিল।

ওখানে গেলে কী হবে? ছোট করে একটা ঢোক গিলে হেনা প্রশ্ন করল।

তোমায় ধাক্কা দিয়ে খাদের অন্ধকারে ঠেলে ফেলে দেব, তারপর আমি এখান থেকে নেমে যাব, তারপর আমার মুক্তি। অক্লেশে প্রভু উত্তর করল। কিন্তু তখনি সে স্তব্ধ হয়ে গেল।

কেননা ভয় পেয়ে হেনা চেঁচাল না, মুখটা একটু ফ্যাকাসে করল না, কাঁপল না, ঋজু সুঠাম তরুণ দেবদারু গাছের মতন সুন্দর শরীরটা নিয়ে অবিচল দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে রক্তাভ পরিপুষ্ট অধরোষ্ঠে আধফোটা গোলাপের হাসিটা ফুটিয়ে তুলল।

ভয় পেল প্রভু। হেনার হাত ছেড়ে দিল। যেন হেনা মানুষী না, দেবী। আমার কাছে তুমি কা চাইছ, বলতে পার প্রভু? হেনা সামনের দিকে গলাটা বাড়িয়ে দিল।

না, না, বলতে পারছি না, এই জন্যই তো এত যন্ত্রণা। কোনদিন বলতে পারব না বলেই তো আমি পাগল হয়ে গেছি। ঘাসের ওপর বসে পড়ল প্রভু।

তারপর পাথরটার গায়ে মাথা কুটতে লাগল, হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

ওঠ, শোন। হেনা তার হাত ধরে টেনে তুলল। সান্ত্বনা দিল। প্রবোধ দিল।

—এমন করে কাঁদে না।

প্রভু আর কাঁদল না ঠিকই। কিন্তু চোখের জল মুছল না, কপালের রক্ত মুছল না। হেনার হাত ছাড়িয়ে পাহাড়ের ওদিকটায় ছুটে যেতে পা বাড়াল।

কি হচ্ছে! হেনা শক্ত করে তার হাত চেপে ধরল।

আমি মরব, আমি খাদের অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে সব যন্ত্রণা শেষ করব।

শোন। হেনা তার হাত ছাড়ল না, অনিন্দ্য সুন্দর গোলাপের হাসি ঠোঁটে নিয়ে প্রভুর চোখের দিকে তাকাল।—আমার কাছে তোমার কী চাওয়ার ছিল, মুহুর্মুহু কী চাইছিলে তুমি কোনদিনই বলতে পারবে না, কিন্তু তোমার কাছে আমার কী চাওয়ার আছে, তা তো শুনছ না।

কী! হঠাৎ যেন মুমূর্ষু কাতর শূন্য দৃষ্টি নিয়ে প্রভু তাকাল। যেন একটু আশা এল তার মনে, একটু বল পেল। যেন এমন কিছু হেনা তার কাছে

চাইছে যার ওপর তার জীবন নির্ভর করছে, এমন কিছু হেনার মুখে শুনবে যাতে তার সব অস্থিরতা সব যন্ত্রণা অবসান হবে।—বলো, বলো আমার কাছে তোমার কী চাওয়ার আছে। একটা ভীষণ আবেগ নিয়ে সে হেনার কাঁধে হাত রাখল।

হেনা হাত দুটো নামিয়ে দিল না। আকাশের দিকে তাকাল। তারপর ঠাণ্ডা মসৃণ গলায় বলল, ডিভোর্স। তবেই আমার সব যন্ত্রণার শেষ হবে, আমি মুক্তি পাব।

গোরুর মতন চোখ দুটো করে প্রভু আস্তে আস্তে ঘাসের ওপর বসে পড়ল।

নিঃশব্দ নায়ক

কাঁঠাল খেতে খুব ভালবাসে সুহাসিনী। জ্যৈষ্ঠ মাস পড়তে এঘরে-ওঘরে যখন পাকা কাঁঠাল আসতে আরম্ভ করে তখন সুহাসিনীর রসনা সজল হয়ে ওঠে বললে সবটা বলা হয় না, কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়ে মানুষটা। ফ্যাকাশে চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে, একটা অস্বাভাবিক চাকচিক্যও দেখা যায় তার চোখে, জোরে জোরে শ্বাস টানতে আরম্ভ করে, ছটফটও করতে থাকে খুব। চোখে কিছু দেখতে না পেলেও এদিক ওদিক তাকায়—বলতে কি তখন সুহাসিনীর ঐ অবস্থা দেখলে যে-কেউ ধরে নিতে পারে সুহাসিনী বুঝি তার প্রেমিকের গলার শব্দ শুনল। প্রেমিক—যারা সুহাসিনীকে জানে, যারা তাকে বরাবর দেখে আসছে, তারা অবশ্য কথাটা শুনলে ঠোঁট টিপে হাসবে। তা হলেও, পাকা কাঁঠালের গন্ধ নাকে লাগলেই সুহাসিনীর এমন বেসামাল অবস্থা উপস্থিত হয়। এত ভালবাসে সে কাঁঠাল, এত প্রিয় তার কাঁঠালের গন্ধ।

তেমনি আনারস। পাকা আনারসের গন্ধ কম চড়া না। কারো ঘরে আনারস এল কিনা সুহাসিনী নিজের ঘরে বসে টের পায়। আর টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুহাসিনীর জিভে জল আসে। আনারসও সুহাসিনীর প্রিয়। তেমনি পাকা কলা পাকা আম। বা চৈত্র মাসে যদি কেউ ফুটি নিয়ে আসে। বাড়িতে হয়তো আনল না। পাশের গলি দিয়ে কোন ফেরিওয়ালা যদি পাকা ফুটির ঝুড়ি মাথায় করে কোনরকম হাঁক-ডাক না করেও চলে যায় তো, আর কেউ বলতে না পারুক, সুহাসিনী ঠিক বলে দেবে, ফুটি নিয়ে যাচ্ছে। ফুটি, আপেল আঙুর, ন্যাসপাতি যা-ই লোকটা নিয়ে যাক।

অবশ্য পাকা আম-কাঁঠালের মতন ফুটির মতন আঙুর বা ন্যাসপাতি তেমন একটা চড়া গন্ধ ছড়ায় না। তবু ফুলের একটা গন্ধ আছে তো। আর সেই গন্ধ সুহাসিনীর নাকে লাগবেই। এত তীব্র তার নাক, এত প্রখর তার ঘ্রাণশক্তি।

এবার মাছের কথায় আসা যাক। কোন ঘরে ইলিশমাছ রান্না হচ্ছে টের পেলেও সুহাসিনী কম ছটফট করে না। ইলিশ বা চিংড়িমাছ। রান্না চাপালে দুটোর গন্ধই বাড়ি মাত করে। আর সবচেয়ে বেশি মাতাল হয় সুহাসিনী। যেন প্রেমিকের গলার আওয়াজ পাওয়ার মতন—ইলিশ চিংড়ির গন্ধ তার মগজের ভিতর ঢুকে তাকে অস্থির উন্মনা করে তোলে।

অবশ্য সব মাছেরই গন্ধ আছে। বস্তি-বাড়ি। লাগালাগি ঘর। এক ঘরে ইলিশ আসে, আর এক ঘরে হয়তো চুনোমাছ রান্না হয়। সুহাসিনী ঠিক টের পাবে। শোল বোয়াল রান্না হলেও সুহাসিনী বলে দিতে পারে।

মোট কথা, গন্ধটাই তার বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। গন্ধের মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে সে যত বেশি অনুভব করে, একটা কিছুর গন্ধ তার ইন্দ্রিয়কে যত বেশি সজাগ সচেতন করে তোলে তেমন আর কিছু না।

এই জন্যই পাকা কাঁঠালের কথা বলা হল, ইলিশ মাছের কথা বলা হল। গন্ধ যত তীব্র, সুহাসিনী তত রোমাঞ্চিত, অভিভূত, উল্লসিত!

তা বলে কি আর খারাপ গন্ধ তার নাকে লাগে না! খুবই লাগে। ময়লার গন্ধ, কাঁচা ড্রেনের গন্ধ, ইঁদুর পচা বেড়াল পচা—অথবা সস্তায় পচা ভুসভুসে মাছ বাজার থেকে কিনে এনে কার ঘরে রান্না হচ্ছে—তখনও বাড়ি মাত হয়ে ওঠে। তখন আঙুল দিয়ে নাকটা চেপে ধরে রাখা ছাড়া সুহাসিনীর উপায় থাকে না। তখন আর সে রোমাঞ্চিত না, উৎফুল্ল না। বিরক্ত বিষণ্ণ হয়ে ভাবতে থাকে কখন একটা দমকা হাওয়া এসে দুর্গন্ধটা উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

আম-কাঁঠালের কি চিংড়ি-ইলিশমাছের সুগন্ধ যদি তার ইন্দ্রিয়কে একভাবে নেড়ে-চেড়ে দেয় তো এসব দুর্গন্ধও তাকে কম বিব্রত করে না।

আরো কতগুলি গন্ধ আছে, নাকে লাগা মাত্র সুহাসিনীর অনুভূতি ধারালো সচকিত হয়ে ওঠে। যেমন কেউ বেশ চড়া গন্ধের সাবান গায়ে মেখে চান করছে, কি কোন ঘরের কোন মেয়ে কি বৌ সুগন্ধ তেল মেখে চুল বাঁধছে বা মুখে স্নো ঘষছে পাউডার মাখছে।

তখনও সুহাসিনী জোরে জোরে শ্বাস টানে, এভাবে শ্বাস টেনে বেশ কিছুটা

শৌখিন গন্ধ বুকের ভিতর জমা করে নিয়ে তারপর এক সময়, দীর্ঘশ্বাস বললে কথাটা ঠিক হবে না, ঝড়ো হাওয়ার মতন প্রচণ্ড জোরালো একটা শ্বাস বুক থেকে বের করে দিয়ে এসব তেল সাবান স্নো পাউডারের গন্ধ থেকে নিজেকে মুক্ত করে। যেন আজ আর এসবের তার দরকার নেই। তারপর চুপ করে থাকে। ভাবে। সুহাসিনীর এই ভাবনাগুলির কথা পৃথিবীর কেউ টের পায় না। একমাত্র সে নিজেই জানে কী নিয়ে সে ভাবছে, কেন ভাবছে।

গন্ধের কথা গেল। এখন শব্দের কথায় আসা যাক। বাড়িতে এতগুলি ঘর। রান্নার শব্দ হাঁচি-কাশির শব্দ ঝগড়ার শব্দ হাসির শব্দ—ফটফট খড়মের আওয়াজ করে কেউ ঘরে ঢুকছে, রাগ করে কেউ কাঁসার বাসন ছুড়ে ফেলছে, কেউ গান গাইছে, ছেলের পিঠে দুম দুম কিল বসাচ্ছে কোন ঘরে, ছড়া কেটে ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে কেউ—তা ছাড়া রেডিওর শব্দ, কয়লা ভাঙার শব্দ, টিন পেটাবার আওয়াজ, পোয়াতি বৌ বমি করছে—তার প্রচণ্ড ওয়াক্ ওয়াক্, অথবা পেটের বেদনায় কেউ চেঁচাচ্ছে—জলে ছোট-বড় ঢেউ ওঠার মতন বাড়ীর সর্বত্র সরু মোটা ছোট বড় মাঝারি নানারকম শব্দ এখন তখন জেগে উঠছে, আবার ঢেউয়ের মতন সে সব এক সময় মিলিয়েও যাচ্ছে।

কিন্তু শব্দের মধ্যে সুহাসিনী তেমন কোন রস পায় না প্রেরণা পায় না। তার এক কান দিয়ে সব ঢোকে, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। কে খড়ম পরে হাঁটছে, কোন্ পোয়াতী বমি করছে, কে রাগ করে কাঁসার বাসন ছুঁড়ে মারল তাতে সুহাসিনীর কিছু এসে যায় না। এসব শব্দ শুনে কোন ছবি তার মনে জাগে না, কোন রং সৃষ্টি হয় না। সবই তার কাছে পুরনো একঘেয়ে।

তাই বলা হচ্ছিল, পাকা কাঁঠালের গন্ধ বা ইলিশমাছ রান্নার সুগন্ধ যেমন সরাসরি তার হৃদয় মন রসনা—এমন কি জঠরকেও স্পর্শ করে, গন্ধটি নাকে লাগার সঙ্গে সঙ্গে কাঁঠাল-কোয়ার সোনালী হলুদ রং বা বেশ লাল করে ভাজা তেল-চুপচপে ইলিশমাছের লোভনীয় টুকরোগুলি তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে, নাচতে থাকে এবং মনে মনে ক্ষীরের মতন ঘন মিষ্টি কাঁঠালের রস গরম ইলিশ ভাজা খেতেও তার আটকায় না, সেখানে শব্দ তাকে কিছুই দিতে পারে না, এই ধরনের কোন মোহ বাসনা বা অনুরাগ তার মনে সৃষ্টি করতে পারে না।

অথচ প্রতি মুহূর্তে কত রকম শব্দ হচ্ছে এ-বাড়িতে। কোন কোন গন্ধের মতন যদি অন্ততঃ একটা শব্দের প্রতিও তার টান থাকত লোভ থাকত মমতা

থাকত। শব্দকে স্থহাসিনী গ্রাহ্য করে না। মুখের ওপর মাছি বসলে যেমন বিরক্তি ধরে, তেমনি শব্দগুলি যখন একটার পর একটা কানে আসতে থাকে তখন তার ক্রোধ বিরক্তি ও ক্লান্তির শেষ থাকে না। হাত দিয়ে মাছি তাড়ানো চলে, কিন্তু এতগুলি ঘরের এত সব শব্দ সে দূর করবে কেমন করে। তখন কানের ছিদ্রের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে চুপ করে বসে থাকা কি শুয়ে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। সময় সময় তাই করতে হয় তাকে।

অথচ একটা আধটা শব্দ যে একদিন স্থহাসিনীর ভাল না লাগত এমন না। শব্দ শুনতে সে কান পেতে থাকত, কখন শব্দটা হবে তার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতেও আলস্য করত না।

এবং মজা এই যে, আজ যেমন গন্ধ ধরে ধরে স্থহাসিনীকে একটা কিছুর ছবি মনে মনে আঁকতে হয়, শব্দের ওঠা-নামা ধরে একটা জিনিসের রূপ চোখের সামনে কল্পনা করতে হয়, পাঁচ বছর আগে তা তাকে করতে হত না। তখন পৃথিবীটা তার কাছে বড় সহজ সরল ছিল। কেন না চোখ দিয়ে সব কিছু সে দেখতে পেত। কষ্ট করে অন্ধ কবার মতন কেবল শব্দ দিয়ে গন্ধ দিয়ে তাকে আম কাঁঠাল গরু ছাগল পোকা-মাকড় কি মানুষের চেহারা চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলতে হত ন।

কিন্তু ঈশ্বর কি আর সকলকে এক রকম সুখ দেয়। হুট করে সেবার বসন্ত হয়ে স্থহাসিনীর চোখ দুটো গেল। প্রাণে বাঁচল, কিন্তু চোখের জগৎ অন্ধকার হয়ে গেল।

বুঝুন, মাত্র উনিশ বছর বয়স, রূপ রস যৌবন নিয়ে গন্ধ নিয়ে, বাসনা বিলাস সোহাগ নিয়ে পৃথিবীটা চোখের সামনে জ্বলছিল। জ্বলতে জ্বলতে একদিন দপ্ করে নিভে গেল। তখন মনের অবস্থা কী দাঁড়ায়!

না, দোষ দেবে কাকে। ভাগ্যকে দোষ দিয়ে স্থহাসিনী আজ এই পাঁচ বছর গুম হয়ে আছে। ঘরের কোণায় আশ্রয় নিয়েছে। একটা ময়লা বিছানা, একটা জানালা। এই তার পৃথিবী।

চোখ যাবার পর গোড়ায় ক'দিন যে হাতড়ে হাতড়ে সে চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে উঠোনে গিয়ে না দাঁড়াত এমন না। তারপর সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে।

কেন না স্থহাসিনী বুঝতে পারল, পোড়ার বসন্ত কেবল তার চোখ দুটো নিয়েই ক্ষান্ত থাকে নি, তার মুখটাকেও পোড়া বেগুনের মতন কালো কুৎসিত করে রেখে গেছে।

সুহাসিনী কি আর আরশি দিয়ে নিজের চেহারা দেখেছিল ?

কথাটা তার কানে এসেছিল। বস্তি-বাড়ি। কত রকম কথা এঘরে ওঘরে হয়। তা বলে গলা চেঁচিয়ে কি কেউ এমন একটা কথা বলে ! তা হলেও, যত ফিসফিস করেই বলুক, সুহাসিনী ঠিক শুনতে পেয়েছিল।

তাই তার এক এক সময় ভাবতে ইচ্ছে করে, ঈশ্বর তার সঙ্গে বেশ ভাল রসিকতাই করল। উনিশ বছরে চোখের আলো নিভিয়ে দিল, কিন্তু কান দুটোকে কেমন প্রখর করে তুলল, নাকটাকে কী ভীষণ ধারালো করে দিল। কোন ঘরে এখন আলপিন পড়লেও সে শুনতে পায়, একটা ঘরে কেউ যদি, আম-ইলিশমাছ দূরে থাক, হোমিওপ্যাথি শিশি থেকে একফোঁটা ওষুধ ঢেলে খায় তো সুহাসিনী ঠিক গন্ধ পাবে।

রসিকতা ছাড়া কী। যার চোখ নেই তার নাকের কানের এত ধার কেন ? এতে তার কষ্ট বাড়ল কি কমল ? খুব কষ্ট পেয়েছিল সে পোড়া বেগুনের উপমাটা শুনে। যদিও দুঃখ করেই ফিসফিসে গলায় তারা বলাবলি করছিল— আহা, কী চোখ ছিল গো, মেয়েটার কী সুন্দর ভুরু দুটো ছিল, গোলাপের মতন টুসটুস করত দুটো গাল, ঠোঁট—আজ আর চেনাই যায় না, এমন মুখখানা এমন হয়ে গেল।

বুকের ভিতর একটা ধাক্কা লেগেছিল সুহাসিনীর, খুব ভয় পেয়েছিল সে। জানত তার চোখ দুটো গেছে, কিন্তু মুখেরও যে এমন সর্বনাশ হয়ে গেছে, সেদিন সে প্রথম জানল। তখনই হাতড়ে হাতড়ে ঘরে এসে ঢুকেছিল। তারপর আর একদিনও উঠোনে নামে নি, দরজায় দাঁড়ায় নি। এই বিছানা আর এই জানালা। আজ পাঁচ বছর। এখন তার বয়স চব্বিশ।

ভয়টা আর নেই, অথবা এই ক'বছরে ভয়টা পুরনো হয়ে গেছে। এখন আর চেহারা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। পোড়া বেগুন হলে একটা মেয়ের মুখ কেমন হয় তার একটা ছবি ক্রমাগত ভেবে ভেবে সে মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছে। অনেক দিন আগেই ঠিক হয়ে গেছে ছবিটা, এখন সেই ছবিও তার কাছে পুরনো।

কাজেই নতুন করে ভয় পাবার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

হ্যাঁ, কথা হচ্ছিল শব্দ নিয়ে। আজ যেমন কোন কোন গন্ধের ওপর তার ভীষণ টান, প্রেমে পড়ার মতন সে-সব গন্ধ নাকে লাগা মাত্র সে দুর্বল হয়ে পড়ে, জোর জোর শ্বাস টেনে গন্ধগুলি বুকে পুরে নেয়, তেমনি কোন কোন

শব্দ একদিন তাকে খুব টানত। আজকের মতন সব রকম শব্দের প্রতি যে তার বিদ্বেষ ছিল তা নয়, একটা দুটা শব্দ শুনতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতেও সে আলস্য বোধ করত না।

অথচ সেদিন চোখেও দেখতে পেত। আমটাকে দেখত কাঁঠালটাকে দেখত —পোকা মাকড় মানুষ ছাগল গরু গাড়ি ঘোড়া—উনিশ বছর ধরে সবই সে দেখেছিল। তাদের শব্দ শুনেছে, তাদের গন্ধ তার নাকে লেগেছে। তখন শব্দ গন্ধগুলি তার উপরি পাওনা ছিল।

যেমন যুগলকে সে চোখে দেখত, এ বাড়ির ছেলে, না-দেখার কোন কারণ ছিল না। যুগল বাজার নিয়ে ফিরছে, তাড়াহুড়ো করে গায়ে তেল মাখছে, কলতলায় গিয়ে বস্তি-বাড়ির আর পাঁচটা মানুষের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে চান করছে, যুগল ভাত খেতে বসল, খেয়ে উঠে বিড়ি টানতে টানতে গায়ে জামা চড়াল, গত তিন দিন নীল রঙের জামা চড়িয়ে কাজে বেরিয়েছে, আজ সাদার ওপর ফিকে বাদামী ডোরা-কাটা একটা শার্ট গায়ে দিয়ে সে বেরোল। সুহাসিনীও বাড়ির সদরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যতক্ষণ চোখে দেখা যায়, মানুষটাকে সে দেখল। যেন এতক্ষণ বাড়ির ভিতর তাকে ফেলে সুহাসিনীর আশ মেটেনি, এখন কেমন লম্বা লম্বা পা ফেলে যুগল হেঁটে চলে যাচ্ছে, কারো সঙ্গে কথা বলছে না, কোন দিকে তাকাচ্ছে না—চোখের পলক না ফেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে সুহাসিনীর এত ভাল লাগত। তেমনি যুগল যখন সন্ধেবেলা কাজ সেরে বাড়ি ফিরেছে। তার পায়ের শব্দ শুনতে সুহাসিনী কান পেতে থাকত। কান পেতে থেকে যুগলের হাসি শুনেছে কথা শুনেছে। যুগল যখন তাদের দক্ষিণের ভিটের ঘরে বসে বিড়ি টানত, জানালাটার কাছে গিয়ে সুহাসিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত, বিড়ির ধোঁয়ার গন্ধটা সুহাসিনীর ভাল লাগত। এ বাড়ির আরো কত মানুষ তো বিড়ি খায়—সেদিনও খেত, কিন্তু কারো ধোঁয়ার গন্ধ শুঁকতে কোন ঘরের জানালার কাছে গিয়ে কি সে দাঁড়িয়েছে ?

অর্থাৎ যুগলের সব কিছুই তার ভাল লেগেছিল। সকালের দিকে সাবান মেখে যুগল চান করতে পারত না। তাড়াহুড়োর সময়। সন্ধেবেলা কলতলায় বসে ধীরে-সুস্থে গায়ে সাবান ডলে সে চান করত আর গুনগুনিয়ে গান করত। গেলাসটা বাটিটা ধোওয়ার অছিলা করে সুহাসিনীও তখন পা টিপে টিপে কলতলায় চলে গেছে। বুক ভরে সে যুগলের গায়ের সাবানের গন্ধ নিয়েছে, দু'কান ভরে তার গুনগুন গান শুনেছে, আর চোখ ভরে মানুষটাকে দেখেছে।

চোখের দেখার সঙ্গে শব্দ-গন্ধগুলি তার উপরি পাওনা হত। হুঁ, সেদিন—যেদিন রূপ নিয়ে রস নিয়ে যৌবন নিয়ে—লোভ বাসনা আর প্রচুর রং নিয়ে শব্দ নিয়ে পৃথিবী তার চোখের সামনে জ্বলছিল, যুগলের পৃথিবীও জ্বলছিল, দুজনের চোখ-ঠারাঠারি হয়েছে, শব্দ না করে হাসাহাসি হয়েছে, খাটো গলায় কথা-বলাবলি হয়েছে, এমন কি গা ছোঁয়াও। তারপর, ঐ যে মাথার ওপর বসে আছে এক রসিক পুরুষ, ফুঁ দিয়ে সুহাসিনীর চোখের আলো নিভিয়ে দিল, পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেল।

তারপরও সুহাসিনী একটা মানুষের হাঁচি-কাশি শুনেছে, হাঁটা-চলার শব্দ শুনেছে, তার বিড়ির ধোঁয়ার গন্ধ সাবানের গন্ধও সুহাসিনীর নাকে লেগেছে—কিন্তু হাত পা নাক চোখ নিয়ে লম্বা ছিপছিপে গড়নের গৌরবর্ণ মানুষটা চিরজন্মের মতন সুহাসিনীর চোখের আড়ালে চলে গেল।

যেন এই জন্যই, নিজের চোখের জন্য যত না, একটা মানুষকে কোনদিন আর চোখ ভরে দেখতে পাবে না বলে সুহাসিনী বেশি কেঁদেছিল।

তার পর আস্তে আস্তে তার এই কান্না পুরনো হয়ে গেল। কেননা ক্রমেই সে বুঝতে পারছিল, চোখের আড়ালে চলে গেছে তার অর্থ যুগলকে চিরকালের জন্য সে হারিয়েছে। এক মাসের মধ্যে যুগল বিয়ে করে ফেলল। এই বাড়ির উঠোনেই কুশাসন কলাপাতা বিছিয়ে অনেক লোকজন নেমন্তন্ন খেয়ে গেল। সারাদিন শুধু হৈ-চৈ হল। রাত্রে ফুলশয্যা হল। বড় সুন্দর বৌ হয়েছে যুগলের, রাঙা টুকটুকে বৌ হয়েছে—অনেক শব্দ অনেক কথা সুহাসিনীর কানে এল।

সুহাসিনী বেশ বুঝতে পারছিল, তার চোখ গেছে পর থেকে নানারকম শব্দ গন্ধ দিয়ে তার মন ভরিয়ে তুলতে পৃথিবীর কোন কোন মানুষ উঠে পড়ে লেগেছিল। যেন এ-ও এক ধরনের রসিকতা।

যেন আগের চেয়েও বেশি সাড়া-শব্দ করে যুগল কাজ সেরে বাড়ি ফিরত, দৌড়-ঝাঁপ করে কলতলায় ছুটে যেত, ঝপ-ঝপ করে মাথায় জল ঢালত, আগের চেয়ে অনেক বেশি চড়া গন্ধের সাবান গায়ে মাখত। আর সারাক্ষণ কমলা কমলা। হুঁ, তার বৌয়ের নাম। তা-ও সুহাসিনীর কানে এসেছিল। কমলা রান্না হল? কমলা আমাকে একটু চা করে দাও। কমলা, দেখ তো এই মাথার তেলটা কেমন হল, ভারি সুগন্ধ, তোমার জন্য নিয়ে এলাম। কমলার খুশি গলার খিলখিল হাসি এই উত্তরের ভিটের অন্ধকার ঘরে বসে

সুহাসিনী শুনেছে। এবং একটু রাত হতে ও ঘরের ভুরভুরে তেলের গন্ধ এ ঘরে ভেসে এসেছে।

কিন্তু ক'দিন এসব শব্দ গন্ধ নতুন থাকে? একদিন পুরনো হয়ে গেল।

পুরনো হতে হতে এখন এমন হয়েছে, এই সব শব্দ-গন্ধে ঘেন্না ধরে গেছে সুহাসিনীর। যেন তার থুথু ছিটোতে ইচ্ছা করে। সময় সময় একলা ঘরে বসে সে থুথু ছিটোয়। বা দরকার হলে, যাতে কোনরকম শব্দ-গন্ধ এ ঘরে না আসে, হাতড়ে হাতড়ে উঠে গিয়ে জানালার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দেয়। তারপর গুম হয়ে বসে থাকে।

তবে হাঁ, কোন ঘরে যদি কাঁঠাল আসে, ইলিশ মাছ রান্না হয়, সুহাসিনী তখন জোর জোর শ্বাস টানে। এই একটা দুটো গন্ধ তাকে তৃপ্তি দেয় সান্ত্বনা দেয়। তাছাড়া এ বাড়ির অন্য সব গন্ধ, গন্ধ এবং শব্দ তার কাছে বিষের মতন।

জ্যৈষ্ঠ মাস। এ ঘরে ও ঘরে আমটা কাঁঠালটা দু-চার টুকরো ইলিশমাছ, দুটো চারটে হলেও বাগদা চিংড়ি আসছে। বস্তির মানুষ পয়সা কোথায় যে, রোজই এসব ভাল ভাল জিনিস পাবে, বেশি করে খাবে। তা হলেও এক-আধ দিন করে সব ঘরেই এটা-ওটা আসছে।

আর সুহাসিনীর নাকও এমন হয়ে গেছে, কোন্ ঘরে কোন্টা এল তার এই কোণার ঘরের ময়লা বিছানায় শুয়ে বসে থেকে সে ঠিক টের পায়। ঠিক বলে দিতে পারে—এ ঘরে আজ আনারস এসেছে, ও ঘরে চিংড়িমাছ এল।

একটি ঘর ছাড়া। তাই সুহাসিনী ক'দিন ধরে ভাবছে। যুগলের ঘরে এ বছর এখন পর্যন্ত আম কাঁঠাল, একটু চিংড়ি কি ইলিশমাছ এল না। গত বছরও আসে নি। সে-রকম কোন গন্ধই ওদিকের ঘর থেকে আসছে না। একদিনও না। ব্যাপারটা কী? এসব ভাল ভাল খাদ্য, কথায় বলে বছরের নতুন জিনিস, সব ঘরেই একদিন দুদিন করে যখন আসছে, যুগল কেন তার আদরের বৌকে এনে খাওয়াচ্ছে না? খটকা লাগার মতন কথা। গেল বারই সুহাসিনীর চোখ দুটো নষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে করে ফেলে প্রথম বছর দুই যুগল বৌয়ের জন্য খুবই খরচায় নেমে গিয়েছিল। রোজই একটা না একটা নতুন জিনিস বৌকে এনে দিয়েছে। কেবল কি তেল সাবান স্নো ক্রিম, দুদিন পর পর নতুন শাড়ি নতুন ব্লাউজ নতুন সায়া এসেছে কমলার জন্য। হাঁক-ডাক শোনা গেছে কত— কমলা, আসছে মাসে তোমায় পাথর-সেট দুল গড়িয়ে দেব, পুজোর সময় নতুন

হার গড়িয়ে দেব। আর খাওয়া-দাওয়া? যেন কী এনে বৌকে খাওয়াবে সে দিশা করতে পারত না। রোজ কাঁঠাল এসেছে ল্যাংড়া আম ফজলি আম এসেছে ওঘরে। ইলিশমাছ চিংড়িমাছ মাংস দৈ রাবড়ি রসগোল্লা—ভাল পয়সা পায়, চাকরিটা মোটামুটি ভাল, মা আর ঐ এক ছেলে—ঘরে আর খাইয়ে কে, তারপর তো বৌ এল—যেন দু হাতে খরচ করে যুগলের আশ মিটত না। হুঁ, বিয়ের পর প্রথম দু বছর। এঘরে বসে সুহাসিনী সব টের পেয়েছে।

কিন্তু তারপর সব যেন কেমন ফিকে হয়ে গেল। কমলা, এটা এনেছি তোমার জন্য, কমলা কাল তোমাকে ওটা এনে দেব—এসব হাঁক-ডাক কমে গেল। যেন হঠাৎ বৌয়ের আদরটা কমে গেছে। যেন একটু সকাল সকাল বৌ পুরনো হয়ে গেল। তাই কি?

তাই আজ ক'দিন ধরে খুব ভাবছে সুহাসিনী। কারণ কি? একটা তো মোটে বাচ্চা হয়েছে ওদের। তা-ও এদিকে হয়েছে। বিয়ের পর প্রায় পাঁচ বছর পার করে। ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দটা সুহাসিনী খুব শোনে। চিৎকারটা যখন অসহ্য লাগে, তখন হাতড়ে হাতড়ে উঠে গিয়ে ওদিকের জানালার পাল্লা দুটো বন্ধ করে দেয়। যুগলের ছেলের চিৎকার বলে না, সব চিৎকারের বেলায়ই সুহাসিনী তা করে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এত সহজে কারো বৌ পুরনো হয়?

ওঘরের স্নো পাউডার তেল সাবানের গন্ধও আর নাকে লাগছে না।

না লাগুক, বোঝা যায় যুগল বৌকে এসব কিছু আর এনে দিচ্ছে না। অবশ্য স্নো ক্রিম সুগন্ধী তেল সাবানটা বড় কথা না। এ সব ছাড়াও মানুষকে ভালবাসা যায়। এসব না মেখেও মানুষের দিন কাটে। কতজনই তো বৌকে এসব কিনে দিতে পারে না, পয়সার অভাব, বৌয়েরা সাদা নারকেল তেল মাথায় মাখে। মুখের চামড়া নরম রাখার জন্য সর্ষের তেল মাখে। তা বলে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি ভালবাসা চলে যায়?

কিন্তু যুগলের তো তেমন একটা অভাব নেই।

আচ্ছা, না দিক এনে স্নো ক্রিম তেল পাউডার, সুহাসিনী চিন্তা করে, এসব নিয়ে খুব একটা ভাববার কিছু নেই। ছেলের মা হয়েছে, এখন হয়তো যুগলের বৌ আর এত সাজগোজ পছন্দ করে না। কিন্তু তা বলে, বছরের আমটা কাঁঠালটা, একটু ইলিশমাছ একটু চিংড়িমাছ—এক আধ দিনও যুগল বৌকে এনে খাওয়াবে না? ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত লাগে সুহাসিনীর।

মস্ত অভাবের সংসারেও তো এমনটা হয় না। ধার-কর্জ করে হলেও মাসে অন্তত একদিন বৌকে ছেলেমেয়েকে এটা ওটা এনে খাওয়ায়। কিন্তু যুগল এ কী করছে, হঠাৎ এমন কঠিন হয়ে গেল মানুষটা?

ভাবনাটা গুরুতর। গুরুতর এইজন্য, ভাল করে পাঁচ বছর না ঘুরতেই যদি বৌয়ের ওপর অরুচি ধরে যায়, বৌ পুরনো হয়ে যায়, বৌকে একফোঁটা আদর করতে ইচ্ছে না করে তো আর দু বছর কি চার বছর পরে যুগল এই বৌকে কী করবে, মেরে তাড়িয়ে দেবে? আর একটা বিয়ে করবে?

কথাটা ভাবতে কেমন গা শিরশির করে। না, সুহাসিনী স্বার্থপর না— হিংসুটে না। তার অন্ধ হওয়ার এক মাসের মধ্যে যুগল বিয়ে করে এই বৌকে ঘরে এনেছিল, তা বলে সুহাসিনী কি চাইবে যে বৌটা দুঃখে থাক, যুগল তাকে অনাদর অবহেলা করুক? এতটা নীচ আত্মা সুহাসিনীর না। তার কপাল ভেঙেছে ভাঙুক, ঈশ্বর তার সঙ্গে রসিকতা করেছে করুক, তা বলে কমলা দুঃখে থাকবে, স্বামীর আদর সোহাগ পাবে না, এর মধ্যেই পুরনো ন্যাতার মতন যুগল তাকে হাত দিয়ে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে—এ একটা কথাই নয়। যদি এমন হয়, যুগল অন্যায় করছে, ভয়ানক পাপ করছে।

চিন্তা করে সুহাসিনী গুম হয়ে থাকে। তার হাত পা কেমন অসাড় হয়ে যায়। বুকের ভিতর ঢিপ-ঢিপ করে।

ক'দিন ধরেই এমন হচ্ছিল। এটা কি অসুখ? যদি অসুখ বলা হয় তো মানুষটা যে বেশ কিছুকাল থেকেই অসুস্থ। চোখের সামনে তাল তাল অন্ধকার নিয়ে পাঁচ বছর একটা ঘরে আটকে থাকা, একটু আলো না বাতাস না, কারো সঙ্গে একটা কথা না। দেউলে কি মনে হবে এই সুহাসিনী পঁচিশ বছরের যুবতী? দাঁত-পড়া মানুষের মতন গাল দুটো তুবড়ে গেছে, চোখ দুটো গর্তে ঢুকে পড়েছে, দড়ির মতন হাত পা, একটু বেশি নড়াচড়া করতে গেলে মাথা ঘোরে, পা-হাত ঝিন্-ঝিন্ করে, একটু বেশি সময় বসে থাকলেও যেন হাঁপ ধরে— কাজেই অধিকাংশ সময় শিয়রে একটা জানালা দিয়ে ময়লা বিছানাটায় সে শুয়ে থাকে। শুয়ে থেকে তার আকাশ-পাতাল ভাবনা।

তা এভাবে তো কেটে যাচ্ছিল দিন।

কিন্তু কাল থেকে, কাল না পরশু থেকেই যেন এই উপসর্গগুলি দেখা দিয়েছে। সুহাসিনী ঠিক বুঝতে পারছিল না, এমন হল কেন। তবে ক'দিন থেকে দক্ষিণের

ভিটের ঘরের একজোড়া স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে সে খুব মাথা ঘামায় নি। ঐ যুগলকে নিয়ে, যুগলের বৌকে নিয়ে, এত মাথা ঘামাচ্ছিল বলে কি তার মাথার ভিতরটা শূন্য হয়ে গেল, মরুভূমির মতন হয়ে গেল, না কি বাড়িটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল? যেন কোন লোকজন নেই, ঘর দুয়ার ছেড়ে সব কোথায় চলে গেছে। কেন না একফোঁটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে না সে। টিকটিকিটা পর্যন্ত ডাকছে না। টিকটিকিটা ডাকছে না, চড়ুইপাখিগুলির কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। অথচ দিন-ভর ওরা উঠোনের ওপাশটায় পেঁপে-ঝোপের কাছে কিচমিচ করত। ব্যাপারটা কী? এ-বাড়ির লোকজনের সঙ্গে চড়ুই-টিকটিকিগুলিও কি কোথাও সরে গেল?

তাছাড়া সুগন্ধ হোক দুর্গন্ধ হোক, কোনরকম গন্ধও তো সুহাসিনী টের পাচ্ছে না। তেল সাবানের হোক, রান্নার গন্ধ হোক, কি নর্দমার গন্ধ হোক— রাতদিন যেখানে বস্তি-বাড়ির বাতাস গন্ধে গন্ধে বোঝাই হয়ে থাকে সেখানে কোন গন্ধ সুহাসিনীর নাকে লাগছে না? এ কখনো সম্ভব?

কেমন ভয় করছিল তার। এমন তো তার কোনদিন হয়নি। চোখ দুটো যাবার পরেও তো দুবার বড় বড় অসুখে সে ভুগে উঠেছে। একবার টাইফয়েড হয়েছিল, একবার কলেরার মতন হয়েছিল। দুবারই খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মাথার ভিতরটা তো এমন ফাঁকা দুর্বল মনে হয় নি। সব রকম শব্দ তার কানে এসেছে, সব রকম গন্ধ নাকে লেগেছে।

আর এই দুদিন যাবৎ তার কী হয়েছে। তার যেন মনে হচ্ছে সমুদ্রের তলায় সে বসে আছে। জলের সোঁ সোঁ শব্দের মতন কানের ভিতর একটা বিশ্রী শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। কোন গন্ধও সে টের পাচ্ছে না। পরীক্ষা করার জন্য বাঁ হাতের তেলোটা কয়েকবার নাকের কাছে তুলে ধরেছে। জোরে জোরে শ্বাস টেনেছে। তার বাঁ হাতের তেলোয় সর্বদাই একটা লেবু লেবু গন্ধ লেগে থাকে। এমনি। লেবু না ধরলেও এমন একটা গন্ধ টের পাওয়া যায়। কিন্তু আজ সুহাসিনীর নাকে কোন গন্ধই লাগল না। অথচ নিজের হাত। বিমূঢ় হয়ে গেল সে।

জিনিসটা আরো বেশি পরিষ্কার হয়ে গেল টেঁপির কথা শুনে। টেঁপি আজ সকালে বাজার থেকে ছোট দেখে একটা পাকা কাঁঠাল কিনে এনেছে দিদির জন্যে, আর আট টাকা কেজীর দেড়শো ইলিশমাছ। তিন টুকরোর বেশি ওঠেনি। টেঁপি ঘরে ঢুকেই বলছিল, 'দিদি তোর জন্য কাঁঠাল এনেছি, ইলিশমাছ এনেছি।'

কিন্তু ফ্যাকাসে চোখ দুটো সুহাসিনী এমন করে মেলে ধরে রেখেছিল, টেঁপি

যে ঘরে ঢুকল, কথা বলল, তার পায়ের শব্দ বা কথা, কোনটাই যেন সুহাসিনী শুনতে পাচ্ছিল না। তা না হলে কাঁঠাল ইলিশমাছের নাম শুনলেই সুহাসিনীর মুখে হাসি ফোটে, শোয়া ছেড়ে উঠে বসে। বছরে ঐ একদিন দুদিনই দিদিকে এনে এই দুটো জিনিস খাওয়ায় টেঁপি, এই দুটো জিনিস দিদির প্রাণ। তার বেশি সে এই দিদিকে খাওয়াতে পারে না। সাবানের কারখানায় সামান্য চাকরি। কত আর মাইনে। দু বোনের কোনরকমে ডাল-ভাত খাওয়া জোটে।

অবশ্য এই ছোট বোনটা আছে বলেই সুহাসিনী কোনরকমে খেয়ে বেঁচে আছে। দুটি বোন ছাড়া তিন কুলে তো আর কেউ নেই তাদের। টেঁপি না থাকলে কবে সুহাসিনী মরে হেজে ভূত হয়ে যেত।

যাই হোক, এখন টেঁপি ঠিক বুঝতে পারছিল, দিদি তার কথা বোঝেনি।

'এই দিদি!' বিছানার ওপর হুমড়ি খেয়ে টেঁপি প্রায় চিৎকার করে উঠল।

'কি বলছি, শুনছিস?'

যেন এবার সুহাসিনী বুঝতে পারল টেঁপি ঘরে ঢুকেছে, তাকে কিছু বলছে।

'কি বলছিস?' সুহাসিনী ঘাড়টা তুলে ধরল।

'তোর কাঁঠাল এনেছি, ইলিশমাছ এনেছি।' এত জোরে টেঁপি কথাটা বলল, বস্তির সব মানুষের শোনার কথা। 'কাঠাল, কাঁঠাল, ইলিশমাছ ইলিশ-মাছ।' তারপরও চেঁচিয়ে দুবার তিনবার করে টেঁপি শব্দ দুটো উচ্চারণ করল।

এবার সুহাসিনী বুঝল। হাত বাড়িয়ে দিল। কাঁঠালটা দিদির বিছানার পাশে রাখল টেঁপি। মাছের ঠোঙাটা অবশ্য হাতেই ধরে রাখল। কিন্তু সেটাও হাত বাড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করল সুহাসিনী। টেঁপি তখন ঠোঙাটা সুহাসিনীর নাকের কাছে ধরল। সুহাসিনী জোরে জোরে শ্বাস টানল। তারপর ফ্যাকাসে চোখ দুটো অসহায়ের মতন মেলে রেখে সুহাসিনী মাথাটা দুবার নাড়ল।

'কোন গন্ধ পাচ্ছি না রে টেঁপি।'

'কাঁঠাল? কাঁঠালটার গন্ধ পাচ্ছিস না?—পাকা কাঁঠালের গন্ধে তো ঘর ভরে গেছে।' কেমন যেন একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে টেঁপি কাঁঠালটা দিদির নাকের কাছে তুলে ধরল।

সুহাসিনী জোর শ্বাস টানল। তারপর ঘাড়টা সরিয়ে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

'নাঃ কোন গন্ধই লাগছে না আমার।'

মুখটা কালো হয়ে গেল টেঁপির। 'গন্ধ টের পাচ্ছিস না, কানের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার না করলে কোন কথাও যে বুঝতে পারছিস না দেখছি।'

একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল সুহাসিনী। তারপর আস্তে বলল, 'মনে হয় চোখের মতন নাক কান দুটোই আমার নষ্ট হয়ে গেল।'

'না; তা হবে কেন।' মুখ ভার করে টেঁপি বলল, 'শরীরটা একটু বেশি খারাপ হয়েছে, মাথাটা দুর্বল হয়েছে, এই জন্যই এমনটা হচ্ছে।' একটু চুপ থেকে পর টেঁপি বিড়বিড় করে উঠল 'দেখি, সামনের মাসে টাকা পেলে একবার ডাক্তার দেখাতে হবে।' কথাটা সে খুব আস্তে বলল বলেই সুহাসিনী আর শুনল না। না হলে সুহাসিনী তখন বলত, কী হবে আর আমাকে ডাক্তার দেখিয়ে, একটা অন্ধ মেয়ের জীবনের দাম কী।

রান্নাবান্না করে তারপর নিজে খেয়ে দিদির ভাত-তরকারিটা তার বিছানার পাশে বেড়ে রেখে ঢেকে-ঢুকে, রোজ যা করে টেঁপি, কারখানায় চলে গেল।

সুহাসিনীর খেতে অনেক বেলা হয়। সে তো আর কাজে যায় না। কাজেই খাওয়ার তাড়া থাকে না।

কিন্তু আজ তার খেতে একেবারেই ইচ্ছে করছিল না। অথচ হাতড়ে হাতড়ে ঢাকনা সরিয়ে সে টের পেয়েছে, তিন টুকরো ইলিশমাছের দু টুকরোই তার জন্যে রেখে গেছে, একটা বাটি ভরতি করে কাঁঠালের কোয়া রেখে গেছে।

সুহাসিনী দুবার মাছের বাটি থেকে মাছ তুলে নাকের কাছে ধরেছে, জোরে জোরে শ্বাস টেনেছে, তারপর আবার মাছটা বাটিতে রেখে দিয়েছে। দুটো কাঁঠালের কোয়া তুলে নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকতে চেষ্টা করেছে, তারপর আবার বাটিতে রেখে দিয়েছে।

কেমন যেন পাথরের মতন স্থির বোবা হয়ে শুয়ে রইল সে।

তার হাত নড়ছিল না, মাথা নড়ছিল না। পাথরের মতন স্থির হয়ে থেকে সে ভাবছিল, যদি গন্ধই না পেলাম তো এই ইলিশমাছ, এই কাঁঠাল খেয়ে লাভ কী। বেদনায় হতাশায় তার ফ্যাকাসে চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। চোখ দুটো চকচক করতে লাগল।

তার চেয়ে যদি যুগলের বৌকে এই মাছ কাঁঠাল পাঠিয়ে দেওয়া যেত! তার নাক আছে চোখ আছে জিভের স্বাদ আছে—কিছুই নষ্ট হয়নি, কত রস করে খেত মেয়েটা। যুগল যে কিছুই এনে দিচ্ছে না কমলাকে।

যুগলের চিন্তায় কমলার চিন্তায় সুহাসিনীর ফাঁকা মাথাটা ভরে উঠল।

বেলার মনে বেলা গড়াতে লাগল। কিছুতেই যুগলের চিন্তাটা তার মাথা থেকে সরছিল না। যেন যুগল তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। অবশ্য বৌটার

খারাপ অদৃষ্টের কথা ভাবতে গিয়েই সে সঙ্গে সঙ্গে যুগলকেও এত ভাবছিল। অন্যায় করছে যুগল। পাপ করছে।

তারপর এক সময়, তখন বেলা আর বড় নেই, গাছের মাথায় রোদ উঠে গেছে, পেটের ক্ষুধার জন্যই হোক বা নিয়ম রক্ষার জন্যই হোক, সুহাসিনী হাতড়ে হাতড়ে থালার ঢাকনা সরিয়ে ঝোল দিয়ে ভাত মেখে দু গরাস মুখে তুলল। এক টুকরো মাছ ভেঙে মুখে দিল। কিছুই স্বাদ পাচ্ছিল না। চোখ কান নাকের সঙ্গে জিভটাও অসাড় হয়ে গেছে। অর্ধেক খেল অর্ধেক ভাত পাতে পড়ে রইল। দু টুকরো মাছের দেড় টুকরোই বাটিতে থেকে গেল। কাঁঠালের কোয়া খেল ঠিক তিনটা। বাকি সব থেকে গেল।

চোখ নেই, তাই সুহাসিনী দেখল না ভাতের ওপর কাঁঠালের ওপর মাছি বিজবিজ করছিল।

কিন্তু সেটা বড় কথা না, তখন একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটে গেল সুহাসিনীর ঘরে, তার ময়লা বিছানার কাছে, অলৌকিকও বলা চলে। অবিশ্বাস্য হত অবশ্য বাইরের মানুষের চোখে। যদি তারা কেউ জিনিসটা চোখে দেখত। কিন্তু সুহাসিনীর মনে যেন ক্রমেই এমন একটা বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছিল। যুগল আসবে, একদিন না একদিন সুহাসিনীর কাছে আসবে। যদিও ঘরে বৌ রেখে তার কাছে চলে আসা যুগলের অন্যায় হবে পাপ হবে—তা হলেও সুহাসিনীর মাথায় এই চিন্তাটা প্রায় শিকড় গেড়ে বসেছিল।

তাই হল তখন। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

যুগল তার বিছানার ওপর কেমন যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। উত্তেজনায় উচ্ছ্বাসে সুহাসিনী কাঁপতে কাঁপতে রোগা হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল। যুগল জিভ দিয়ে সুহাসিনীর ঠোঁট চাটছিল থুতনি চাটছিল। তার মুখে গাল ঠেকিয়ে সুহাসিনীও তাকে একটু আদর করল, চুমু খেল, কিন্তু আবার অনুযোগ করতেও ছাড়ল না। 'এটা ঠিক হচ্ছে না যুগল, এমনটা করা কিন্তু তোমার উচিত না। আমি হিংসুক নই, স্বার্থপর নই, —তা হলে তোমাকে এত কথা বলতাম না। কমলাকেও আদর করবে। পরের মেয়ে ঘরে এনেছ—তুমি যদি তাকে না দেখ, কে দেখবে—আমার লক্ষ্মী আমার সোনা, আমার তো কিছু নেই, অন্ধ মানুষ, স্বাস্থ্য গেছে রূপ গেছে—তা বলে ঘরের বৌকে—'

কথাটা সে শেষ করতে পারল না, টেঁপি ঘরে ঢুকল। কারখানার কাজ

সেরে এই তার ফেরার সময়। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই কপালে চোখ তুলে টেঁপি চিৎকার করে উঠল! 'কী করছিস দিদি, এ তুই কী করছিস!'

কেমন ভ্যাবাচেকা খেয়ে সুহাসিনী তার দিকে ঘাড়টা ফিরিয়ে ধরল।

'ওটা ভোম্বলদের কুকুর।' দিদির কানের কাছে মুখ নিয়ে টেঁপি সমান জোরে চেঁচাতে লাগল। 'ইস্, এটার গায়ে ঘা আছে, এমন করে গলা জড়িয়ে ধরছিস, যা যা—' টেঁপি কুকুরটাকে তাড়া করল। 'মাছের গন্ধ পেয়ে একেবারে তোর বিছানায় উঠে এসেছিল।' তাড়া খেয়ে কুকুরটা বেরিয়ে গেল।

সুহাসিনী কিছুই বলছিল না। তার শিথিল রুগ্ন হাত দুটো বিছানায় নেমে এল। ফ্যাকাসে চোখের কোণা বেয়ে দু ফোঁটা গরম জল টপ টপ করে ঝরে পড়ল।

বন্ধুপত্নী

এই গল্প আমার স্ত্রী রেবাকে নিয়ে হওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু তা হয়নি। হলো আর-একজনকে নিয়ে, বিশ্বাস করা যায় না এমন অদ্ভুতভাবে। এক বর্ষার রাত্রে।

বলবেন, এমন হওয়া উচিত না। উচিত-অনুচিতের তত্ত্ব আলোচনা করলে অবশ্য গল্প হয় না। উচিত তো না-ই আমার স্ত্রী রেবার কাহিনীও আপনাদের কানে তোলা। কিন্তু উপায় কি।

রেবাকে নিয়ে আরম্ভ করা যাক।

হ্যাঁ, এক গ্রীষ্মের ছুটিতে ও আমার কাছে এসেছিলো। এই শেষ আসা। আমাদের বিয়ের পর এক বছরের মধ্যে অবশ্য আরো দু-তিনবার রেবা ছোটো-বড়ো ছুটিগুলো আমার কাছে এসে কাটিয়ে গেছে! যেমন পুজোর একমাস, বড়োদিনের সাত দিন, গুডফ্রাইডে—ইস্টার মনডে—পয়লা বৈশাখ—সংক্রান্তি ইত্যাদি মিলিয়ে ন'দিন। আর-এক জায়গায় ওর চাকরি। স্কুলের টিচার। আমি আছি কলকাতায়। আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না বছরে দু-বার তিনবার ওর কাছে ছুটে যাওয়া। চাকরিটাই এমন। বিয়ের সময় আঠারো দিনের ছুটি ব'লে ক'য়ে ওপরওয়ালার কাছ থেকে মঞ্জুর করিয়েছিলাম। বছর না পুরতে আবার ছুটি চাওয়া তো অসম্ভবই, বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও শিগগির আর ছুটি মিলতো কিনা সন্দেহ। আপিসে

এমন লোকও আছে যাদের তিন কি সাড়ে তিন বছর পার হ'য়ে গিয়েও ছুটি মিলছে না। হাব-ভাব দেখে মনে হয় তাদের ছুটির দরকার নেই। দরকার কি আর হয় না! হয়তো একবার—দু-বার—তিনবার আবেদন-নিবেদন ক'রে যখন বুঝেছে একটানা একমাস কি একুশ দিন কর্মচারীদের অদর্শন তাঁর পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব, প্রায় হৃদয়বিদারক ঘটনার মতো, তখন কর্মচারীরা ওপরওয়ালার কাছে ছুটি চাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। অসুখ-বিসুখ? সে-কথা অবশ্য আলাদা। খুব বেশিদিন রোগে ভুগে কি ঘন-ঘন সর্দি-কাশি-পেটের অসুখে কামাই ক'রে কে কবে মার্চেট আপিসে চাকরি রাখতে পেরেছে আপনাদের অজানা নেই।

রেবা এ-সব বুঝতে পেরেছিলো।

হ্যাঁ, আমার এবং আমার চাকরির অবস্থা।

শেষবার, অর্থাৎ সামারের ছুটিতে এসে মুখ কালো ক'রে ও বলছিলো আর খুব শিগ্‌গির তার পক্ষে কলকাতায় আসা সম্ভব হবে না, পুজোতেও না, ট্যুইশনি নিয়েছে। তা ছাড়া, সব চেয়ে বড়ো কথা, বার-বার আসা-যাওয়া ক'রে ক'মাসেই সে ঋণগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছে। স্কুলের চাকরি। কত আর মাইনে দেয় কর্তারা। সুতরাং রেলভাড়া বাবদ যদি দু-চার মাস পর-পর পঁচিশ-ত্রিশ টাকা বেরিয়ে যায় তবে তার ভাত খাওয়া হয় না। 'আর, তোমার পক্ষেও সম্ভব না শিগ্‌গির বেনারস যাওয়া। সুতরাং—'

সুতরাং এক চালার নিচে থেকে এক হাঁড়ির ভাত খেয়ে দাম্পত্য-জীবন কাটানো শিকেয় তোলা রইলো।

কি, আমি সাহসই পাইনি রেবাকে প্রস্তাব দেওয়ার যে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে তুমি এখানে থাকো।

'আমার ট্রেনিং পাস না-করাটা কত বড়ো ভুল হয়েছে আজ বুঝতে পারছি।' রেবা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছছিলো, 'আমি কী জানতাম না বিয়ের পর এ-অবস্থা হবে। কিন্তু কাকু তো আর তা দেখেননি, মন্ত্র পড়িয়ে কোনোমতে পার করিয়ে দেবার জন্যে চোখে ঘুম ছিলো না। আর থাকবেই-বা কী ক'রে। আমি বাড়তি লোক, নিজের এতগুলো সন্তান, চাকরিও তেমন হাতিঘোড়া কিছু না। বাবা মরবার পর ওঁর সংসারে আমাদের যেদিন ঠাঁই নিতে হয়েছিলো, সেদিনই জানতাম কত বড়ো অবিচার করা হ'লো আর-একটা লোকের ওপর। তবু তো তিনি ধারকর্জ ক'রে আমার পরীক্ষার ফীজ্‌ যোগাড় করলেন। না হ'লে বি. এ. পাস করাই আমার কপালে ঘটতো না।'

এই অবধি এসে রেবা থেমেছিলো।

'বেশ তো, তুমি না-হয় ট্রেনিংটা পাস ক'রে নাও, আমি দেখি ইতিমধ্যে চেষ্টা-চরিত্র ক'রে কলকাতার কোনো ইস্কুলে যদি তোমার একটা—'

এত বড়ো চোখ করেছিলো স্ত্রী। হ্যাঁ, বিয়ের পর দ্বিতীয়বার বড়োদিনের ছুটি কাটাতে যখন ও আসে।

'অদ্ভুত স্বার্থপর তুমি।' মনে হয়েছিলো বুঝি সেদিনই সে বাক্স গুছিয়ে আবার বেনারস রওনা হয়। বললো, 'এতটা নীচ হ'তে আমি পারবো না। চাকরি পেয়ে মাকে নিয়ে সেখানে আলাদা বাসা করেছি, কিন্তু তা ব'লে কাকুর পরিবারের ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ জলে ভাসিয়ে দিয়ে আমি স্বামী-সঙ্গ করতে আজই এখানে ছুটে আসবো—ম'রে গেলেও তা পারবো না। তারপর মা? মা-ও একটা সমস্যা! রোজ সন্ধ্যায় বিশ্বেশ্বরের মন্দির দর্শন করতে না পারলে ম'রে যাবে—কলকাতায় এসে তার পক্ষে থাকা অসম্ভব, বিয়ের রাত্রেই আমার কানে-কানে বলছিলো।'

আমি চুপ ছিলাম। কাকুর পরিবার। মা। বিশ্বেশ্বরের মন্দির। ট্রেনিং নেওয়া।

গুডফ্রাইডের ছুটিতে ও এলো।

সে-বার কলকাতার জলে ওর নিজের বদ্‌হজম, গা-হাত ব্যথা এবং এ-সব অস্বস্তির দরুন রাত্রে অনিদ্রা।

আমি বললাম, 'না-হয় কালকের মেলেই তুমি ফিরে যাও, আরো তো ছুটির তিন-চার দিন আছে। সেখানে গিয়ে একটু রেস্ট্ নিয়ে তারপর কাজকর্ম আরম্ভ করতে পারবে।'

তিন দিন না। ছুটির একদিন হাতে রেখে ও ফিরে গেছে।

তারপর গ্রীষ্মের ছুটিতে এসে প্রথম দু-দিন ওর ব্যস্ততার মধ্যে কাটলো। এটা-ওটা কেনাকাটা করলো—দোকানে-দোকানে ঘুরে। ওর জুতো শাড়ি, বিধবা মা-র জন্যে কাপড়চোপড়, সেখানে ঘরের দরজা জানলার পর্দাগুলো ছিঁড়ে গিয়েছিলো, তাই নতুন পর্দা কেনা হ'লো কুড়ি টাকার। একটা ইলেকট্রিক স্টোভ, বড়ো স্টীলের ট্রাঙ্ক, দুটো চামড়ার স্যুটকেস এবং তিনটে মাঝারি সাইজের পাপোশ। টুকিটাকি জিনিসও বিস্তর ছিলো। সাবান তেল স্নো ক্রিম পাউডার রাইটিং-প্যাড জেলির শিশি মাখনের টিন এবং কিছু ওষুধপত্র। ওষুধগুলো ওর নিজের জন্য কি মা-র জন্য আমি প্রশ্ন করিনি। করবো কি। সারাদিন ঘুরে জিনিসপত্র কেনাকাটা

ক'রে ঘরে ফেরার পর এমন ক্লান্ত হ'য়ে ও বিছানায় এলিয়ে পড়েছিলো যে কাছে গিয়ে কথা বলতে আমার সাহসে কুলোয়নি। হ্যাঁ, ক্লান্তি ওর চোখে-মুখে বেশি প্রকট হ'য়ে উঠেছিলো। এবং পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খেতে ব'সে ও আসল কথাটা তুললো। খরচপত্র। দু-চার মাস পর-পর এ-ভাবে কলকাতায় স্বামীর কাছে আসতে হ'লে ও সর্বস্বান্ত হ'য়ে পড়বে। সুতরাং আর শিগ্‌গির—

গ্রীষ্মের ছুটির তিনদিন আমার কাছে কাটিয়ে পঁচিশ দিন হাতে রেখে রেবা ফিরে গেলো। সত্যি তার বিশ্রামের দরকার। স্কুল খুললে আবার গলা ফাটিয়ে চিৎকার ক'রে মেয়েদের আকবর বাদশা আর তৈমুরলঙের জীবনী শেখাতে হবে।

আমার জুতো নেই, গেঞ্জি ছিঁড়ে গেছে, একটিমাত্র শার্ট বাড়িতে সাবান দিয়ে কেচে কোনোরকমে কাজ সারা হচ্ছিলো ব'লে সেটার সাদা রং ম'জে গিয়ে মেটে হলদে রং ধরেছে। রেবা লক্ষ্য করেছিলো কিনা জানি না। কিন্তু তা নিয়ে আমি মোটেই মাথা না ঘামিয়ে বরং যতটা সম্ভব হাসিখুশি থেকে ওর জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদায় সাহায্য করলাম, ছুটে গিয়ে ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এলাম এবং গাড়িতে তুলে দিতে শেষ পর্যন্ত স্টেশনেও গেলাম।

'বাই—বাই।' হাত তুলে ইংরেজি কায়দায় ও বিদায় নিলো। বাই—বাই।' আমি হাসিমুখে মাথা নেড়ে প্রত্যাভিনন্দন জানালাম। সিটি দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলো। রেবা আর আসেনি। আমার স্ত্রী।

এখন আসল গল্পে আসা যাক।

ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিলো ক'দিন ধ'রে। সর্দি-কাশিতে ভুগে আমি একাকার। দু-দিন আপিস কামাই হ'য়ে তৃতীয় দিন চলছে। এমন সময় দুপুরবেলা হুড়মুড় ক'রে এসে ঘরে ঢোকে সুবিনয়। আমার বন্ধু। মাথা ও কান বেয়ে টপটপ জল ঝরছিলো। গায়ের জামা খুলে ফেলে হাত বাড়িয়ে আমার ময়লা তোয়ালেটা তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে সে মাথা ও ঘাড় মুছলো।

'কী ব্যাপার ?'

'তোকে দেখতে এলাম।' সুবিনয় আমার পাশে বসলো।

এখানে ব'লে রাখি, রেবাকে শেষবারের মতো বেনারস এক্সপ্রেসে তুলে দিয়ে এসে আদ্যোপান্ত সুবিনয়কে সব বলেছিলাম। নম্র নিরীহ গোবেচারা মানুষ এবং ঘরের ইট-কাঠকে যদি আমার বিশ্বাস করতে বাধতো সুবিনয়কে কিছু বলতে আমার আটকাতো না। আজ অবশ্য আমি গলা বড়ো ক'রে স্বামী-

পরিত্যাগকারিণী রেবার কাহিনী আপনাদের শোনাচ্ছি। আমার খারাপ না লেগে বরং ভালোই লাগছে। কিন্তু সেদিন?

আমায় ভয় ছিলো পাছে কেউ টের পায়।

স্ত্রী আমাকে পছন্দ করছে না, আমার সঙ্গে থাকতে তার আতঙ্ক, হ্যাঁ আতঙ্কই তো,—কাকু, মা, স্কুলের চাকরি এ-সব প্রশ্ন এদিকে উঠেছিলো, কিন্তু তার আগে? সেই প্রথম যাত্রায় কলকাতায় থেকে যাবার প্রস্তাব দিতে মেয়েটির (স্ত্রী বলতে আমার ঘৃণা হয় এখন) চোখের তারায় যে আতঙ্ক ফুটে উঠেছিলো পুরুষ হয়ে আমি তা ধরতে পেরেছিলাম বৈকি।

আর ধরতে পেরে আমি তা বিশ্বের কাছে লুকিয়েছিলাম। কিন্তু মানুষ ক'দিন এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে। একটা জায়গা চায় সে, একটি পাত্র খোঁজে। একজনের নিষ্ঠুর হওয়ার কাহিনী নিষ্ঠুরের মতো কাউকে ব'লে তারপর তার কাছে সৎ-পরামর্শের জন্য হাত পাততে না পারা পর্যন্ত সে শান্তি পায় না। সেই শান্তি আমি সুবিনয়কে দিয়ে পেয়েছিলাম। অবশ্য খুব যে একটা বড়ো রকমের পরামর্শ ও আমাকে দিতে পেরেছে তা নয়! ওয়েট্, অ্যাণ্ড সী ব'লে আমায় সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া নিরীহ মানুষটার মাথায় আর বিশেষ কিছু আসেনি।

না, ভুল বললাম, এসেছিলো, এসেছে। ও যে সত্যি আমার বন্ধু, আমার দুঃখে খুব বেশি বিচলিত হ'য়ে পড়েছে সেটা সুবিনয় নিজে যতটা না বুঝেছিল আমি বুঝেছিলাম ঢের বেশি।

সুবিনয় আমার কপালে হাত রেখে জ্বর পরীক্ষা করলো। আমি বললাম, 'জ্বর নেই, কাল একটু গা গরম হয়েছিলো, আজ ভালো আছি।'

'তা তুই কি ঠিক করলি?'

কথার উত্তর না দিয়ে আমি অন্য দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে ছিলাম। সুবিনয় আবার প্রশ্ন করলো, 'কী খেলি?'

অল্প হাসলাম। হেসে সুবিনয়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললাম, 'একটু বার্লি জ্বাল দিয়ে খেয়েছি। স্টোভ ধরাতে গিয়ে আঙুলটাও পুড়িয়েছি।'

'বেশ করেছিস।'

আমার মুখের দিকে তাকালো না সে। ঘরের মেঝেয় একরাশ ছেঁড়া ন্যাকড়া, অনেকগুলো পোড়া-দেশলাইয়ের কাঠি, স্পিরিটের শিশি ও হাতল-ভাঙা একটা সসপ্যানের পাশে স্টোভটার দিকে চেয়ে থেকে সুবিনয় যেন কী চিন্তা করছিলো।

'আজ শনিবার ?'

'হ্যাঁ, অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা তোর কাছে চ'লে এলাম। আজও সকালবেলা তোর বউদির সঙ্গে কথা হচ্ছিলো।'

আমি চুপ ক'রে আবার দেয়াল দেখছিলাম।

'তা হাত-পা পুড়িয়ে রেঁধে খেয়ে ক'দিন চলবে, না-হয় মেসে চ'লে যা।'

বললাম, 'তোমার ওয়েট অ্যাণ্ড সী উপদেশ মেনে নিয়ে এখানে প'ড়ে আছি আর-কি। যদি আবার কোনোদিন সে আসে।' হাসলাম।

'ননসেন্স।'

নিরীহ সুবিনয়ের চেহারা চাপা ক্রোধে থমথম করছিলো দেখে হাসি বন্ধ করলাম।

'মেসে ফিরে যা, না-হয় আমি যা বলছি তা কর। এ-ভাবে থেকে শরীরটাকে শেষ করিস না।' সুবিনয়ও দেয়ালের দিকে চোখ রেখে কথা বলছিলো।

বিয়ের পর রেবা যে-বার প্রথম যাত্রা কলকাতায় আসে, মেস ছেড়ে দিয়ে নেবুতলায় একুশ টাকা ভাড়ার ছোটো একটা কামরায় বাসা বেঁধেছিলাম। সেই ঘরে আমি আজও প'ড়ে আছি। রেবা ফিরে আসবে ব'লে না, রেবার বার-বার এসে ফিরে যাওয়ার পরও যখন দেখলুম ফুড আর লজ্‌ বাবদ মাস যেতে পঁয়তাল্লিশ টাকা মেসে না দিয়ে এখানে একুশ আর একটু কম-সম খেয়ে এবং মাঝে-মাঝে রাত্রে মুড়িটুড়ি চালিয়ে আমি পঁয়ত্রিশের মধ্যে মোটামুটি সারতে পারছি, তখন ভাবলাম (আপনি যদি স্বল্প বেতনভোগী কেরানী হন, আপনিও এই রাস্তা ধরবেন), আর মেসে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন কেন। তা ছাড়া, তা ছাড়া আরো কথা আছে। সেদিন বিয়ে করেছি অথচ আজ সাত মাসের মধ্যেও আমার নামে সবুজ বা সাদা একটাও খাম আসছে না, মেসের লোকের চোখে সেটা বিসদৃশ ঠেকবে ভেবেও সেখানে ফিরে যেতে উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। বলবেন আপিসের ঠিকানায় বউ চিঠি দেয় ব'লে ওদের বোঝাবো। সেই রাস্তা বন্ধ ছিলো, কেননা মেসের তারাপদ রায় ও নগেন দত্ত নামে দুই ভদ্রলোকও আমার আপিসে চাকরি করে। এক ঘরে, হ্যাঁ, এক টেবিলে ব'সে আমরা লেজার লিখি। কাজেই বুঝতে পারছেন লোকের কাছে কি লুকোতে আমার লোকালয়ে থাকতে সাহস হচ্ছিলো না। এই ঘরটাকে নির্জনাবাসই বলা যায়। গোটা বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন টালি-ছাওয়া একতলা কামরা। আমার কাছে চিঠি আসে কি না আসে বাড়ির মালিক হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট ধনপতি নন্দী কি তার

গোষ্ঠীর কেউ উঁকি দিয়ে দেখতে আসবে না। তা ছাড়া আমার জ্বর হ'লো কি পেটের অসুখ, হাত পুড়িয়ে সাগু পাক ক'রে খেলাম কি পা পুড়িয়ে চালে-ডালে একত্র সিদ্ধ ক'রে খিচুড়ি, তা-ও তাদের জানতে মাথা ব্যথা নেই। দু-তিনবার বউ এসে গেছে, এখন দু-তিন বছর কেন, বাকি সারা জীবনেও যদি আর সে কাছে না আসে, বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হ'য়ে বারাণসীধামে স্বজনের কাছে প'ড়ে আছে আমার বলতে বাধা ছিলো না। আমি ব্যাচেলার নই, বিবাহিত, এটা যখন প্রমাণ হ'য়ে গেছে বাড়িওলার ঘর অধিকার ক'রে থাকতে আর ভয় ছিলো না। তা ছাড়া কেরানীরা সুযোগ পেলেই পরিবার দেশে পাঠিয়ে দেয় লক্ষপতি ধনপতি নন্দীরা সেটা জানেন না আমি বিশ্বাস করতাম না।

ঘরে না থাকলে তো কথাই নেই, থাকলেও অধিকাংশ সময় আমি দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে রাখি। আর তা ছাড়া মাত্র দুটো জানলার মধ্যে বলতে গেলে দেড়খানাই ঘরের ওপাশে ধনপতিবাবুর কয়েক শ' টন পুরোনো জং-ধরা লোহার টুকরো স্তূপ ক'রে রাখা হয়েছিলো ব'লে খোলা সম্ভব হ'তো না। সুতরাং বাকি আধখানা দিয়ে বাইরের আলো বাতাস এবং মনুষ্যদৃষ্টি প্রবেশ করার তেমন সুযোগ ছিলো না। কাজেই আমি অধিকতর নিশ্চিন্ত ছিলাম। নির্জনবাস বৈকি।

কিন্তু এখানে এভাবে হাত পা ছড়িয়ে একলা শুয়ে-শুয়ে আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলবো আর অনাহারে অর্ধাহারে থেকে শরীর নষ্ট করবো দেখতে সুবিনয় প্রস্তুত না। এখানে আমাকে ওয়েট অ্যাণ্ড সী নীতি মেনে চলতে দিতে সে নারাজ। বিশেষ ক'রে গত মঙ্গলবার আমাশয়ে ভুগে উঠে আবার এই বিষ্যুতবারেই সর্দিজ্বরে বিছানা নিয়েছি দেখে সুবিনয় আমার ওপর রীতিমতো খেপে গেছে এবং অগত্যা যদি আমি মেসে ফিরে না যাই তো আজ এখুনি আমাকে তার সঙ্গে তার বাসায় চ'লে যেতে হবে। 'কালও তোর বউদির সঙ্গে এই নিয়ে কথা হয়েছে।'

দেয়ালে পেরেকের গায়ে রেবার ফেলে-যাওয়া একটা রিবন ঝুলছিলো। অনেক-দিন এক জায়গায় একভাবে থেকে কালি-ঝুল ও ধুলো লেগে চকচকে ফিতেটার ধূসর রং ধরেছে। ওটাকে অবলম্বন ক'রে এতবড়ো একটা মাকড়সার জাল তৈরি হয়েছে। একটু-সময় সেদিকে তাকিয়ে থেকে পরে বন্ধুর চোখে চোখ রেখে বল-লাম, 'আমার লজ্জা করে।'

'তুমি স্ত্রীলোক।' সুবিনয় রীতিমতো ধমক লাগালো, 'লজ্জা করে! আমার সঙ্গে থাকবি, বন্ধুর বাসায় থাকবি এতে লজ্জাটা আসে কোথা থেকে আমায় বুঝিয়ে বলতে পারিস?'

গত পরশু সুবিনয় প্রথম আমাকে এ-প্রস্তাব দেয়। এবং সেদিন যে-প্রশ্ন করেছিলাম আজ আবার সেই প্রশ্ন চোখে ভেসে উঠলো।

সুবিনয় আমার হাতে হাত রেখে বললো, 'অরুণাকে সে-সব আমি কিছুই বলিনি। বিশ্বাস কর। তুই আমার বন্ধু। আমার কাছে তুই সব বলতে পারিস, কিন্তু তোদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরকম একটা সম্পর্ক হ'য়ে আছে আমি মূর্খ না যে আমার স্ত্রীকে তা বলতে যাবো।'

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

'বলেছি ওয়াইফ আসতে এখন কিছুকাল দেরি হবে, সেখানে আর-একটা পরীক্ষা পাস দিতে তাঁকে থেকে যেতে হচ্ছে, কাজেই সুধাংশু বাসা তুলে দেবে, এদিকে আবার মেসের খাওয়া তার সহ্য হয় না—ডিসপেপ্‌শিয়ায় ভোগে।'

'তোর তো একখানা মোটে কামরা, কি ক'রে হবে ?'

'হ্যাঁ, একখানা বটে, ওটাকেই পার্টিশন লাগিয়ে দুটো করা হয়েছে। দু-তিন মাস আমার পিসতুতো-ভাই বঙ্কিম তার স্ত্রী ও একটা বাচ্চা নিয়ে থেকে গেলো কিনা। খুবসম্ভব বঙ্কিমের ক্যানসার হয়েছে। চিকিৎসা করাতে কলকাতায় এসেছিলো।'

'তারা এখন কোথায় ?'

'চ'লে গেছে। বঙ্কিম আসামের কোন একটা চা-বাগানে চাকরি করে। খুব-সম্ভব সেখানেই ফিরে গেছে। আর যাবে কোথায়। এ-রোগ তো সারবার নয়, মাঝখান থেকে এসে আমার কিছু—'

সুবিনয় থামলো।

'টাকা-পয়সা কিছু দেয়নি বুঝি ?'

'কোথা থেকে দেবে, দিয়েছিলো গোড়ার দিকে সামান্য, তারপর ডাক্তারে ওষুধে এমন খরচ হ'তে লাগলো যে এদিকে দুটো লোকের ভাতের খরচ বাচ্চার দুধের খরচ বলতে গেলে সবই প্রায় আমাকে—'

'এ-সব কথা কিন্তু তুই আমায় কিছুই বলিসনি।'

'কী আর হ'তো ব'লে। দুটো মাস আমার যা গেছে, আর্থিক তো বটেই, শারীরিক কষ্ট কি আর কম হয়েছে। আপিস বাজার, তার ওপর বঙ্কিমের জন্যে রোজ ডাক্তারখানায় ছুটোছুটি, একলা হাতে সব ম্যানেজ করা কি চাট্টিখানি কথা।'

'তা তো বটেই।' সুবিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলাম সত্যি এই দু-মাসে সে বেশ একটু রোগা হ'য়ে গেছে। 'যাক, চ'লে গেছে ওরা তোর দিক

থেকে ভালোই হয়েছে।' আস্তে-আস্তে বললাম, 'পরের উপকার করা কি আর কারো অনিচ্ছা, কিন্তু আমরা পারি কোথায়, আমাদের মতো অবস্থার লোকের নিজেদের বাঁচিয়ে রাখাই যেখানে প্রায় অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, সত্যি কিনা?'

তৎক্ষণাৎ কথা বললো না সুবিনয়। রেবার ফেলে-যাওয়া মলিন রিবনটা সে দেখছিলো।

আমি হাত বাড়িয়ে শিয়রের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে জল খেলাম।

'লোকের উপকার ছেড়ে দিয়ে তুই আমার উপকার কর। বিছানাটা গুটিয়ে নে, স্যুটকেসটা গুছিয়ে রাখ, জলটা ধরুক, আমি একটা রিক্‌শা ডেকে নিয়ে আসছি।'

আমি ফ্যালফ্যাল ক'রে সুবিনয়ের মুখ দেখি।

'রিয়্যালি, মিথ্যে বলছি না, তুই গেলে, এক সঙ্গে আমার কাছে থাকলে আমার মস্ত উপকার হয়। কি চাকরি করি ক'টাকা মাইনে পাই তোর অজানা নেই। তিন-তিনটে বাচ্চা। এদিকে অগ্নিমূল্য হ'য়ে আছে সব জিনিসপত্তর। বাড়িভাড়া আছে, তার ওপর অসুখবিসুখে—'

যেন কি বলতে চেয়েছিলাম, সুবিনয় আমার মুখের ওপর হাত রেখে বাধা দিলে।

'চলতি কথায় আমি যদি বলি আমার পেয়িং গেস্ট্‌ হ'য়ে তুই থাকবি তো তোর আপত্তি করা অন্যায়। আমারটা খাবি ব'লে তুই সেখানে যাচ্ছিস না। কেমন, হ'লো?'

আমার আর-কিছু বলার রইলো না। দুই হাতে চোখ ঢেকে চুপ ক'রে ভাবি। বাইরে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিলো। আমি জানি, আমি জানতাম, সুবিনয় আমাকে ধনপতি নন্দীর এই অন্ধকার গহ্বর থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যেতে আজ বদ্ধপরিকর হ'য়ে এসেছে। তাই শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলো। ওর সংসারে থাকা-খাওয়া বাবদ মাস-অন্তে কিছু টাকা হাতে তুলে দিলে আর-পাঁচটা খরচপত্রের দিক থেকে সুবিধা হবে চিন্তা ক'রে যে সুবিনয় আমাকে নিয়ে যেতে আসেনি এ-সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমার চেয়ে সুবিনয়কে কে-ই বা বেশি জানতো। দূর-সম্পর্কিত রুগ্ন পিসতুতো-ভাই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এই যে দু-মাস তার বাসায় থেকে খেয়ে চিকিৎসা করিয়ে গেলো, কই একদিনও তো সুবিনয়ের মুখ দিয়ে সে-কথা বেরোয়নি। আসলে এই নির্জনবাস আশ্রয় ক'রে রেবার চিন্তায় রুগ্ন হ'য়ে-হ'য়ে আমি আয়ু ক্ষয় করছি, বন্ধু তো বটেই, আমার পরমাত্মীয় সুবিনয়ের তা সহ্য হচ্ছিলো না। আমি জানি, আমি জানতাম, এই আস্তানার মোহ না ছাড়লে

গোবেচারা নিরীহ স্থবিনয় দরকার হ'লে নিষ্ঠুর হবে, বলপ্রয়োগ করবে আমাকে এখান থেকে নড়াতে। কিন্তু তা না ক'রে আজ সে অন্য পন্থা অবলম্বন করলো।

'তিনটে লোকের সঙ্গে একটা লোকের খাওয়া যেমন ক'রে হোক চ'লে যায়, বিশেষ গায়ে লাগে না। আমি ঠিক করেছি, তুই যদি যাস তোর প্রথম মাসের টাকাটা দিয়ে তোর বউদির একটা চশমা কিনে ফেলবো। কবে চোখ দেখানো হ'য়ে আছে কিন্তু টাকার অভাবে আজ পর্যন্ত ওটা কেনা হচ্ছে না, কিছুতেই ম্যানেজ করা যাচ্ছে না।'

'থাক, অত কথায় কাজ নেই।' রুষ্ট হ'তে গিয়েও হেসে উঠলাম। 'পেয়িং গেস্ট্ হ'য়ে তোর বাসায় থাকবো। কিন্তু মনে রেখো ব্রাদার, আমিও গরিব কেরানী। নিয়মমতো যদি টাকা-পয়সা দিতে না পারি, এক-আধ মাস আটকে যায়, বউদি যেন শেষ পর্যন্ত আমায় না আবার উপোস রাখতে আরম্ভ করেন।'

স্থবিনয়ও হাসলো।

'হুঁ, উপোস ঠিক রাখবে না। চালাক মেয়ে। দেনার কথা মনে করিয়ে দিতে থালায় ভাতের সঙ্গে এক টুকরো কয়লা দেবে।'

আমি শব্দ ক'রে হেসে উঠলাম।

স্থবিনয় বললো, 'চল, আর দেরি ক'রে লাভ নেই, বৃষ্টিটা ধরলো বুঝি এবার।'

দর্জিপাড়ায় এক গলির ভিতর স্থবিনয়ের বাসা। তা বাসা যত ছোটো হোক আর সাড়ে তিন হাত ও সাড়ে তিন হাত বন্দোবস্ত রেখে একটা টিনের পার্টিশন লাগিয়ে দুটো কামরা তৈরি করার চেষ্টা করতে গিয়ে স্থবিনয় ঘরখানাকে যতই শ্বাসরোধী ও অন্ধকার ক'রে তুলুক আমার তো মনে হয় ওখানে উঠে এক সন্ধ্যার মধ্যে শরীর মন ঝরঝরে হ'য়ে গেলো।

সন্ধ্যার পরেও বৃষ্টি পড়ছিলো।

এক ফাঁকে গিয়ে স্থবিনয় বাজার ক'রে নিয়ে আসে।

আমি ভাত খাবো শুনে স্থবিনয়ের বাজার করার প্রয়োজন হয়। বুঝলাম। ওরা ধ'রে রেখেছিলো শরীর খারাপ আমার, রাত্রে সাগু আর রুটি খাবো।

অরুণা বললো, 'না হ'লে আমরা রাত্রে চা-মুড়ি দিয়ে কাজ সারতাম।' কথা শেষ ক'রে বউদি যখন স্থবিনয়ের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলো স্থবিনয় তখন আমার সামনেই স্ত্রীকে ধমক দিলো। 'এত কথা বলতে তোমায় কে ডেকেছে। যদি চা হ'য়ে থাকে চা ক'রে নিয়ে এসো আগে।'

সুবিনয় রুষ্টভাবে কথাগুলি বলছিলো ব'লে তার হাতে একটা চাপ দিলাম। হাত সরিয়ে নিয়ে সুবিনয় বললো, 'না, না, মেয়েদের বেশি কথা বলতে দেখলে আমার গা জ্ব'লে যায়। তুই জানিস না।'

আমার চোখে বন্ধুকে হঠাৎ অন্যরকম ঠেকলো। কিন্তু, তখনই চিন্তা ক'রে দেখলাম, না, আমারই ভুল। ইতিপূর্বে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে সুবিনয়কে দেখলেও রান্নাবান্না কি খাওয়া পরা নিয়ে দু-জনের আলোচনা আর শুনিনি। আগে এত কাছাকাছি আসিনি এদের আমি, অন্তঃপুরে।

'যাও জল ফুটেছে। চট্ ক'রে চা নিয়ে এসো। তোমার চায়ে কি একটু আদা দেবে হে সুধাংশু?' মন্থরভাবে সুবিনয় আমাকে প্রশ্ন করলো। আমি মাথা নাড়লাম।

অরুণা আমাদের সামনে থেকে স'রে যাওয়ার পর সুবিনয় বললো, 'স্ত্রীকে চাপে রাখতে হয়। আমি স্ত্রী-শাসনের পক্ষপাতী।'

আমি কথা বললাম না।

তাকিয়ে দেখছিলাম নতুন জায়গা। আমি পায়খানা সেরে হাতমুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখি আমার বিছানার বাণ্ডিল খোলা হয়েছে। সুবিনয় কিছুই করছিলো না। কেবল দাঁড়িয়ে থেকে কাজের তদারক করছিলো। সুবিনয়ের বড়ো মেয়েটা বছর সাত-আট বয়েস, মাকে সাহায্য করছিলো। আমার লাল সুজনি বিছানো হ'লো। ময়লা বালিশ। বস্তুত বাদলার জন্যে ধোয়ানো যাচ্ছিলো না। তা ছাড়া ওয়াড়টা অনেকদিন থেকেই ময়লা হ'য়ে ছিলো। অরুণা যখন সুজনির ওপর আমার বালিশ জোড়া বিছিয়ে পরে বালিশ দুটো আবার সরিয়ে নিচ্ছিলো সুবিনয় তখন আচমকা ধমক দিয়ে উঠলো।

'আবার সরাচ্ছো কেন?'

'ওয়াড দুটো খুলে ফেলবো।'

আমি লক্ষ্য করলাম কথা বলতে গিয়ে একবারও অরুণা স্বামীর দিকে তাকাচ্ছিলো না। রক্তাভ গাল।

পর-পর দু-তিনটে ধমক খেয়ে অত্যন্ত অভিমান হয়েছে বুঝতে পেরে আমি চোখ ফিরিয়ে দরজার বাইরে প্যাসেজের একটা বাল্‌বের অন্তিমদশায় চ'লে যাওয়া ধুকধুকে লালচে রেখা দুটো মনোযোগ দিয়ে দেখি।

'একটা কথা জিগ্যেস ক'রে তারপর কাজ করবে। ওয়াড় যে খুলছো এখন,

বালিশে পরাবে কি? এতকাল ছিলো, আজ রাতটা থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হ'তো না।'

অরুণা যত না লজ্জা পেলো আমি লজ্জিত হলাম ঢের বেশি।

'আপনি ওটা আজ খুলবেন না।' বলতে অরুণা এই সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকায়।

এবার লক্ষ্য করলাম রেবার চেয়ে সুন্দরী না হ'লেও অরুণা মন্দ-না। মন্দ-না বললে ছোটো ক'রে বলা হয়। হয়তো বেশি সুন্দরী। সত্যিকারের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার স্ত্রীলোক বলা যায়। শরীরে, চলাফেরায়, কথায়। বলতে কি অরুণা ম্যাট্রিকও পাস করতে পারেনি, যদি না আগে কোনোদিন সুবিনয় আমাকে জানিয়ে রাখতো আজ আমি ভাবতাম এই মেয়ে ডবল এম. এ। এত কাছাকাছি হ'য়ে আমি কোনোদিন মুখ দেখিনি। ভাবছিলাম রাগারাগি হবে। পুনঃপুনঃ আঘাত করার ফলে চোখে জল আসবে। কিন্তু তা এলো না।

অরুণা মুখ তুলে আশ্চর্য শান্তভাবে হাসলো। 'স্ত্রীর ওপর উঠতে-বসতে রাগারাগি করলে আজকাল স্ত্রীরা কি করে একবার ওঁকে ব'লে দিন তো ঠাকুরপো।'

'হ্যাঁ, আত্মহত্যা করে, পালিয়ে যায়—কোর্টে যায় মামলা করতে ডাইভোর্সের। তুই বুঝিয়ে ব'লে দে না সুধাংশু। আমার কথায় তো এর বিশ্বাস নেই।'

আমি একদিকের দেয়ালে চোখ রাখলাম। পরে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম এক কথায় স্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে সুবিনয় নীরব নতনেত্র হ'লে তার কাজের তদারক করছিলো। 'পারিবারিক জীবনে তুই নিষ্ঠুর।' কেন জানি যতবার রূঢ়ভাবে স্ত্রীকে আদেশ-প্রত্যাদেশ করছিলো বার-বার সুবিনয়ের চোখে চোখ পড়তে আমার গলা বড়ো ক'রে বলতে ইচ্ছা হয়েছিলো, 'সংযত স্থিরবুদ্ধির মেয়ে বউদি, তা না হলে, তোকে ঘোল খাইয়ে ছাড়তো।'

কিন্তু বললাম না।

মূর্খ রেবা আমার সেই মুখ হয়তো বাকি জীবনের জন্যে বন্ধ ক'রে গেছে। ভেবে ছোট্টো একটা নিশ্বাস ফেললাম।

রান্নাবান্না হ'লো। খাওয়া-দাওয়া শেষ।

বৃষ্টিটা আবার চেপে এসেছিলো।

এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে, হ্যাঁ বিশেষ ক'রে আমার সঙ্গে থেকে 'কাকু' 'কাকু'

করে বড়ো আর মেজো ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই সুবিনয়ের বাসাটা হঠাৎ নীরব হয়েছিলো। বৃষ্টিতে আবার এখন মুখর হ'য়ে উঠলো।

নতুন লোক আসাতে খাওয়ার পাট চুকবার পরও অতিরিক্ত দুটো বাসনমাজা এবং এটা-ওটা ধোয়ামোছা সারতে বেশ রাত হয়ে গেলো।

আমার বিছানার ওপর শুয়ে এতক্ষণ পর মোটামুটি সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত হ'তে পেরে যেন সুবিনয় আবার সুবিনয় হ'য়ে গেলো। অর্থাৎ আগের মতো হালকা মনে রেবা-সম্পর্কে আমাকে উপদেশ দিয়ে চললো। 'থাক এখন এখানে ক'মাস। চিঠিপত্র যখন দেয় না তুইও দিবি না। কোথায় আছিস ঠিকানা জানাবি না। আসবে না মানে? আলবৎ আসবে। ওয়েট অ্যাণ্ড সী। এক-আধটা বাচ্চা পেটে আসুক। বিদ্যার দাপট, নিজে চাকরি ক'রে তোর অতন কি কিছু বেশি রোজগার করতে পারার ভ্যানিটি চুরমার হ'য়ে যাবে। বুঝলি, ও-সব থাকে না। আফ্‌টার অল্‌ শী ইজ এ উয়োম্যান। তার যা ধর্ম তাই পালন করতে এসেছে সে পৃথিবীতে। যতক্ষণ না পাচ্ছে, যতক্ষণে না সেই সাধ পূরণ হচ্ছে ততক্ষণ তুমি নিজের স্ত্রীর ক্যারেক্টার বিচার করতে পারছো না।'

আমি কথা বলছি না।

বৃষ্টিটা আবার থেমেছে। শেষ বর্ষার বৃষ্টি যায় আসে, আসে যায়।

যেন কোথায় একটু টিনের ছাদ ছিলো সুবিনয়ের বাসায়। বর্ষণ থামতে কোথা থেকে ফোঁটা-ফোঁটা জল প'ড়ে একটা টপটপ আওয়াজ হচ্ছিলো।

'বুঝলি, বিয়েটা কিছু না। ওটা স্বামী-স্ত্রীর জীবনে একটা বন্ধনই নয়। পরিণয়ের আসল সুতো হ'লো সন্তান। একটা বেবি হোক তখন দেখবি।'

এবার সুবিনয় আর আস্তে কথা বলছিলো না। আমার মনে হ'লো যেন ভিতরে চৌবাচ্চার ধারে অরুণা ধোয়া-মাজার কাজ করছিলো। কথাগুলি সে-ও শুনছে কিনা চিন্তা করছিলাম।

'চুপ করে আছিস কেন?' হেসে সুবিনয় আমার পেটে আঙুলের গুঁতো দিলো। বললাম, 'শুনছি, তুই ব'লে যা।'

'সুতরাং টেক্‌ অ্যানাদার চান্স্‌। আবার আসুক। এর আগে চান্স্‌ নিয়েছিলি?'

আমার কান লাল হ'য়ে উঠলো। কেননা, সুবিনয় আরো জোরে কথাটা বললো। যেন মনে হ'লো বাসন ধোয়া সেরে অরুণা ঘরে ফিরছে। পার্টিশনের ওপারে চুড়ির শব্দটা কানে লাগলো।

'হাঁ-ক'রে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিস কি, উত্তর দে।'

আমার গলা শুকিয়ে যায়। যেন তিন দিন পর ভাত পথ্য ক'রে হঠাৎ অসময়ে এমন পিপাসা পেলো। চেপে গেলাম। কেননা, তখন যদি আমি হেসেও জলের কথা বলতাম সুবিনয় অট্টহাস্য ক'রে উঠতো। আজ আপনাদের কাছে বলছি, সেদিন, তখন আমাদের সংক্ষিপ্ত দাম্পত্যজীবনের সব কথা সুবিনয়ের কাছে প্রকাশ করার পরও একটা জিনিস গোপন করলাম। নিষ্ঠুরা রেবা মা হবার সুযোগ প্রতিবার কৌশলে এড়িয়ে গেছে যদি আমি বন্ধুকে বলতাম, ঘরের সিলিং কাঁপিয়ে সে হেসে উঠতো নয়তো ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আমার পৌরুষকে ধিক্কার দিয়ে বলতো, 'ফুল—তুই একটা গর্দভ। যা এখন ভেরেণ্ডা ভাজগে—' ইত্যাদি।

আমি দু-বার ঘাড় নাড়লাম। অর্থাৎ আগেও চান্স্ নিয়েছি এবং ভবিষ্যতে কোনোদিন রেবা এলে ওকে মাতৃত্বের গৌরব দিতে চেষ্টা করবো। আমার বুকের ভিতর হুহু করছিলো।

যথার্থ উত্তর পেয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে সুবিনয় গলা খাটো করলো এবার। মুখ দিয়ে একটা গুজ্‌গুজ্‌ শব্দ বের ক'রে হেসে বললো, 'আমি ওভারলোডেড হ'য়ে গেছি যদিও। তিনটে। আর-একটি আসছে। খরচটা বাড়ছে সত্যি, কিন্তু একজায়গায় স্যাটিসফ্যাকশন আছে।'

সুবিনয়ের মুখের দিকে তাকাই।

'তা তো বটেই, এতগুলি সন্তানের বাপ হয়েছিস।'

'কেবল কি তাই! তিনিও ভালো হাতে আটকা পড়েছেন। একবেলার জন্যে আর বাইরে পা বাড়াবার উপায় নেই।'

'কেন?' প্রশ্নটা ঠিক বুদ্ধিমানের মতো হ'লো না টের পেলাম যদিও।

সুবিনয় বললো, 'কে এমন বড়োলোক আত্মীয় আছে যে, এই দুর্দিনের বাজারে এতগুলি বাচ্চা সমেত গিয়ে উঠলে ভালো মনে তিন বেলা খেতে দেবে। কাকার পরিবার দেখতে বছরের পর বছর তোর স্ত্রী বেনারস প'ড়ে আছে। বাচ্চা-কাচ্চা হবার আগে আমার উনিও যেতেন শেওড়াফুলি এক মামীর সংসার দেখতে। সাত-আট দিন সেখানে কাটিয়ে, আসতো অরুণা। এখন?' একটু থেমে সুবিনয় পরে হাসলো। 'যদি-বা কালেভদ্রে কোথাও থেকে নিমন্ত্রণ আসে, এখন যাওয়া হয় না আর-এক কারণে।' সুবিনয় টাকা বাজাবার মতন দুই আঙুলের বাড়ি মেরে বললো, 'এত পয়সা পাবেন কোথায় যে, আণ্ডাবাচ্চা নিয়ে শ্রীমতী নায়ের করতে যাবেন। ট্রাম-বাসের খরচ আছে না? আমি বাবা স্রেফ ব'লে দিয়েছি,

যাও, যেতে পারো, কিন্তু তারপর আর তিন দিন বাজার করা হবে না। কথাটি মনে রেখে বাড়ি থেকে পা বাড়িয়ো।' কথা শেষ ক'রে সুবিনয় টেনে-টেনে হাসলো।

মৃদু হেসে বললাম, 'শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়েছেন বউদি। একদিনের জন্যে আর চোখের আড়াল হবার উপায় নেই।'

যেন আত্মতৃপ্তিতে একটু-সময় চোখ বুজে চুপ ক'রে রইলো সুবিনয়। তারপর ঘাড় তুলে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'তুই দেখে বুঝতে পারলি যে অরুণা আবার কন্‌সিভ করেছে?'

আমি মাথা নাড়লাম।

'তা আর কি ক'রে বুঝবি। অভিজ্ঞতা নেই যখন। রংটা আরো ফর্সা হয়েছে লক্ষ্য করেছিস? এ-সময় মেয়েরা দেখতে বেশি সুন্দর হয়। দাঁড়া, আর-একবার ডাকছি, আর-একবার ছাখ।'

প্রচণ্ড শব্দ করে বৃষ্টি নামলো।

কিন্তু সেই শব্দ ডুবিয়ে দিয়ে চড়া সুরে সুবিনয় হাঁকলো, 'অরুণা!'

'যাই।' ঠাণ্ডা মিষ্টি গলা পার্টিশনের ওপার থেকে ভেসে এলো।

'তোমার কি আর ওদিক সারা হবে না সারারাত।' নীরস কণ্ঠস্বর এপারে সুবিনয়ের। 'সেই কখন খাওয়া হয়েছে, চৌবাচ্চার কাজ সারা হ'লো?'

'হয়েছে।'

'এখন কি হচ্ছে। খুটখাট শব্দ?'

'বাচ্চাদের মশারি খাটাচ্ছি। দড়ির একটা পেরেক উঠে গেছে। বাড়ি মেরে বসাচ্ছি।'

'কী অদ্ভুত মানুষ, ওটা তো বিকেলেই বলা উচিত ছিলো আমাকে। রাত বারোটার সময় এখন—'

ওপারে কথা শোনা গেলো না।

'মশারি খাটিয়ে এখানে একবার এসো।'

বিরক্তিটা দূর হ'তে সুবিনয়ের সময় লাগলো একটু।

ওপাশে আর খটখট আওয়াজটা শুনলাম না।

'মনে হয় সারাক্ষণই তুই খিটিমিটি করিস বউ-এর সঙ্গে।' আস্তে বললাম, 'এখন টের পাচ্ছি।'

'তাতে কি আমার সংসার ফুটিফাটা হ'য়ে গেছে! এখানে এসে এই এক সন্ধ্যের মধ্যে ফাটল কোথাও চোখে পড়লো নাকি তোর?'

'না, না তা হবে কেন।' কি ইঙ্গিত করতে চাইছে বুঝতে পেরে লজ্জায় ব্যস্ত হ'য়ে বললাম, 'তুই কেবল তাড়াহুড়োই করিস, কোনো কাজে সাহায্য করিস না। বউদি মাথা ঠাণ্ডা রেখে সব ধীরেসুস্থে করছে ব'লেই দিনকে-দিন এমন ফুলবাগানের মতো সুন্দর হচ্ছে সংসারটি তোমার। বাচ্চাগুলো ভালো থাকুক। দেখে আমার এত ভালো লাগছিলো তখন থেকে।' কথাগুলি বেশ জোরে-জোরে বললাম।

'না, তেমন ক'রে আর সাজাতে পারছি কই।' আত্মতৃপ্তিতে সুবিনয়ের চোখ আবার আধবোজা হ'য়ে এলো। 'ওই শালার টাকা-পয়সার অভাবটাই মাঝে-মাঝে মাথা গরম ক'রে দেয়। না হ'লে—না হ'লে—'চোখ দুটো সম্পূর্ণ বুজে যায় সুবিনয়ের এবং সে-অবস্থায় কিছুক্ষণ চুপ থেকে যেন কি একটু ভেবে পরে বলে, 'না হ'লে প্রথম থেকে—ফ্রম দি ভেরি বিগিনিং অব যাকে বলে দাম্পত্য-জীবন—কন্‌জুগ্যাল লাইফ, এ-পর্যন্ত মন্দ কাটিয়ে আসিনি আমরা। আমার তো মনে হয় আমি এবং সে—দু-জনেই সুখী।'

স্বামীর গালি খেয়েও বউদির সন্ধ্যা থেকে হাসি-হাসি ক'রে রাখা মুখখানা আমাকে এখন তাই মনে করিয়ে দিলে।

যেন ঈষৎ অপদস্থ হ'য়ে চুপ ক'রে গেলাম।

মিটিমিটি হেসে সুবিনয় বললো, 'লিভার সতেজ রাখতে নিত্য একটু তেতো খেতে হয়, জলে কোনো জার্ম না থাকে তাই ওতে একটু ফিটকিরি মেশাতে হয়। সংসারের ডিসিপ্লিন রাখতে তাই বকাঝকারও দরকার বুঝলি? গিন্নীকে যে-পুরুষ শাসন করে না আমি সেগুলিকে মেষ বলি। ওদের কপালে দুঃখ থাকে। হ্যাঁ, আদর করতে হবে বৈকি, কিন্তু তার একটা টাইম আছে, সেটা তিনি যখন গৃহস্থালিতে লাগেন তখন না। যখন তিনি অবসর, যখন শয্যাসঙ্গিনী হন তখন। তুই ম্যারেড্ ম্যান্ তোকে আর বোঝাবো কি। কিন্তু বহুপুরুষ, মানে বিবাহিত লোক তা বোঝে না—অর্থাৎ জানে না সংসার করতে হ'লে কিভাবে চলতে হয়। ফলে ভোগে।'

একটু চুপ থেকে সুবিনয় বললো, 'বলছিলাম বেতনের টাকা ফুরোলে মাসের শেষে মাথা গরম হয়, অশান্তি পাই। কিন্তু যখন চারদিকে তাকাই তখন ভাবি ও কিছু না, মন-গড়া দুঃখ। টাকার কাঁড়ির ওপর ব'সে থেকেও কত শ্রীমানের বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যায়, কি বলিস।'

আমি সুবিনয়ের চোখের দিকে না তাকিয়ে মাথা নাড়লাম।

'কাজেই, ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে দিই আর পটি-লাগানো জুতো পায়ে থাকুক, আমি সুখী ; আমার সুখ দেখে অনেক টাকাওয়ালা ঈর্ষা করেন। তুই চুপ করে আছিস সুধাংশু।'

বললাম, 'এক শ' বার হাজার বার। কই, বউদিকে ডাক না। আমি একটু জল খাবো তৃষ্ণা পেয়েছে।'

'কি হ'লো, শুনছো?' এ-ঘর থেকে সুবিনয় আবার হাঁকলো, 'তোমার মশারি খাটানো হ'লো? সুধাংশু জল খাবে।'

ওধারে কথা শোনা গেলো না।

পুরো একটা মিনিট কাটলো।

'বেশ মজা তো!' অসহিষ্ণু হ'য়ে সুবিনয় আমার বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

'তুমি কোথায়, ঘরে?'

'না, বারান্দায়।' আর-একটু ভিতর থেকে এবার উত্তর এলো, 'বাবলু পেণ্টুলনে তখন কাদা ভরিয়েছে, ধুয়ে দিচ্ছি, তা যেমন বাদলা, কাল শুকোবে কি।'

আমার চোখে চোখ রেখে সুবিনয় বললো, 'মেজো ছেলে আমার। তখন তো তুই দেখলি।'

ঘাড় নাড়লাম।

সুবিনয় আমার দিকে না তাকিয়ে আবার পার্টিশনের দিকে মুখ ফেরালো। 'তা বাবলুর পেণ্টুলনে তো সেই কখন বিকেলে কাদা লেগেছিল। এতসব জিনিসপত্র ধোয়াধুয়ি ক'রে এলে এক ঘণ্টা চৌবাচ্চার পাশে ব'সে। তখন ওটার কথা মনে ছিলো না, বড়ো-যে মশারি খাটিয়ে শুতে এসে এখন ছেলের পেণ্টুলন নিয়ে ব'সে গেছো?'

উত্তর নেই, কেবল ঝুপ-ঝুপ শব্দ শোনা গেলো। আর বন্ধুপত্নীর হাতের স্বল্প চুড়ির মৃদু রিন্‌রিন্। পেণ্টুলন কাচা হচ্ছিলো।

আরো-একটা মিনিট কাটতে দিয়ে সুবিনয় আবার হাঁকে, 'তোমার হ'লো?'

এবারও কথার উত্তর না দিয়ে বউদি কি যেন একটা জোরে আছড়ায়। বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে। তাই ওধারের সিমেণ্টের ওপর চটাস্‌-চটাস্ আওয়াজ এধারে সিমেণ্ট কাঁপিয়ে তুললো। যেন আর ধৈর্য রাখতে না পেরে সুবিনয় ছুটে

যাচ্ছিলো। আমি হাত চেপে ধরলাম। 'এত অস্থির কেন। আসবে এখুনি একটু পেণ্টুলন ধুতে আর কত সময় লাগবে।'

আমার কথায় কান না দিয়ে ওপাশের শব্দ লক্ষ্য ক'রে সুবিনয় চিৎকার ক'রে বললো, 'আমি যদি আসি তো বাল্‌তির মধ্যে তোমার মুখ চেপে ধরবো, ডাকছি, বড়ো-যে সাড়া দিচ্ছো না ?'

'ভালোই হয় তবে, বিষ খেয়ে কি পালিয়ে গিয়ে তোমার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার আর দরকার পড়বে না আমার, বাল্‌তির সাবান-গোলা-জলের ভেতর একটু বেশি সময় মুখটা চেপে ধ'রে রেখো, অতি সহজে কাজ সারা হবে।'

যেমন আশা করছিলাম। ঠাণ্ডা মিঠে গলায় অরুণা কথা বলে আর হাসে আর কাপড় কাচে ঝুপ-ঝুপ। না, যেন কাচা হ'য়ে গেছে, এই বেলা বাল্‌তির জলে সেটা ধোয়া হচ্ছিলো।

'তা আজ সেটি পারবে না, বাড়িতে ঠাকুরপো আছেন। আমায় খুন করছো টের পেলে পুলিশ ডাকবেন।' যেন বারান্দা ছেড়ে অরুণা এখন ঘরে এসে ঢুকলো।

স্ত্রীর উক্তি শুনে সুবিনয় আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছিলো। কিন্তু আমি তা গ্রাহ্য না ক'রে পার্টিশনের দিকে মুখ রেখে বললাম, 'ঠিক বলেছেন বউদি। আমি এসেছি এখন সুবিনয় আর কিছু করতে পারবে না।'

'দেখুন, দেখে যান আপনার বন্ধু কেমন ক্রুয়েল। রাতদিন স্ত্রীর ওপর রাগা-রাগি আর বকাবকি। আপনি কালই রেবার কাছে চিঠি লিখে দিন।'

অট্টহাস্য ক'রে এ-ঘরের দেয়াল কাঁপিয়ে তুললো সুবিনয়। 'তাই দে, আজ রাতেই চিঠিটা লিখে রাখ সুধাংশু। আর লিখে দে, তোর বউ যখন আবার কলকাতায় আসবেন বেড়াতে-বেড়াতে একবার যেন দয়া ক'রে তোর বন্ধু সুবিনয়-বাবুর এত নম্বর মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে উঁকি দিয়ে দেখে যান। স্ত্রীলোক। এক-নজর দেখলেই বুঝবেন বিয়ের পরদিন থেকে যে-চারাগাছটাকে তার স্বামী উঠতে-বসতে গামলা আর বাল্‌তির জলে চুবিয়ে মারছে ফল ফুল কুঁড়ি পাতায় বর্ষার ডুমুর গাছটি হ'য়ে উঠেছে।' কথা শেষ ক'রে বন্ধু টেনে-টেনে হাসছিলো।

নিজের সংসারের সুখ বর্ণনা তো বটেই তার সঙ্গে আমার লক্ষ্মীছাড়া সংসারের দিকে একটুখানি উপেক্ষার ইঙ্গিত ছিলো টের পেয়ে চুপ ক'রে রইলাম।

বন্ধুপত্নী এক গ্লাস জল নিয়ে ঘরে এলো।

অরুণা হাসছিলো। তার কান বেয়ে চুল বেয়ে জল পড়ছিলো। বৃষ্টিতে বেশ ভেজা হয়েছে মাথা দেখে মনে হ'লো।

নোলকের মতো নাকের ডগায় একটা জলের ফোঁটার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'জলটা মুছে ফেলুন।'

অরুণা বাঁ হাত দিয়ে নাকের জল মুছে জলের গ্লাসটা আমার হাতে তুলে দিয়ে নীরবে হাসলো। হাসির সঙ্গে একটি মেয়ে-মন ভীষণভাবে আমার মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেলো।

গ্লাসটা আমার হাত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এবং আমার ওয়াড়হীন বালিশ দুটোর ওপর ওর সবে-পাট-ভাঙা একখানা ধোয়া ধবধবে শাড়ি বিছিয়ে দিয়ে বললো, 'আর-কিছু দরকার হবে ঠাকুরপো?'

বললাম, 'না। ভীষণ কষ্ট দিলুম হঠাৎ এসে উঠে। এত রাত হ'য়ে গেলো কাজ শেষ হ'তে আপনার।'

'না, মোটেই না, একবার জিগ্যেস ক'রে দেখুন। আপনি না এলেও রোজ বারোটা বাজে। একলা হাত আমি সব দিক সামলাতে পারি না।'

'ও, তুমি তা হ'লে বলছো আমি আপিস থেকে খেটেখুটে এসে তোমার ছেলেমেয়ের পেণ্টুলন সাফ করি, বেশ মজা।'

সুবিনয় আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আবদার ছাখ সুধাংশু। এমন দুঃখের জীবন হবে জানতে পারলে কোন শালা বিয়ে করতো, তুই বল।'

'বেশ তো, রেবাদি আসুন একবার। দেখে যান কোন কাজটা অপূর্ণ থাকে শেষ পর্যন্ত। বড়ো-যে অষ্টপ্রহর হৈ-চৈ করছো।' ব'লে অরুণা আমার দিকে তাকালো।

'রেবার আসবার দরকার কি, সুধাংশু এখানে উপস্থিত আছে। সে নিজে দেখুক। কতটুকুন-বা সংসার, কী বা থাকতে পারে কাজ যে একেবারে ওই নিয়ে মত্ত হ'য়ে আছো সারাক্ষণ। একটা লোক একলা হাতে একটা বড়ো দেশ ম্যানেজ করে, রাজ্য চালায়।'

আমি সুবিনয়ের যুক্তি শুনলাম না। একটু গম্ভীর হ'য়ে বললাম, 'ছেলেপুলের সংসারে কাজের ঝক্কি অনেক। মেয়েদের দারুণ কষ্ট হয়।'

'হ্যাঁ, তুই কত কষ্ট বুঝেছিস। যেন কত তোর অভিজ্ঞতা। আজ অবধি তো রেবা তোকে—'

কথাটা সুবিনয় শেষ করলো না। হোহো করে হাসলো। আমার কান

লাল হ'য়ে উঠলো। বুঝতে পারার মতো বুদ্ধিমতী অরুণা। তার দুই কানও লাল হ'য়ে গেছে লক্ষ্য করলাম।

আমার চোখে ধরা পড়বে ব'লে ভয় পেয়ে আমি ওর মুখের দিকে তাকাতে অরুণা হেসে উঠে তাড়াতাড়ি বললো, 'যারা রাতদিন স্ত্রীকে বকাবকি করে তারা কি প্রকৃতির পুরুষ জানেন নিশ্চয় ঠাকুরপো ?'

অল্প হেসে বললাম, 'স্বার্থপর !'

অরুণা আড়চোখে সুবিনয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, 'সে-সব পুরুষকে মেয়েরা ঘৃণা করে।'

হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মতো প্রবল হেসে ঘৃণাটা উড়িয়ে দিয়ে সুবিনয় স্ত্রীর শরীরের ওপর চোখ রেখে বললো, 'কতটা ঘৃণা করো তার প্রমাণ দেখাতেই তো এসেছো মাঝ রাতে দু-জন পুরুষের সামনে। তা সুধাংশু পাকা ছেলে। আমি বলার আগেই ও টের পেয়েছে যে আবার তুমি—' হিহি ক'রে হাসলো সুবিনয়। 'মেয়েরা পুরুষদের ঘৃণা করে !'

হাসতে-হাসতে বার-বার বলছিলো সে। অরুণা ছুটে পালালো।

হ্যাঁ, সেই রাত্রেই অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটেছিলো। যার ওপর আমার এ-গল্প দাঁড়িয়ে। ওরা চ'লে যেতে আমি আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাইরে বৃষ্টি খরতর হ'য়ে উঠছিলো। নতুন জায়গা, কাজেই শুয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুম এলো না। জেগে চুপ ক'রে বৃষ্টির শব্দ শুনলাম। আর চিন্তা করলাম সুবিনয়ের কথা। বেচারা তখন এতটা প্রগল্ভ এতটা অসতর্ক হ'য়ে উঠেছিলো ব'লে দোষ দিতে পারিনি তাকে। এতকাল আমি আমার হারানো-স্ত্রীর গল্প ব'লে-ব'লে আর উপদেশ চেয়ে-চেয়ে বন্ধুকে হয়রান ক'রে তুলেছিলাম। আজ আমি তার অন্তঃপুরে এসে পা বাড়াতে সে তার একান্তভাবে পাওয়া স্ত্রীকে নিয়ে রাগারাগি অথবা হাসাহাসি ক'রে আমার কাছে নিজের দাম্পত্য-জীবনের অগাধ সুখ প্রমাণ করবার চেষ্টা করবে স্বাভাবিক।

না করাটাই সুবিনয়ের পক্ষে অস্বাভাবিক ঠেকতো। শুয়ে-শুয়ে সুবিনয়ের আস্ফালন ও তার স্ত্রীর বার-বার চমকে উঠে পরমুহূর্তে স্বাভাবিক হেসে আক্রমণ প্রতিরোধ করার সুন্দর ছবিটা চিন্তা করতে লাগলুম। আপনাদের কাছে অস্বীকার করবো না, কান পেতে রইলাম পার্টিশনের দিকে।

এক-আধটা কথা শোনা যেতে পারে আর সেই কৌতুহল নিয়ে আমি যদি

কান পেতে থাকি তো আমার সেই রুচিকে আপনারা ক্ষমা করবেন না জানি। কিন্তু আমার তখন মনের অবস্থা কি ছিলো? খুব স্বাভাবিক যে, আমি জেগে থেকে রেবার চরিত্রের সঙ্গে অরুণাকে মিলিয়ে দেখবো দুই নারীর রূপ। রেবা তেমন ক'রে কোনোদিন আমার সঙ্গে কথাই বলেনি। পাশের কামরায় বন্ধুপত্নী সুধাকণ্ঠী অরুণা, হ্যাঁ, বলতে গেলে রিক্শা থেকে নামার পর সেই বিকেল থেকে আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলো। আমি খাওয়ার পরে একবার ছাড়া অরুণার হাতে আগে আরো পাঁচ-সাত গ্লাস জল চেয়ে খেয়েছি। সুবিনয় বাজারে গেছে পর অরুণার সঙ্গে কত কোটি কথা বলেছি তার হিসাব দিতে পারবো না।

রাত্রে অন্ধকারে বিছানায় ঢোকার পরও যদি সুবিনয় স্ত্রীকে ধমক দেয় তো তার উত্তরে অরুণা না-জানি কেমন ক'রে কথা বলবে শুনতে ছেলেমানুষের মতো প্রায় পাগলের মতো কান খাড়া রেখেছিলাম। কিন্তু বাইরে প্রবল প্রখর বারিপাতের শব্দ আর এই ছোট্টো বাসায় পাশের কামরায় সুবিনয়ের সংসারের ঘুমন্ত ছোটো-বড়ো মানুষগুলোর লম্বা-লম্বা শ্বাস টানার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিলো না। কান খাড়া রেখে বৃষ্টির শব্দকে উপেক্ষা ক'রে আমি অতঃপর ওদের দু-জনের, বন্ধু সুবিনয় ও তার স্ত্রী অরুণার শ্বাস-প্রশ্বাস বিচার করতে লাগলুম।

হয়তো সেই অবস্থায় আমার ঘুম এসেছিলো।

এক-সময় হঠাৎ চোখ মেলে টের পেলাম মাথাটা আর তুলে ধরা হাতের তেলোর ওপর রাখা নেই। বালিশে নেমে গেছে। মুখটাও পার্টিশনের দিকে ঘোরানো নেই। আমি যে-দেয়াল পিঠের দিকে রেখে শুয়েছিলাম সেই দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে এখন অন্ধকারে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে আছি। বাইরে বৃষ্টির গর্জন থেমেছে। টিনের ওপর বৃষ্টির ফোঁটার ঢপঢপ শব্দটা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু থেমে-থেমে, একটানা নয়, যেন যেখান থেকে জল পড়ছিলো সেখানে জল ক'মে এসেছে। বৃষ্টিটা তা হ'লে বেশ-কিছুক্ষণ ধরেছে অনুমান করলাম।

কিন্তু জলের শব্দ না অন্য কারণে আমি আবার কান পেতে থাকি। আমার মনে হ'লো একটা বেড়াল মিউ ক'রে উঠে আবার থেমে আছে। আমার যেন মনে হ'লো বেড়ালটা আমার নাক ও মুখের উপর তার ঈষদুষ্ণ কোমল মোলায়েম শরীরটা বার-দুই ঘ'ষে দিয়ে এইমাত্র জানলার বাইরে লাফিয়ে গেছে। শিয়রের ওপর একটা ছোট্ট জানলা এখন চোখে পড়ছে। একটা পাল্লা খোলা। এদিকে একটা জানলা আছে আগে আমার চোখে পড়েনি। গরাদের উপর এক-চিলতে

আলোর রেখা ধুকধুক করছে। দুই চোখ রগ্‌ড়ে আরো একটু-সময় সেদিকে তাকিয়ে তারপর অবশ্য বুঝতে কষ্ট হ'লো না, আলোর রেখা পাশের বাড়ির কোনো ফাঁক কি ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এসে সুবিনয়ের ঘরের জানলায় উঁকি দিয়েছে। কিন্তু আমি চিন্তা করছিলাম পাল্লাটা কি ক'রে খুললো। ভাদ্র মাসের পচা রাত। ঘরের ভিতর এমন গুমোট। পায়রার খুপ্‌রির মতো সুবিনয়ের এই কামরায় একলা বিছানায় শুয়ে সেইজন্যই তখন আমার আরো ঘুম আসছিলো না এবং মনে-মনে আমি একটা জানলা কামনা করেছিলাম বৈকী। ছোটো হ'লেও ওই ফাঁক দিয়ে একটু-একটু হাওয়া আসছে টের পেলাম, হাওয়ায় বৃষ্টির গন্ধ ছিলো। বেড়ালটা এই জানলা দিয়ে ঢুকেছিলো এবং সম্ভবত আমার বিছানায় আশ্রয় নিতে চেয়েছিলো। আমি জেগে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে পালিয়েছে এখন বুঝতে কষ্ট হ'লো না। জানলায় হয়তো ছিটকিনি ছিলো না। হয়তো এক-আধটা দমকা বাতাস এসে থাকবে তাই একটা পাল্লা স'রে গেছে। দ্বিতীয় পাল্লাটাও হাত বাড়িয়ে খুলে দেবো কিনা চিন্তা করছিলাম, হঠাৎ গরাদের সেই ফিন্‌ফিনে আলোর রেখাটা যেন একটা বড়ো আলো হ'য়ে দপ্‌ ক'রে আমার চোখের সামনে জ্ব'লে উঠলো। খুব চমকে উঠলাম বৈকি। তারপর হাসলাম। 'বউদি এত রাত্রে!' বিছানায় উঠে ব'সে গলা বাড়িয়ে মুখটা আমি জানলার কাছে সরিয়ে নিই। স'রে এসে গরাদের সঙ্গে গাল ঠেকিয়ে অরুণা দাঁড়ায়।

'আপনি ঘুমোননি?'

'না, তেমন ভালো ঘুম আসছে না।'

'নতুন জায়গা।' অরুণা ঠোঁট টিপে হাসলো। 'আমি টের পেয়েছি, আপনি বিছানায় ছটফট করছিলেন।'

আপনাদের বলেছি এমন বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভামণ্ডিত মোহিনী মুখ জীবনে আমি খুব বেশি দেখিনি। থুতনি ঠোঁট নাক কপাল ভুরু ঠোঁটের পিছনে সরু সাদা দাঁতের সারি চোয়ালের ধার লম্বা পালক ঘেরা চোখের বিদ্যুৎ মধ্যরাত্রে আমাকে, হ্যাঁ, রোমাঞ্চিত ক'রে তুলেছিলো। আমি সময়ের অতিরিক্ত সময় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ হ'য়ে রইলাম। গায়ে ব্লাউজ ছিলো না।

পরনে আধময়লা নরুন-পাড় ধুতি। শাড়িটা তখন ভিজে গেছে ব'লে ছাড়া হয়েছে বুঝতে কষ্ট হ'লো না। সুবিনয়ের কাপড় ওটা অনুমান করলাম।

হাঁ-ক'রে অরুণার চোখে চোখ রেখে, এই মেধাবী মেয়ের কাছে আমি ভীষণভাবে ধরা না প'ড়ে যাই তাই চট্‌ ক'রে বললাম, 'না, নতুন জায়গা ব'লে

আমার বিশেষ তেমন অসুবিধা বোধ হয়নি। বেশ ঘুমিয়ে ছিলাম এতক্ষণ, এইমাত্র তো জাগলাম। ক'টা বাজে?'

'একটা বেজে গেলো একটু আগে।' অরুণা আস্তে ডান-হাতখানা গরাদের ওপর রাখলো; সাদা কনুইটা আমার নাকের কাছে চ'লে এলো প্রায়। অরুণার নিশ্বাসপতনের শব্দ শুনলাম।

বললাম, 'এত রাতে আপনি ওখানে? ওটা বুঝি আপনাদের ভিতরের বারান্দা?'

'হ্যাঁ, বাবলুর পেণ্টুলনটা ঘরে থাকলে কাল শুকোবে না ব'লে বাইরে দড়িতে রাখলাম। হাওয়ায় যদি কিছুটা শুকোয়।'

'আপনি তা হ'লে এতক্ষণ ঘুমোননি?'

'না, ওর ছেলেমানুষির সঙ্গে পাল্লা দিলে তো আমার সংসার চলে না। সবাই ঘুমোলে পর এখন একটু বাইরে এলাম। ভালো লাগছে হাওয়াটা।'

'অত্যন্ত খিটখিটে সুবিনয়।'

'সারাদিন খেটেখুটে আসে। চাকর-বাকর নেই। বাইরের কাজগুলো ওর নিজের হাতে করতে হয়। রাত্রের খাওয়া শেষ হ'লো কি, এটা করবে না, ওটা এখন না, শিগগির আলো নেবাও। অর্থাৎ আমাকে ঘুমোতে দাও।'

'হ্যাঁ, সারাদিন পরিশ্রম ক'রে বাড়ি এসে সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়তে চায়। আমি লক্ষ্য করলাম। তাই সুবিনয়ের এত তাড়া আপনার পিছনে।' কথার শেষে একটু হাসলাম।

আমার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করছিলো পাছে-না বাড়িতে আমি রেবাকে এটা-ওটার জন্যে বকাবকি করি কিনা অরুণা প্রশ্ন করে। আমাদের মধ্যে যে এ ওকে ব'লে কাজ করানোর সম্পর্কই গ'ড়ে ওঠেনি সে-কথা ও জানে না তো। কাজেই ভয় হচ্ছিলো, প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ধরা না পড়ি আমি গুলি-খাওয়া বাঘ।

স্ত্রীর ওপর হুকুম চালানোর আগেই ও আমাকে আমার হাত-পা জখম ক'রে দিয়ে চ'লে গেছে। সুবিনয়ের মতো সন্ধ্যাবাতি লাগতে ঘুম-পাওয়া রাত আমার চোখের আগায় দোলে না। আমি নিশাচর।

চেহারা দেখে নারী ব্যর্থ পুরুষকে চিনতে পারে কিনা ভয়ে-ভয়ে অরুণার কালো অতল-গহ্বর চোখের মধ্যে আমি আর-একবার ডুব দিলুম আর ভয়ে-ভয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, সুবিনয়ের যদি আর-একটু আয়-টায় বাড়তো, একটা চাকর রাখার, নিদেন ঠিকে-ঝি রাখার সংস্থান হ'তো।'

আমার ঝি ছিলো কিনা অরুণা প্রশ্ন করলো না। বুদ্ধিমতী প্রসঙ্গটাই এড়িয়ে গেলো।

উঁকি দিয়ে ও আমার বিছানা দেখলো।

'ছারপোকায় কাটে ?'

'না।'

'আপনি আসবেন জেনে তক্তাপোশটায় দুপুরে খুব ক'রে গরম জল ঢেলেছি। সব মরেছে তা হ'লে।'

'তাই মনে হচ্ছে।'

স্বল্প হেসে আমি বিচিত্ররূপিণী আর-এক নারীকে দেখলাম। রেবার সঙ্গে একেবারে মিল নেই। রাগী স্বার্থপর স্নেহমমতাহীন রেবা। এটি মা। স্নেহশীলা জায়া।

এদিক থেকে তো বটেই, তা ছাড়া বিয়ের পর থেকে সুবিনয় স্ত্রীর সঙ্গে আছে এক জায়গায় এক বাড়িতে আজ আট বছরের বেশি—এটা তার একান্ত বন্ধু হিসেবে আমার কাছে মামুলি হ'য়ে গেলেও আজ হঠাৎ সব-কিছু যেন চোখে নতুন ঠেকলো। সতেরো নম্বরের অমুক স্ট্রীটের বাড়ি সুবিনয়ের—কথাটা শুনে-শুনে মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিলো। আজ এই গাঢ় বর্ষার রাত্রে সেই ঘরে আশ্রয় নিয়ে আমি একটা ভাঙা জানলার চারখানা জং-ধরা লোহার শিকের ব্যবধান রেখে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবো এটা আগে জানা ছিলো না।

নতুন, ভয়ংকর নতুন লাগছিলো অরুণাকে। সুসংবদ্ধ সাদা দাঁত দেখিয়ে আর-একবার ও হাসলো। শব্দ ছিলো না হাসিতে। বাঁ-হাতে একটা হারিকেন। ভিতরের চৌবাচ্চা বারান্দা কি পায়খানার জন্যে ইলেট্রিক বাতির ব্যবস্থা নেই তাই তেলের ল্যাম্প। সন্ধ্যার পর ওদিকে যেতে হয়েছিলো ব'লে আমাকে ওই আলো দু-একবার ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু অনেকক্ষণ জলবার পরও চিমনিটার কোথাও এক-আঁচড় কালি পড়েনি লক্ষ্য করলাম। যেমন এত কাজ-কর্ম করার পরও অরুণার হাত পা মুখ ঝকঝক করছিলো।

আলো-সমেত হাতটা কপালে তুলে অরুণা চুল সরালো। তাই চোখ দুটো আরো চিকচিক করতে লাগলো।

'ওই শুনুন, আমাদের কর্তার নাক ডাকছে।' ক্ষীণ হাসলো ও।

আমি মাথা নাড়লাম।

'ঘুমোলে সুবিনয়ের নাক ডাকে। কলেজে পড়ার সময় একবার সুবিনয়ের

সঙ্গে এক-বিছানায় তাদের হোস্টেলে রাত কাটাতে হয়েছিলো ব'লে আমার জানা আছে।'

'বাবলুটার তো এখন থেকেই ঘুমোলে নাক ডাকে। আরো বড়ো হ'লে সে যে কী গর্জন করবে ভেবে এখন থেকেই আমার মাথা গরম।'

'সুবিনয়ের মতো হয়েছে ছেলে।' আমি ক্ষীণ হাসলাম।

কিন্তু গৃহিণী তাতে বিশেষ সাড়া দিলো না।

আমি বললাম, 'নাক-ডাকা-ঘুম ভালো। ঘুম গাঢ় হ'লে তবে নাক ডাকে, ঘুমটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ।'

এবারও অরুণা চুপ ক'রে রইলো।

বললাম, 'সুবিনয়ের বাড়িতে সুনিদ্রা হয় দেখে বাস্তবিক আমার এমন আনন্দ হচ্ছে। আমার বন্ধু ও।' ব'লে সতর্কভাবে বন্ধুপত্নীর চোখের দিকে তাকাই। 'স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে খাটবে কি ক'রে।' কিন্তু এবারও চোখের কোনো ভাবান্তর আমি দেখতে পেলাম না। বরং আগের চেয়েও একটু বেশি গম্ভীর হ'য়ে অরুণা বললো, 'তবু তো আমার মনে হয় ওর ওজন ঠিক নেই। আর-একটু ওজন না বাড়লে চট্‌ ক'রে স্বাস্থ্য ভেঙে যাবে। চল্লিশের ধাক্কায় টিকবে না।'

সুবিনয়ের চল্লিশের কাছে বয়েস উঠেছে। আমার চেয়ে চার বছরের বড়ো সে। কথাটা হয়তো তার স্ত্রীর জানা আছে ভেবে বয়স সম্পর্কে আমি কিছু বললাম না।

'এই শীতে ক'টা ক্যালসিয়াম ইনজেকশন না নিয়ে রাখলে আগামী বর্ষায় নির্ঘাত অসুখে পড়বে। কিন্তু টাকার অভাবে সেটি হচ্ছে না।'

আমি বৃষ্টির ঝিরঝির শব্দ শুনছিলাম।

যেন অরুণাও একটু-সময় সেই শব্দ শুনতে ঘাড় ফেরালো। তারপর আমার দিকে মুখ ফেরালো।

'আমি-ই ব'লে-ক'য়ে ঘরখানাকে দু-ভাগ করিয়েছি। আত্মীয় আসে থাকবে। যখন না থাকে ভাড়া দিয়ে দাও। অতিরিক্ত ক'টা টাকা আসবে। সেটা দিয়ে তুমি বরং শরীরটাকে আরো ভালো করতে চেষ্টা করো, একটু ওষুধপত্র দুধ ডিম খাও। তা শুনতে কি চায়। একেবারে ছেলেমানুষ।'

আমি অরুণার সঙ্গে স্বল্প হাসলাম বটে। ঈর্ষায় আমার নাভিদেশ পর্যন্ত পুড়ে যাচ্ছিলো। সেইজন্যেই এত কিল-চড় বকাবকি বালতির মধ্যে মুহুর্মুহু ঠেসে ধ'রে মেরে ফেলার ঘটা! এত আদর!

বললাম, 'হ্যাঁ, সেজন্যেই সুবিনয় আমাকে এখানে পেয়িং গেস্ট্ হ'য়ে থাকতে পাকড়াও ক'রে নিয়ে এলো', ঠোঁটে একটা মোচড় দিয়ে বললাম, 'বলছিলো তখন এই টাকায়, মানে থাকা-খাওয়া বাবদ পয়লা মাসে যে টাকাটা আমি সুবিনয়ের হাতে তুলে দেবো তা দিয়ে সে আপনার চশমা কিনবে।'

'বলেছে নাকি আপনাকে এ-কথা। ছি-ছি কী মোটা বুদ্ধি লোকটার।'

ব'লে অরুণা আবার ঘাড় ফিরিয়ে ঝিরঝির বৃষ্টির ফোঁটা দেখতে লাগলো। ভিতরে একটুখানি উঠোনে হারিকেনের আলোয় বৃষ্টি পড়ছে দেখা যাচ্ছিলো।

যেন ঘরের ভিতর কোলের বাচ্চাটা ট্যাঁ ক'রে উঠলো। যেন নিশ্বাসের টানা ঘড়ঘড় শব্দ থামিয়ে সুবিনয় একবার জাগতে চেয়েছে। দমকা হাওয়ায় বৃষ্টির চিরচিরে রেখাগুলি বেঁকে বারান্দায় এসে অরুণার কাপড়ের আঁচলটা ভিজিয়ে দিয়ে গেলো।

কিন্তু সে-সব কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সুবিনয়ের স্ত্রী আমার জানলার পাশে আরো ঘন হ'য়ে দাঁড়ায়।

'আচ্ছা লোক! অ্যাঁ?' রিমঝিম বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অরুণা গলাটাকে মোলায়েম ক'রে তুললো। 'শেষটায় আপনাকে আমার চশমার টাকার অভাব হয়েছে ব'লে এখানে ধ'রে নিয়ে এলো, ছি-ছি। আমার ভীষণ লজ্জা করছে।'

লজ্জার হাত থেকে বন্ধুপত্নীকে বাঁচাতে আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, 'না, তাতে কি, আমরা বন্ধু। প্রয়োজনে এক-সময় ছাত্রাবস্থায় এ ওকে টাকা দিয়েও তো সাহায্য করেছি।'

যেন কি-একটু ভাবলো অরুণা।

বৃষ্টির শব্দটা আবার হঠাৎ ক'মে যায়। শিশুটি আর কাঁদে না। সুবিনয়ের নাক পূর্ববৎ স্বাভাবিকভাবে ডাকতে থাকে।

'যাকগে, সেজন্যে আমিও খুব ভাবছি না। আপনি তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। বলেছে দুঃখ নেই। কিন্তু আমিও দেখে নেবো এ-টাকা দিয়ে আমার চশমা আসে কি ওর দুধ। আপনি সাক্ষী থাকবেন ঠাকুরপো।'

'থাকবো।' খুব কষ্টে অস্ফুট গলায় বলতে পারলাম। কেননা, আমার শ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছিলো স্বামী-সোহাগিনী অরুণার সাদা কনুইটা আর-একটু বেশি ঢুকে পড়েছিলো আমার অন্ধকার ঘরে। যেন ঘরের অন্ধকারে একটা কোমল শ্বেতাভ কীলক গুঁজে দিয়ে আগের মতো প্রফুল্ল নিশ্চিন্ত হ'য়ে ও নিশ্বাস ফেলতে পারলো।

'ওর বাল্যবন্ধু, কাজেই আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তার চেয়েও বড়ো আপনি। আপনার ওপর যতটা দাবি খাটে আর কারোর ওপর খাটে না। কথাটা সন্ধ্যেবেলা বলবো ভেবেছিলাম, সুযোগ পাইনি। এখন ও ঘুমিয়েছে তাই বলতে এলাম। টাকা-পয়সা সুবিধামতো যা পারেন আপনি দেবেন, তার জন্যে খুব যে একটা কড়াকড়ি নিয়ম থাকবে আমি তা চাই না। হ্যাঁ, নিয়মের মধ্যে একটা জিনিস আপনাকে মেনে চলতে হচ্ছে, দু-টাকা এক-টাকা পাঁচ দশ কুড়ি —যখনই যা দিচ্ছেন সবটাই যেন আমার হাতে দেওয়া হয়। না, ওর হাতে একটি পয়সা না, বুঝতে পাচ্ছেন ?'

মাথা নাড়লাম। মনে-মনে বললাম এই জন্যেই চোখে ঘুম নেই। কিন্তু সে-কথা আর প্রকাশ করি কি ক'রে !

চুপ ক'রে রইলাম।

হারিকেন-ধরা বাঁ-হাতে আবার কপালের চুল সরালো। আমি বললাম, 'যান, এইবেলা ঘুমোন গে, আমার মনে থাকবে।'

আলস্যের একটা হাই ভেঙে অরুণা কীলকের মতো কনুইটা সোজা ক'রে অন্ধকারে আমার মুখের সামনে ঝুলিয়ে দিলে।

'বউদি বুঝি শিগ্‌গির আসছেন না ?'

'না।'

যতটা সম্ভব গলা সংযত রেখে বললাম, 'সামনে তার এগ্‌জামিন।'

'বাবা, কি ক'রে যে পারে এ-সব মেয়ে স্বামীকে ছেড়ে থাকতে—'অরুণা বৃষ্টির দিকে চোখ ফেরালো। কিন্তু বৃষ্টি তখন নেই। কেবল টিনে জল পড়ার টপটপ শব্দ হচ্ছিলো।

আমি চুপ। আমি চুপ ছিলাম, কেননা ঈর্ষার আগুন আমার নাভিদেশ নিয়ে প'ড়ে না থেকে তখন মাথার ভিতর আগুন জ্বালিয়ে তুলছিলো। বেশি রাত্রি হওয়ার দরুন অনিদ্রায় চোখ জ্বালা করছিলো, কপালের রগ দুটো দপ্‌দপ্‌ করছিলো।

আর বাইরে সেই একঘেয়ে টপটপ-টপটপ আওয়াজ। আমার স্নায়ুর মধ্যে সেই বিশ্রী শব্দটা প্রবেশ ক'রে শরীরটাকে ভয়ংকর ক্লান্ত অবসন্ন ক'রে তুললো।

যেন আর-একটা কি কথা বলতে অরুণা সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়। হাতের আলোটা নড়েচড়ে ওঠে। পিছনে দড়িতে ভিজে পেন্টুলনের ছায়াটা দোলে। কেবল ওর ডিমের মতো ঈষৎ লম্বাটে মসৃণ মুখখানা স্থির। রাত্রির মতো গভীর কালো

চোখ-জোড়ায় পলক পড়ছিলো না। আমি, আমি সময়ের কিছু অতিরিক্ত সময় নিষ্পলক চোখে সন্তানসম্ভবা নারীর রূপ দেখলাম।

'যান,' তিক্ত নীরস গলায় বললাম, 'রাত হয়েছে, ঘুমোন গে। এক আধলাও আমি স্ববিনয়কে দিচ্ছিনে। সব, হয়তো আমার রোজগারের পুরো টাকাটাই আপনার হাতে তুলে দেবো।'

'পাগলের মতো কথা বলছেন।' অরুণা অদ্ভুত চাপা গলায় খিলখিল ক'রে হাসলো। অন্ধকারে যে-হাতটা আমার মুখের সামনে বুকের সামনে ঝুলিয়ে রেখে-ছিলো সেটা আস্তে আন্দোলিত ক'রে বললো, 'সব আমায় দিয়ে দিলে রেবার জন্তে রাখবেন কি। পরে ও এসে আমার চুল ছিঁড়ে খাবে।'

'না, সে আর আসবে না।' কঠিন ক্রুর গলায় কথাটা কোনোরকমে ব'লে শেষ ক'রে আমি হিংস্র উন্মত্ত পশুর মতো ওর অনাবৃত সাদা বাহুটা সজোরে চেপে ধরলাম। যেন প্রতিশোধ নেবার আর-কোনো উপায় ছিলো না ব'লে আমাকে তা করতে হয়েছিলো। আমার হৃৎপিণ্ডের দুব্ দুব্ আওয়াজটাই কানে বাজছিলো শুধু। আর-কোনো শব্দ ছিলো না। যেন টিনের ওপর জল পড়া থেমে গেছে তখন। ঢং-ঢং ক'রে পাশের বাড়ির দেয়াল-ঘড়িতে দুটো বাজলো। আর পার্টিশনের ওপারে নাকের ঘড়ঘড় ধ্বনি।

আশ্চর্য! সময়ের অতিরিক্ত সময় অরুণা আমার বজ্রমুষ্টির মধ্যে ওর নরম তুলতুলে হাতটা ধ'রে রাখতে দিয়ে সরিয়ে নেবার ন্যূনতম চেষ্টা না ক'রে ধীর ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'এ-মাসে ওর চিকিৎসাটা হোক, সামনে আবার আপনার টাকা পেলে ওর জামা কাপড় করাতে হবে. ছি-ছি কী ছিরি হয়েছে পোশাকের, এই নিয়ে তো ও আপিস-কাছারি করছে!'

আমার বজ্রমুষ্টি শিথিল হ'য়ে হাতটা নিচে গড়িয়ে পড়লো।

মঙ্গলগ্রহ

সেদিন বুঝলাম, আমাদের সংসার ছাড়াও সংসার আছে, আমাদের পৃথিবীর বাইরেও পৃথিবী আছে।

অহরহ শোক তাপ অভাব অনটন আধিব্যাধি অর্ধাঙ্গিনীর অব্যক্ত গুঞ্জন এবং আধ-ডজন অপোগণ্ডের দুড়দাড় মাতামাতি একদিন, একদিন অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে থেমে গিয়েছিলো। সবাই অবাক হ'য়ে দেখলো নতুন সেই গ্রহ।

আমরা ভাবতে পারিনি, আমি, আমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরা। যে-বাড়ির ইঁট সিমেন্ট খ'সে পড়ছে, উঠতে-নামতে দুর্বল হৃৎপিণ্ডের মতো সিঁড়িটা কাঁপে, ফুটো ছাদ দিয়ে জল পড়ছে এখন-তখন, সেখানে হঠাৎ শাড়ি গয়নার ঝলক, সাবান পাউডার দামি সিগারেটের ঘি গরমমশলা মাংসের গন্ধ কেমন অদ্ভুত লাগলো। আমাদের ঘরের টিকটিকিটা পর্যন্ত অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখছিলো প্যাসেজের ওপারে লাল আলোয় ভরা জানলাটার দিকে।

সন্ধ্যার দিকে বুঝি এসে উঠেছিলো। এরই মধ্যে জিনিসপত্র জায়গা মতো সাজিয়ে-গুছিয়ে ফিটফাট। কোনো ঝামেলা, কোনো ঝঞ্ঝাট, একটু শব্দ পর্যন্ত না।

রেশনের আটার সংক্ষিপ্ত ক'খানা রুটি গলাধঃকরণ ক'রে আস্তে-আস্তে আমার সন্তানেরা ঘুমিয়ে পড়লো। টারপিনের অভাবে কেরোসিন আর কর্পূরের এক রাসায়নিক মিশ্রণ তৈরি ক'রে গৃহিণী তখন দেয়ালে পিঠ রেখে মেঝেয় ব'সে পায়ে মালিশ করছে। আর আমি, লাল-ফিতে-বাঁধা আপিসের ফাইল সামনে নিয়ে ব'সে কখনো ঢুলছি, হাত দিয়ে মশা তাড়াচ্ছি একেক বার। লাল, মঙ্গলগ্রহের মতো লাল স্তব্ধ সেই ঘরের দিকে চোখ পড়তে সত্যি আর চোখ ফেরাতে পারলাম না।

সস্তা বাড়িতে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা থাকে না। আমি কখনো মোমবাতি, কোনোদিন রেড়ির তেল দিয়ে কাজ সারি। কেরোসিন যা যোগাড় করি হেমলতার বাতের দৌলতে নিঃশেষ হ'য়ে যায়। তেমনি এ-বাড়ির অন্য সব ঘরে। কারো টিমটিমে, কারো-বা তা-ও না। কাজেই অন্ধকার এই জগতে

এমন চমৎকার আলোয় টলটলে একটা ঘর যদি অনেক রাত অবধি জেগে থাকে সেদিকে চেয়ে আপনিও কি জেগে থাকবেন না! তাকিয়ে থেকে ভাববেন, এরা কারা। কেমন এই নতুন গ্রহের বাসিন্দারা। বুঝলাম হাজাক জলছে। আর ডোমটা সাদা না হ'য়ে লাল হওয়াতে ঘরটা যেন আরো সুন্দর রহস্যময় হ'য়ে উঠেছে। আমার চোখের পলক পড়লো না। মেয়েটি মেয়ে কি মহিলা তখন ঠিক বুঝলাম না। জানলার কাছে দু-বার এলো। একবার একটা ডিশ নিয়ে গেলো, একবার এসেছিলো সস্প্যান নিতে। থমথমে যৌবন, বিশাল বিকশিত খোঁপা। নিশ্বাস বন্ধ ক'রে আমি চুপ ক'রে দেখছিলাম। অনেক রাতে একটা লোক ঢুকেছিলো ঘরে। রোগা টিংটিঙে টাই-স্যুট পরা। যেন অনেক হাঁটাহাঁটি ক'রে অনেক ক্লান্তি নিয়ে এখন এখানে তার আশ্রয়। সিগারেট টানলো ওই জানলার ধারে ব'সে আট-দশটা। দৃশ্যটা আর ভালো লাগছিলো না ব'লে শুয়ে পড়লাম। যেন লোকটা না হ'য়ে সেই মেয়েটি যদি আরো দু-একবার জানলায় আসতো, একটু দাঁড়াতো, ভালো লাগতো। শুয়ে-শুয়ে ভাবলাম, কালো-স্যুট-পরা মূর্তিটা চাঁদের কলঙ্কের মতো হুট্‌ ক'রে ওখানে এসে ওটা কেন জুটলো। বেশ তো ছিলো।

সকালে অবশ্য আমার সংসার আগে জাগে, তারপর পাশের ললিত নন্দীর ঘর, ফালু পালের। আমরা কেরানী, আমাদের আগে জাগতে হয়। এখন আমাদের সংসারে শব্দ বেশি, তাড়াহুড়া খুব। চিৎকার ক'রে ছেলে দুটো ইস্কুলের পড়া তৈরি করছে, প্রীতি বীথি অর্থাৎ আমার বড়ো দু-মেয়ে রান্নাবান্না করছে। অসাড় পা দুটো মেঝের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে হেমলতা চালের কাঁকর বাছচে। আড়চোখে ওদিকে চেয়ে দেখলাম প্যাসেজের ওপারে পার্টিশনের গায়ে হলদে রোদ এসে গেছে। কিন্তু সেখানে এখনো ঘুম। দরজাটা বন্ধ।

না, রাত্রে ওদের ঘরের উজ্জ্বল আলো আর আমাদের ঘরের রেড়ির বাতির বৈষম্যটা যতই চোখে লাগুক, যতই উজ্জ্বল ও অদ্ভুত ঠেকুক না কেন, এখন, সকালে, যখন একই রকমের বিবর্ণ ধূসর কাকগুলোকে ওদের ছাতের কার্নিশে এবং আমার ঘরের কার্নিশেও ব'সে থাকতে দেখলাম তখন অনেকটা স্বস্তি পেলাম। হোক বড়লোক—ভাবলাম—এক বাড়িতে যখন ঘর ভাড়া নিয়েছে তখন সেই শ্যাওলা-পড়া পুরোনো চৌবাচ্চার জলই মুখে দিতে হবে, পচা ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হবে। উপায় নেই। ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীর মনের ভাবটা হ'লো আমার। হঠাৎ যদি সচ্ছল সম্ভ্রান্ত কোনো যাত্রী এসে ওই কামরায় ঢোকে এবং একই বেঞ্চিতে আমার পাশে বসে তখন কি এই ভেবে উৎফুল্ল হবো না যে

আমার অসুবিধাগুলি তোমাকেও ভোগ করতে হবে, বৈষম্যটা অন্ততঃ এদিক দিয়ে থাকবে না। ধীরে-ধীরে আলাপ-পরিচয় যে না হবে তা-ই বা কে বলতে পারে এবং তাই তো স্বাভাবিক। নিমের দাঁতন নিয়ে দাঁত সাফ করার অছিলায় ওদিকের পার্টিশন-সংলগ্ন দরজাটার দিকে অনেকক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়েছিলাম। যেন একটা কাজ পেয়েছি।

হঠাৎ পিছনে যেন কে এসে দাঁড়ালো।

'বাবা স্নান করো, অফিসের বেলা হ'লো।'

চমকে উঠলাম। প্রীতি। রুষ্ট হ'য়ে উঠি।

'অফিসের বেলা হ'লো আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না ?'

প্রীতি একটু অবাক হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকায়। কেননা বেলা আটটা না বাজতে আমার তরফ থেকে রোজ রান্না নামানোর তাগিদ হয়, ওরা দু-বোন জানে। চুপ ক'রে ঘরে ঢুকলাম।

দেখি আমার বড়ো ছেলে মন্টুর কাঁদো-কাঁদো চেহারা। রাগ আরো বেড়ে গেলো।

'কি হয়েছে শুনি ?'

'আমার জ্যামিতি পড়া তুমি আর বুঝিয়ে দিলে না বাবা।'

'অফিসের চরকায় তেল দিয়ে কূল পাই না, তোর পড়া দেখিয়ে দিই কখন।'

চুপ হ'য়ে গেলো মন্টু। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে খেতে বসি। ভাত দেয় ছোটো মেয়ে বীথি। বুঝি হাত থেকে চার-ছটা ভাত গড়িয়ে মাটিতে পড়েছে। রীতিমতো গর্জন ক'রে উঠলাম। 'একটু সাবধান হবি—অমন ক'রে জিনিস লোকসান ক'রে আমায় রাস্তায় বসাবি নাকি। যে-কোনো-দিন রেশন বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে।'

অধোমুখে বীথি সামনে থেকে স'রে গেলো। সাদা নিষ্প্রভ দুটো চোখ মেলে হেম আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, ওর মুখের দিকে না তাকিয়েও বেশ টের পাই। কর্পূর-কেরোসিনের গন্ধটাও যেন নতুন ক'রে নাকে এসে লাগে।

জামা-কাপড় প'রে ধনেচাল চিবোতে-চিবোতে যখন বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, দেখি প্যাসেজের ও-পাশের দরজা খুলেছে। এতক্ষণে ঘুম ভাঙলো। এবং ঘুম যে ভেঙেছে চোখেই দেখতে পেলাম। শুকনো খোঁপার আধখানা মুখ থুবড়ে ঘাড়ের ওপর পড়েছে। ভাঙাচোরা আঁচলের ঢেউ। শরতের কাঁচা রোদ গালে কানে পিঠে লেগেছে। মেয়েটি—মেয়ে কি মহিলা তখনো ধরা গেলো না—

ওদিকের গলির দিকে মুখ ক'রে রেলিং ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। তাই মুখখানা ভালো দেখা হ'লো না।

অবশ্য বুঝলাম রাত্রে দু-বার যাকে জানলায় দেখেছিলাম। একবার এসেছিল ডিশ নিতে, একবার এসে একটা সস্প্যান নিয়ে গেলো। যেন জানলার গায়ে ঠেকানো ছোট একটা সেলফ্ বসানো হয়েছে ও-ধারে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে রাত্রের ছবিটা ভাবি।

রাস্তায়, এমন কি ট্র্যামের ভিড়ে দাঁড়িয়েও রৌদ্রে-দাঁড়ানো সেই মূর্তিটা মনে-মনে আঁকি। অফিসে লেজারের সামনে ব'সেও। তারপর সেই স্যুট-পরা আদমীর চেহারা যখন মনে পড়লো ভিতরটা কেমন ভার হ'য়ে গেলো। কাজে মন দিলাম।

বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখি মন্টুর হাতে চকোলেটের বাক্স, ফন্টুর হাতে আপেল।

'কোথা পেলি এ-সব, কে দিলে ?' চোখ বড়ো হ'য়ে গেলো আমার।

প্রীতি পেয়েছে ব্লাউজের টুকরো, বীথি পেয়েছে শাড়ি।

'কে দিয়েছে শুনি না ?'

'লীলাদি,' বীথি বললে খুশি চোখে।

'খুব বড়োলোক,' প্রীতিও সামনে এলো। 'লীলাদির বর ইঞ্জিনিয়ার।'

আমার কাপড় জামা বদলানো হ'লো না। হাত-মুখ-ধোওয়া নেই। হাতে নিয়ে জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে দেখছি। 'পাটনা থেকে এসেছে ছুটিতে,' বললে বাথি, 'ভালো বাড়ি পাওয়া গেলো না, তাই এখানে।' বীথির মুখের দিকে উৎসুক চোখে তাকাতে যাবো এমন সময় দরজায় ছায়া পড়লো।

মেয়ে নয়, মহিলা।

খোঁপায় চওড়া কালো-পাড় আঁচল উঠেছে। জোড়া ভুরু ধনুকের মতো বাঁকা। তনু মধ্যম গড়ন। জীবনে এই আমি প্রথম দেখলাম পরিপূর্ণ যৌবন।

প্রীতি বীথি বাইশ উনিশে পা দিয়েছে। যৌবনের দেখা পায়নি ওদের শরীর। আর সেই বীথি যখন পেটে, কুড়ি বছর বয়স থেকেই হেমলতার বাত, তখন থেকে আজ অবধি দু-পায়ের ওপর সোজা হ'য়ে ও দাঁড়াতে পারেনি। আমার চোখ তখন মাটির দিকে, স্যাণ্ডেলের ফাঁকে, পায়ে আলতার ছোপ।

'এই অফিস থেকে ফিরলেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ,' ঘাড় তুললাম, মুখখানা আবার দেখলাম। কপালে হাত ঠেকিয়ে মহিলা নমস্কার জানালে। আমিও।

'একটু কষ্ট করবেন,' চৌকাঠের গায়ে একটা হাত রাখলো লীলাময়ী, এক-পা বাড়ালো সামনে। 'ওকে দিয়ে তো কাজ হবে না, কলকাতায় এসেছে কেবল ঘুরতে। সারাদিন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা ফুরোয় না।'

হেসে বললাম, 'বলুন, কিছু করতে হবে?'

লীলাময়ী হাসলো লজ্জায়, নাকি চট ক'রে আমি রাজী হয়েছি ব'লে! 'একটু মাংস এনে দিতে হবে বাজার থেকে।'

'ও আবার একটা কাজ,' নুয়ে পড়েছিলাম, সটান সোজা হ'য়ে দাঁড়ালাম। 'এখুনি এনে দিচ্ছি।'

চোখে ঠোঁটে হাসির ঝলক লেগে আছে তখনো। লীলাময়ী হাত বাড়িয়ে একটা দশ টাকার নোট দিলে।

'দু-বার ভেবেছি আপনাকে বলবো কিনা, আমার তো আর লোকজন নেই।'

'গ্যাখো কথা,' হেসে বললাম, 'এতে লজ্জার কি আছে, তবে আর একবাড়িতে থাকা কেন।' ব'লে প্রীতির চোখের দিকে তাকালাম। ও অন্যদিকে চোখ সরিয়েছে। বীথি নেই আর সেখানে।

'আপনার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে,' লীলাময়ী বললো, 'আমাদের বউদি বুঝি ইন্‌ভ্যালিড?'

কৃতার্থের হাসি হেসে চৌকাঠ পার হ'য়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। আমার পিছনে ও সিঁড়ি অবধি এলো।

'নতুন জায়গায় এসে উঠলে কত কি দরকার, ওর তো কোনোদিকে মনোযোগ নেই, কী মুশকিলে না পড়েছি আমি।'

'আ, কেন আপনি মন খারাপ করছেন।' নির্জন সিঁড়ি পেয়ে আমার গলা আরো ঝরঝরে হ'য়ে গেলো। 'যখন যা দরকার বলবেন, এটুকুন উপকার যদি না করলুম তবে আর একত্র বসবাস কেন।' নিবিড় পরিচ্ছন্ন যৌবনের সামনে দাঁড়িয়ে আমার শুকনো বুকের ভিতরটা কাঁপছিলো। চোখে পলক পড়লো না।

'বেশ কচি পাঁঠার মাংস হয় যেন।'

'তা আর বলতে হবে না।' লম্বা পা ফেলে বাজারের দিকে ছুটলাম।

এই লীলাদি। লীলাময়ী বা লীলাবতীও হ'তে পারে। আমার যেন লীলাময়ী মনঃপূত হ'লো। একদিনে এতটা অগ্রসর, এ যেন স্বপ্নের অতীত।

না, এমন পরিষ্কার স্বচ্ছ চোখে কোন নারী আমার দিকে তাকায়নি, এমন সুন্দর সহজ গলায় কথা বলেনি। আমার যৌবনের বা কেরানী-জীবনের ইতিহাসে তার চিহ্ন নেই। আমার নিজের মেয়ে তো প্রীতি বীথি। বলতে পারো বয়স হয়েছে আজো পাত্রস্থ করা হয়নি ব'লে মন ভার, মুখ ভার। কিন্তু ভালো ক'রে বাপের সঙ্গে দুটো কথা বলতে আপত্তি কি। ভয়ে চোখে-চোখে তাকায় না, যেন আমি দানো, খেয়ে ফেলবো কি গিলে ফেলবো। সুন্দর চোখের কথা না-হয় না-ই বললাম। আর তাকাবে কে? হেমলতা? মরা মাছের মতো সাদা ফ্যাকাসে চোখ দুটো মেলে ও আমার দিকে তাকায় ঠিক বলা চলে না, কোনোমতে জেগে থাকে। নীচে কলতলায় ললিত নন্দীর বউ-এর সঙ্গে একদিন চোখাচোখি হয়েছিলো, হয়েছিলো মানে হবার উপক্রম হচ্ছিলো, সাত হাত এক ঘোমটা টেনে হাতের শূন্য বাল্‌তি চৌবাচ্চার ধারে রেখে স'রে গেছে আমাকে কল ছেড়ে দিয়ে। ফালুর জেনানাকে আমি কলতলায় দূরে থাক, কোনোদিন জানলায় ভাসতেও দেখলাম না। আর তাকাবে কে? ট্র্যামে-বাসে? পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েসের কোনো কেরানীর দিকে কেউ কি কখনো তাকায়?

পাঁচ-সাতটা দোকানে ঘোরাঘুরি ক'রে কচি ও তাজা পাঁঠার মাংস যোগাড় ক'রে বাড়ির দিকে চললাম। ভাবছি তখন, ভাবতে-ভাবতে চলেছি। কথাটা কানে লেগে আছে: ওর কোনোদিকে মনোযোগ নেই। মনোযোগ যে নেই কাল রাত্রে দূর থেকে একবার দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। ফিরিঙ্গি ছোঁড়াদের মতো বাউণ্ডুলে চেহারা। আট-দশটা সিগারেটই শেষ করলো জানলায় দাঁড়িয়ে। হাওয়া-খোর।

সিঁড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম। আমার অন্ধকার ঘর। বুঝলাম আজ মোম, রেড়ি কোনোটাই যোগাড় করা হয়নি। যদি-বা কিছু সঞ্চিত থাকে আমার অপেক্ষায় রেখে দেওয়া হয়েছে। তেমনি ফালুর ঘর অন্ধকার। ললিতের ঘরে টিম্‌টিমে কি-একটা জ্বলছে যেন। না-থাকার সামিল। কেবল একটি জানলায় তীব্র উচ্ছ্বসিত আলোর বন্যা। সত্যি যেন আমাদের ঘরের পাশে নতুন এক গ্রহ এসে বাসা বেঁধেছে।

প্যাসেজ পার হ'য়ে পার্টিশনের কাছে যেতে ও বেরিয়ে এলো। যেন এইমাত্র কল-ঘর থেকে ফিরেছে। হাতে একটা ভিজে তোয়ালে, এলোচুল। বৃষ্টি-ধোওয়া কদমফুলের সৌরভের মতো মিষ্টি একটা গন্ধ আমার নাকে লাগলো।

'আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম।'

'কেন ও-কথা ব'লে বার-বার মনে কষ্ট দিচ্ছেন।' মাংসের পুঁটুলি লীলাময়ীর পায়ের কাছে সিমেণ্টের ওপর রাখলাম।

'একটা চাকর পর্যন্ত না,' মুয়ে পুঁটুলিটা ও হাতে তুলে নিলে। 'আমরা যখন ছুটিতে যাচ্ছি চাকর দুটোকে ছেড়ে দাও, ঘুরে আসুক ক'দিন দেশ থেকে— কী বুদ্ধিমানের কথা শুনুন—কলকাতায় ঢের লোক পাওয়া যাবে।'

বুদ্ধিমানটি কে আন্দাজ করতে কষ্ট হ'লো না। এবং বুদ্ধির বহরটা আরো বড়ো ক'রে দেখাবার সুযোগ এলো আমার, গম্ভীর গলায় বললাম, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদলেও চাকর জুটবে না, বাড়ি পাওয়ার মতোই কঠিন। উনি এখনো ফেরেননি বুঝি ?'

'রাত বারোটার আগে!' কৌতুকোজ্জ্বল কালো চোখ আমার মুখের ওপর মেলে দিয়ে যুবতী হাসলো। 'ভালো লোক ঠাওরেছেন।'

'রোজই এমন করেন নাকি ?' কৌতূহল খুব বেশি হ'লো, একটু হাসলামও। 'অনেক রাতে ফেরেন বুঝি ?'

'রোজ, চিরকাল।' যেন চিরকালের এই অভ্যাসটা ধাতস্থ হ'য়ে গেছে লীলাময়ীর, খারাপ লাগে না, নইলে এমন ঝরঝরে গলায় হাসবে কেন। 'ওখানে যেমন করেছে, এখানে এসেও দেখছি তাই, বন্ধুর ওর শেষ নেই, হয়তো দুপুর রাতে এসে বলবে, খেয়ে এসেছি অমুকের বাড়িতে, কি অমুকের সঙ্গে হোটেলে, আমি খাবো না, এই রকম।'

রকমটা কি ভালো ? মুখ দিয়ে আমার প্রায় বেরিয়ে পড়েছিলো, গম্ভীরভাবে বললাম, 'না, এতটা বাড়াবাড়ি ঠিক না।'

চৌকাঠের ওপর চোখ রেখে কি যেন ও ভাবলো। নাকি ভাবনা ঝেড়ে ফেলার জন্য ফের লীলাময়ী ঠোঁটে হাসি টেনে আনলো। এবার আমার প্রসঙ্গ।

'বেশ পরিশ্রম করতে পারেন আপনি।'

'নিশ্চয়,' দৃপ্ত পৌরুষের গলায় বললাম, 'পুরুষের এত গা ভাসিয়ে দিলে সংসার চলে না। সন্ন্যাসী বাউলের সংসার নেই।' ইঙ্গিতটা ইচ্ছা ক'রেই একটু ভালোর দিকে রাখলাম।

ছুরির ফলার মতো ধারালো চকচকে দুটো চোখ আমার আপাদমস্তক বিদ্ধ করলো। ছেঁড়া জামা আমার ? ছেঁড়া জুতো গরিব কেরানী ? না, এ চাউনির অর্থ অন্যরকম। এ স্বতন্ত্র।

'এই অফিস থেকে ফিরলেন, এই আবার ছুটলেন বাজারে, একটু আলসেমি নেই।'

'আলসেমিটা মনের,' ঠোঁট টিপে হাসলাম, 'নাকি এ-বয়সে এতটা ছোটাছুটি মানায় না বলছেন আপনি?'

কিছু বললো না, লীলাময়ী ঠোঁট টিপে হাসলো।

বললাম, 'যাই, আপনার কাজকর্ম আছে।'

'হ্যাঁ, তা আছে বৈকি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে যুবতী ঘাড় ফেরালো, শরীর ঘোরালো। অপরূপ দীর্ঘ দেহ। ঘন চকচকে ছোপ দেওয়া শাড়ি পরনে। মনে হ'লো মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যে নিঃশব্দচারিণী কোনো বাঘিনী। মাংসের পুঁটুলিটা হাতে ক'রে চৌকাঠের ওপারে পার্টিশনের আড়ালে অদৃশ্য হ'লো। সুন্দর, গর্বিত, নির্ভীক। আমি চেয়ে রইলাম।

ঘরে ঢুকতে অন্ধকারে একটা ফুঁসফাঁস শব্দ কানে এলো। মেজাজ কেমন গরম হয়, ভাবুন একবার। দরজার কাছে, অনুমান করলাম, বীথি ওটা।

'কি হয়েছে শুনি, কাঁদছে কে?'

'মণ্টু।' বুঝলাম প্রীতির গলা। 'ইস্কুলে জ্যামিতি পড়া দিতে পারেনি, মাস্টার মেরেছে।'

'বেশ করেছে,' হাল্কা গলায় বললাম, 'এক-আধটু মার খাওয়া ভালো।'

প্রীতি আধ-ইঞ্চি সেই মোমের টুকরোটা জ্বাললো। জামা কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে খেতে বসলাম। বললাম, 'এ-বয়সে ইস্কুলে সবাই মার খায়। মার না খেয়ে কেউ মানুষ হয়েছে? উকিল, মোক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কেরানী, প্রোফেসার—মার একদিন সবাই খেয়েছে।' মণ্টু আমার কথাগুলি কান পেতে শুনলো। প্রীতি, বীথি, ফণ্টু আর ওদের মা। যেন এমন মিষ্টি কথা আমার মুখ দিয়ে কোনোদিন বেরোয়নি। গলামোমের মাঝখানে সল্‌তের টুকরোটা সাঁতার কাটতে-কাটতে ফুটুস ক'রে এক-সময়ে নিভে গেলো। আমারও খাওয়া হ'য়ে গেছে। এবং অন্ধকার ঘরে ব'সে থাকার কোনো মানে হয় না বা এতগুলি মিষ্টি কথার পর আবার কি অপ্রিয় কথা ব'লে হেমলতার সংসারকে হতচকিত ক'রে দিই এই ভয়ে আস্তে-আস্তে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ললিতের ঘরের টিম্‌টিমে আলোটাও নিভে গেছে এখন। পাড়াটাই ঝিম্ মেরে যায় রাত আটটার পর। তাই ও-ঘরের লাল-আলো-জ্বলা জানলাটা আরো বেশি কাছে মনে হচ্ছে যেন। হাত বাড়ালে নাগাল পাবো।

পায়ের শব্দ শোনা যায় ? বাসনের ঠুন্‌ঠান্‌ আওয়াজ ?

কান পেতে রইলাম। দেখলে মনে হয় যেন ও-ঘরে এই সবে সন্ধ্যা নেমেছে, গা ধুয়ে চুল বেঁধে পরিপাটি ক'রে লীলাময়ী রাঁধতে বসেছে। আঁটোসাঁটো নিটোল নিখুঁত মূর্তি আমার চোখের সামনে ভাসছে। ধ্যানস্থের মতো জানলাটার দিকে চেয়ে রইলাম। না, এদিকে কিন্তু একবারও এলো না, ডিশ বা বাটি নিতে। কেবল ওদিকের দেয়ালে একবার গোল-মতো একটা ছায়া দেখলাম। বুঝলাম দেয়ালে-ঢাকা ওই অংশটায় ব'সে লীলাময়ী রাঁধছে। আর উল্টোদিকে ছায়া পড়েছে। একবার কাঁপছে আবার স্থির হ'য়ে আছে।

বিড়িটা নিভে যেতে আর-একটা ধরাতে যাবো হঠাৎ যেন নিচের সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। ইঞ্জিনিয়ার ?

শ্বাস বন্ধ ক'রে কান পেতে রইলাম। আর শব্দ নেই। বোঝা গেলো ইঁদুর। পুরোনো বাড়িতে ইঁদুরের উপদ্রব বেশি। ময়লা বেরোবার পাইপ বেয়ে নির্বিবাদে ওরা ওপরে উঠে আসে। মোটা ধোঁয়া-রঙের বিশাল এক-এক ইঁদুর।

লীলাময়ীর ঘরে ইঁদুর ঢোকে ? কথাটা কেন জানি মনে হ'লো। জানলার দিকে চেয়ে ঢোক গিললাম। কল্পনা করলাম, সত্যি যেন একটা নোংরা হোঁৎকা ইঁদুর ঢুকেছে ও-ঘরে। লীলাময়ী আঁৎকে উঠবে ভয়ে ? না চিৎকার ক'রে উঠবে ! না রাগে দাঁত ঘঁষে হাতের তপ্ত খুন্তিটা ইঁদুরের মস্তকে ফুঁড়ে দেবে ! নাকি ঘাড় ফিরিয়ে নরম ঠাণ্ডা চোখে একবার মাত্র তাকাতে বাসনকোষনে গা না ঠেকিয়ে ইঁদুরটা ভালোমানুষের মতো লীলাময়ীর সাদা সুন্দর পায়ের কাছ দিয়ে সুড়সুড় ক'রে নর্দমার পথে বেরিয়ে গেলো।

তাই—তাই হবে। এ তো আমাদের ঘরে ইঁদুর ঢোকা নয় যে ওটাকে দেখেই মালিশরতা হেমলতা যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠবে, প্রীতি বীথি মোটা থপ্‌থপে পা ফেলে ঝাঁটা নিয়ে আসবে ছুটে ইঁদুর মারতে, মণ্টু ফণ্টু ঘরময় দাপাদাপি করবে, সে এক কাণ্ড ! শুনলাম দূরের পেটা-ঘড়িতে ঢং-ঢং ক'রে দশটা বাজলো।

পা বদল ক'রে ফের রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়াবো এমন সময় প্যাসেজের ওপারে পার্টিশনের দরজা ন'ড়ে উঠলো। প্রথমে আলোর একটা রেখা, তারপর আলোর রেখার মতোই উজ্জ্বল দীর্ঘ সেই দেহ। বুকের ভিতর ঢুব্‌ঢুব্‌ করছে আমার। প্যাসেজের মাঝামাঝি যখন এলো মুখখানা আর ভালো দেখা গেলো না। আশ্চর্য, লীলাময়ী এদিকেই আসছে, আমার ঘরের দিকে।

রেলিং ছেড়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম।

'ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে ? ছেলে-মেয়েরা ?'

'প্রীতি বীথি ? মণ্টু-ফণ্টু ?' বললাম, 'কিছু দরকার আছে ?'

'একটু কারী খাবে ওরা।'

অন্ধকারে আন্দাজ করলাম ওর হাতে অ্যালুমিনিয়ামের একটা বাটি।

'এত রাত্রে ওটা আপনি হাতে ক'রে এনেছেন! তা ছাড়া ওইটুকুন তো ছিলো, আমি নিজে বাজার করেছি।'

'তাই ব'লে সব একলা খেতে হয়!' হাসলো লীলাময়ী, অন্ধকারে বৃষ্টির ফোঁটার মতো সে-হাসির শব্দ।

বললাম, 'তা ছাড়া ঘুমের চোখে উঠে খাবে, স্বাদ বুঝবে না, কাল হয়তো আপনাকে রান্নার নিন্দেই শুনতে হবে।'

'বেশ তো, আপনি জেগে আছেন, একটু চেখে স্বাদ বুঝে রাখুন, সাক্ষী থাকবেন।'

'অর্থাৎ আমার জন্যেও এসেছে,' হেসে হাত বাড়িয়ে বাটিটা নিলাম। 'পারতাম খেতে খুব এককালে মাংস—এখনো, এখনো পারি এমন—'

'না পারার আছে কি,' অন্ধকারে আর-এক ঝলক হাসি উঠলো। দাঁত ক'টি সকালে নড়বে ব'লে তো মনে হয় না।'

মনে পড়লো, সন্ধ্যাবেলা সামনে যখন দাঁড়িয়েছিলাম ধারালো চকচকে চোখে ও আমার দাঁতগুলির দিকেও দু-বার তাকিয়েছিলো।

'আপনার তো খাওয়া হয়নি '

'এইবার খাবো, নাকি রাত দুপুর অবধি আমিও জেগে ব'সে থাকবো খাবার সামনে নিয়ে ? চললাম—'

হাসলো ও, যেন তারের যন্ত্রে ছড় টেনে গেলো।

মাথার ভিতর ঝিম্‌ঝিম্ করছিলো। না, এ আমাকেই দেওয়া, আমাকেই দিতে আসা। আমার ঘর রাত আটটা থেকে নিভে গেছে, ঘুমে তলিয়ে আছে, পাঁচ-সাত হাত দূরে আর-এক ঘরে ব'সে ওর টের না পাওয়া খামোকা কথা।

মনে মনে হাসলাম। কেননা একটা ছবি তখন আবার মনে এসে গেছে। টিং-টিং ক'রে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরছে পেণ্টুলন-পরা সেই মূর্তি। বন্ধুর আড্ডা ছেড়ে আর-এক বন্ধুর আড্ডায়। সিগারেটের ধোঁয়া হ'য়ে চিরকাল তুমি উড়তে থাকো, ভেসে যাও, বললাম মনে-মনে।

সোজা চ'লে গেলাম নিচে কলতলায়। জায়গাটা এখন সর্বজনপরিত্যক্ত। নিরাপদ।

না, প্রীতি বীথিকে অর্থাৎ হেমলতার সংসারকে আর নাড়া দিলাম না এই ভেবে, ওদের মন পরিষ্কার নেই। বিশেষ ক'রে বুড়ি মেয়ে দুটো। আমি মহিলার সঙ্গে কথাবার্তা বলি ওটা যেন ওরা পছন্দ করে না এমন ভাব। না হ'লে সকালে আমার অফিসে যাওয়া নিয়ে বীথির অত মাথাব্যথা উঠেছিল কেন? সন্ধ্যাবেলা আমি ঘরে না ফেরা তক প্রীতি অন্ধকারে চৌকাঠে দাঁড়িয়েছিলো কেন? এখন এই মাংসের ব্যাপারটাও ভালো চোখে দেখবে না। দেখতে পারে না কুটিল যাদের মন।

চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়িয়ে গরম উপাদেয় মাংসখণ্ডগুলি একে-একে সব সাবাড় ক'রে বাটিটা জলে ভিজিয়ে রেখে মুখ-হাত ধুয়ে ওপরে উঠে এলাম। এসে আবার আগের জায়গায় রেলিং ধ'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এবার পরিষ্কার চোখে পড়লো, জানলার ওপারে, টেবিলের ওপর থালা রেখে লীলাময়ী খেতে বসেছে। দেখলাম অনেকক্ষণ ধ'রে ওর ধীরেসুস্থে চিবিয়ে রসিয়ে খাওয়া, তারপর হাত-মুখ ধোওয়া, মুখ মোছা, পান খাওয়া, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পানের রসে রাঙানো ঠোঁট উল্টেপাল্টে দেখা। আঁচলটা কাঁধ থেকে প'ড়ে গেছে। আলস্যে মন্থর। একদিকের দেওয়াল থেকে লীলাময়ী অন্য দেয়ালে চোখ ফেরালো, এলো একেবারে জানালার কাছে। জানি না রেলিং ঘেঁষে দাঁড়ানো আমার আবছা মূর্তি ওর চোখে পড়েছিলো কি-না, ঈশ্বর জানে, তবে আমি তো দেখলাম অন্ধকার চোখ রেখে ও ব্লাউজের হুক্ খুললো।

অবশ্য একটু পরেই আলো নিভলো। আমার দু-কান দিয়ে তখন গরম হাওয়া বইছে। যেন কান পেতে শুনতে পেলাম মঙ্গলগ্রহের অন্ধকার গুহায় যৌবনতপ্ত শরীরের এ-পাশ থেকে ও-পাশ ফেরার শব্দ।

আস্তে-আস্তে ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। সেই পেন্টুলন-পরা আদমী রাতের কোন্ ভুতুড়ে প্রহরে ঘর নিয়েছিলো জেগে ব'সে থেকে দেখবার আমার দরকার ছিলো না। আমাদের মধ্যে ও ছিলো না।

সকালে বড়ো একটা নিমের ডাল নিয়ে দন্তধাবনে ব্যস্ত ছিলাম। একটা-কিছু না ক'রে এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকিই বা কি ক'রে। তবু বীথি, কুবুদ্ধির হাঁড়ি, দু-বার দরজায় এসে উঁকি দিয়ে গেছে। দেখুক। আমার বারান্দায় আমি দাঁড়িয়ে আছি এ তো আর কেউ অস্বীকার করবে না। অটল

ও অনড় হ'য়ে আমি ওধারের দরজার গায়ে হলদে রোদের পরিধিটা মনে-মনে জরিপ ক'রে চললাম। যেন আজ আরো বেশি বেলা হচ্ছে। ঘুম আর ভাঙে না।

এক-সময়ে দরজা ন'ড়ে উঠলো। ইতস্তত করছিলাম নিমের ডালটা মুখ থেকে নামিয়ে নেবো কিনা, তার আগেই দরজা ফাঁক হ'লো।

বেরোলো, সে নয়, টাই-স্যুট-পরা তালপাতার সেপাইটি।

বিরক্ত হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে নিই। এতৎসত্ত্বেও ছোঁড়া আমার দিকেই এগিয়ে এলো। হাসি-হাসি চেহারা।

'দয়া ক'রে একটা রিক্‌শা ডেকে দিন না।'

নিমের তিক্তরসমিশ্রিত একটা ঢোক গিললাম। রইলাম চুপ ক'রে।

'আপনি কুলদাবাবু?'

'কুলদারঞ্জন পাইন', মুখ খুলতে হ'লো এবার, 'পার্কার অ্যাণ্ড পার্কার কোম্পানীর সিনিয়র-গ্রেড ক্লার্ক। এ-বাড়িতে আমি সতেরো বছর।' ভাবলাম, পাটনায় তুমি ইঞ্জিনিয়ার না লাটসাহেব, এখানে কি।

'তাই বলছিলো ও।' মাথা নেড়ে কাপ্তেন নতুন সিগারেট ধরালো। 'খুব করছেন আমাদের জন্যে, শুনলাম।'

মনটা একটু নরম হ'লো।

'না, খুব আর কি,' বললাম, 'এক জায়গায় থাকতে গেলে এমন—'

'ছাট্‌স রাইট, ও তাই বলছিলো আপনি থাকাতে আমাদের অনেক সুবিধে হচ্ছে।'

'আবার বেরোনো হচ্ছে বুঝি?'

'হ্যাঁ, এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে, ইফ্‌ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, দয়া ক'রে একটা রিক্‌শা ডেকে দিন না।'

'ও আবার একটা কাজ নাকি।' রাগটা একদম চ'লে গেছে তখন আমার। 'আমি এখুনি ডেকে দিচ্ছি।'

'ছুটিতে এলাম, ওদের সবাইর সঙ্গে দেখা না-করাটা কি ভালো?'

'সে তো ঠিকই, কেন দেখা করবেন না। না-করার আছে কি।' হৃষ্টমনে নিচে গিয়ে রিক্‌শা ডেকে আনি। 'বন্ধুবান্ধব নিয়েই তো সংসার, এ-দিনে ক'টা লোক হ'তে পারে বন্ধুবৎসল।' পর্যন্ত দুটো উপদেশও দিলাম।

তারপর ঠুনঠুন্‌ ক'রে রিক্‌শার তো ঘণ্টা বাজলো না, আমার বুকের ভিতর ঘণ্টা বাজতে লাগলো।

শিস দিতে-দিতে ওপরে উঠছিলাম ডবল সিঁড়ি ডিঙিয়ে, যেন বুকের একটা ভার নেমে গেছে। কিন্তু মনের এই প্রফুল্ল ভাব নষ্ট করে দিলে ধুমসি মেয়েটা। সিঁড়ির মুখ আগলে দাঁড়িয়ে আছে প্রীতি। যেন গোরু চরাতে এসেছে।

'তোমার বেলা হ'য়ে গেলো, বাবা।'

'তুই আমার অফিস করবি নাকি ?' রাগে রুখে উঠলাম এবং আরো কি বলতে গেছি, দেখি, ঘন সবুজ রঙের একটা টুথব্রাশ-হাতে সিঁড়ির মুখে লীলাময়ী। ঘুম-ভাঙা ফোলা-ফোলা চোখ।

ভয় হ'লো রাত্রের মাংসের কথাটা না তোলে হঠাৎ।

কিন্তু লীলাময়ী চালাক মেয়ে। সেয়ানা।

যেন কাল বিকেলের পর এই আমার সঙ্গে দেখা।

'আজ আবার আপনাকে একটু কষ্ট দেবো।' কত যেন দ্বিধাগ্রস্ত চেহারা। দাঁড়ালো প্রীতির ঠিক পেছনে।

'কষ্ট আর কি,' বললাম, 'এক-জায়গায় থাকতে গেলে এমন—'

'এ-বেলা পারবেন না। সময় নেই আপনার। ও-বেলা অফিস থেকে ফেরার সময়—'

'বলুন-না কি করতে হবে,'—যেন সংকুচিত আমিও সন্ত্রস্ত। চোরা চোখে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো প্রীতির চোখ দুটো দেখে নিলাম। 'কিছু আনতে হবে বুঝি ?'

'ইলিশ মাছ, গঙ্গার ইলিশ পান তো।' লীলাময়ী আমার চোখে তাকালো। পরে চোখ ফিরিয়ে নিলো।

'ও আবার কষ্ট কি।' হেসে লীলাময়ীর মুখের দিকে তাকালাম। লাল-রঙা ডবল নোট দুটো আলগোছে আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে যুবতী ধীর মন্থর পায়ে দাঁত ঘষতে-ঘষতে প্যাসেজের দিকে চ'লে গেলো।

একটা ক্রুদ্ধ জ্বলন্ত দৃষ্টি প্রীতির মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে আমিও ঘরে চ'লে এলাম।

যেন স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ আলাদা আমি এই গোষ্ঠী থেকে। মণ্টু ফণ্টু একসঙ্গে খেতে বসেছে, একবার ওদের মুখের দিকেও তাকাইনি। যদি-বা এক-আধবার চোখে পড়েছে, মনে হয়েছে দুঃখে দারিদ্র্যে অভাবে জমাট এক-একটি শিলাখণ্ড আমার রাস্তা জুড়ে আছে। এ-বেলা পরিবেশন করলো বীথি। রান্না করেছে নিশ্চয় বুড়ি মেয়েটা। যত বয়েস হচ্ছে মাথায় বদচিন্তা কুটকুট করছে। রান্না!

আর রাত্রে এতটা ঘি গরম-মশলার মাংস খেয়ে চিংড়ি ছাঁচি-কুমড়োর তরকারি জিহ্বায় কেমন লাগবে কল্পনা করুন। আর ঘরময় হেমলতার গাত্রোত্থিত বালিশের উগ্র ঝাঁঝালো গন্ধ। যেন উনিশ বছর এই গন্ধটা ছড়িয়ে হেমলতা আমার পরমায়ুকে জীর্ণতর করবার জন্যে বেঁচে আছে। কোনোমতে খাওয়া শেষ ক'রে জামা চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

অফিসে পৌঁছে, আমার যা প্রথম কাজ, ডেস্প্যাচের অনঙ্গ ধরকে আড়ালে ডেকে নিলাম।

'শঙ্খিনী নারীর লক্ষণ কি, ভায়া?'

'গোপন-স্বভাবা, কিন্তু তেজস্বিনী।'

চুপ ক'রে জায়গায় এসে বসলাম। এ-সব ব্যাপারে অনঙ্গ ধরের পরামর্শ মেনে চলি আমরা, বয়স্করা। নারীচরিত্র ওর নখাগ্রে। এক বিয়ে করেছিলো লোকটা আইন মতো, আরেক বিয়ে সেদিন ক'রে এসেছে আইন ভেঙে, এ-বয়সে। সাহস যেমন, জানেও অনেক। সুতরাং উঠতে-বসতে এ-সব ব্যাপারে আমরা অফিসের তথাকথিত বুড়ো যারা অনঙ্গর মতামতের সঙ্গে লক্ষণ-বিলক্ষণগুলো মিলিয়ে দেখি। চেষ্টা করি সে-ভাবে চলার। নইলে তো এখনকার ছেলে-ছোকরাদের মতো ট্র্যামে-পার্কে-ময়দানে-রাস্তায় ঘুরতে হ'তো মায়াবিনী হরিণীর খুরের ধুলো খেয়ে।

এখনকার ওরা জানে না অন্দরের অন্ধকারেও সুন্দর জন্তু থাকে খেলার—খেলবার। কোথায় সেই স্থৈর্য, সে আবিষ্কার।

লেজার আড়াল করে সারাদিন ব'সে মাথা খাটালাম, চিন্তা করলাম। পাঁচটা বাজতে রাস্তায় নেমে সোজা গঙ্গার ঘাটে।

একটা-একটা ক'রে সতেরোটা মাছ উল্টে-পাল্টে দেখে শেষে বেশ চকচকে চ্যাপ্টা মনের মতন ইলিশ বেছে নিয়ে দাম চুকিয়ে বাড়ির দিকে চললাম। ইচ্ছা করেই রাস্তায় সন্ধ্যা করলাম।

গলির মুখে এসে মাছটা বাঁ-হাত থেকে ডান হাতে নিলাম। কেননা আমাদের ঘর বারান্দার বাঁয়ে, অর্থাৎ তুমি যদি প্যাসেজ ধ'রে পার্টিশনের দিকে যাও যে-কেউ দেখবে হাতে মাছ। কিন্তু তবু সিঁড়ির মুখে মণ্টুটা দেখে ফেললো। আবছা অন্ধকারেও টের পেলো মাছ। কিছু বললে না, কেবল হাঁ ক'রে চেয়ে রইলো, যেন ওর বিশ্বাসই হয়নি এতবড়ো ইলিশ বাবা ঘরে আনবে।

দেখলে বীথি, চৌবাচ্চার দিকে যাচ্ছিলো ও।

প্রীতি। কালকের মতো চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ঠিক চোখ মেলে চেয়েছিলো। এবং সবগুলো চোখকে উপেক্ষা ক'রে, যেন আমি কাউকে দেখিনি, সোজা চ'লে গেলাম ঘাড় গুঁজে প্যাসেজের ওধারে।

কড়া নাড়তে ঘর-দুয়ার লাল আলোয় টল্‌টল্‌ ক'রে উঠলো। এই সবে আলো জললো। বেরিয়ে এলো লীলাময়ী। ফোলা-ফোলা চোখ। যেন অবেলায় অনেক ঘুমিয়ে উঠেছে। খোঁপা ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে খোলা পিঠে। আঁচলের আধখানা মাটিতে লুটোয়।

'দাঁড়িয়ে কেন, আসুন।'

ইতস্তত করলাম, পিছনের দিকে তাকাই একবার।

'বাঘ, বাঘের খাঁচা এটা!' ধমক দিয়ে লীলাময়ী হাসলো। ফুলের পাপড়ি ছিটকে পড়লো চারিদিকে। ওর হাসির আড়ালে কালো চোখের তারায় দেখলাম স্বচ্ছ নীল স্ফুলিঙ্গ। এক-মুহূর্তের জন্যে।

নিঃশব্দে চৌকাঠ পার হয়ে আমাকে ভিতরে যেতে হ'লো। ছোট্টো উঠোন। চুপচাপ।

এক হাতে আঁচল গুটোতে-গুটোতে অন্য হাতে সদরের ছিটকিনি তুলে দিয়ে ও ঘুরে দাঁড়ালো। হাসলো আবার। নিশ্চিত নির্ভয়। এখন আমরা বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। বুকের ভিতর দুবদুব করছে আমার।

'কি করবো বলুন', বললাম আস্তে-আস্তে। যেন ওর হাতের পুত্তলি আমি, নির্দেশ মেনে চলবো। 'কোথায় রাখবো মাছ?'

'রাখুন ওখানে।' আঙুল দিয়ে নর্দমার ধারটা দেখিয়ে যুবতী ফের মিটিমিটি হাসলো। 'যেন আপনাকে হুকুম করছি, তাই আবার ভাবছেন না তো?' ব'লে চোখ টিপলো।

'হুকুম করতে জানেন ব'লেই তো করছেন।' মাছটা নামিয়ে রেখে ওর মুখের দিকে তাকালাম। রসে কৌতুকে আয়ত ঢলঢল চোখ। ভাবলাম, তোমার হুকুম জন্মে-জন্মে মানতে রাজী।

'তাই নাকি! দাঁড়ান, আমি আসছি।'

দীর্ঘ ফর্সা দেহ, সম্রাজ্ঞীর মতো। দু-হাতে খোঁপা ঠিক করতে-করতে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

এলো থালা আর বঁটি নিয়ে।

'ও, আমায় সামনে রেখে মাছ কুটবেন বুঝি?'

'দেখবো না ভালো কি মন্দ, টাটকা না পচা?' কুটিল আঁকা-বাঁকা হাসি ঠোঁটের কিনারায়। যেন এখন পর্যন্ত সহজ হ'তে পারছে না এমন ভাব। শঙ্খিনী।

'দেখুন।' ঠোঁট টিপে হাসলাম। 'অনেক ঘুরে দেখে-শুনে এনেছি।'

'তাই বুঝি এত রাত হ'লো?' কুটিলতর চোখে হাসলো ভ্রূবিলাসিনী। এমন চালাক, এমন চাপা। ঠাট ক'রে কোমরে আঁচল জড়িয়ে বঁটি বিছিয়ে বসলো। কান গরম হ'য়ে গেছে আমার। মাথা ঝিমঝিম করছে। বুঝি আশা আকাঙ্ক্ষা ভয় ও লোভ একসঙ্গে আমার চোখে ফুটে উঠেছে তখন। আমি পুরুষ। কিন্তু ওরা পারে মনের ভাব অনেকক্ষণ গোপন রাখতে। ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা। লীলাময়ী ঝপ্ করে তখন কিনা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছে।

'আপনার স্ত্রী উঠে দাঁড়াতে পারে না?'

'একেবারে অচল।' দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, অবশ্য অন্য কারণে। ওর হাতের মাছ দু-খণ্ড হ'য়ে বঁটির বুক থেকে থালায় নেমে এলো। তাজা লাল রক্ত। উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলাম।

'দেখুন কেমন টাটকা ইলিশ।' বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করলাম। রক্তের একটা ফোঁটা ছিটকে ওর গালে পড়েছে, নাকের পাশে। হাতের পিঠ দিয়ে ও তাই মুছতে চেষ্টা করছে বার-বার।

'আরেকটু নিচে।' রুদ্ধশ্বাসে বললাম।

কিন্তু এবারও ঠিক জায়গায় হাত পৌঁছলো না।

'হ'লো না,' বললাম, 'আরো ওপরে।'

'দিন-না মুছে।' কাতর চোখে ও আমার দিকে তাকালো। হাত জোড়া, পারছে না নিজে। মনে হ'লো গালে ওর রক্তবর্ণ একটা তিল। হাত কাঁপছিলো আমার, ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ছে। নুয়ে কাপড়ের খুঁট দিয়ে রক্তের দাগ মুছে দিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য লীলাময়ী। অটল অটুট। যেন কিছুই হয়নি, যেন এই স্বাভাবিক। বললো, 'দাঁড়িয়ে কেন, বসুন, গল্প করুন, আমি মাছ কুটে শেষ করি।'

'ততক্ষণে উনুনের কাঠ ক'খানা তো কাটিয়ে নিতে পারো ওকে দিয়ে।' ঘরের ভিতর থেকে শব্দ এলো, ইঞ্জিনিয়ারের গলা, শুয়ে আছে যেন।

আমার চোখে চোখ চেয়ে লীলাময়ী মিটিমিটি হাসছে।

'এ-বেলা বেরোতে পারেনি, মানিব্যাগ লুকিয়ে রেখেছিলাম, শুনুন কেমন পাকা সংসারীর মতো কথা বলছে এখন।' পরে মুখ ফিরিয়ে ঘরের দিকে চেয়ে গলা বড়ো করে বললো, 'তা উনি কেটে দেবেন, তুমি চুপচাপ শুয়ে থাকো, কুলদাবাবুকে দিয়ে তোমার জন্য নিচে থেকে একটিন সিগারেটও আনিয়ে রাখবো ভেবেছি।'

মঙ্গলগ্রহের লাল শক্ত সিমেন্টের ওপর চোখ রেখে কথাগুলি শুনছি আমি।

দৃষ্টি

এমন আর হয়নি কোনোদিন। চা-এর সঙ্গে আটার রুটি, দু-চার পয়সার তেলেভাজা খাবার, কি তেল-নুন-মাখানো মুড়ি চলছিলো আমাদের সকালবেলা। আগে, সেই যুদ্ধের আগে, যখন ঘি সস্তা ছিলো, লুচি কি নিম্‌কি হ'তো মাঝে-মাঝে মনে আছে। চা-এর সঙ্গে গরম নিম্‌কি বাবার খুব প্রিয় ছিলো। আজ শুধু চা দিলাম বাবাকে। হাতল-ভাঙা একটা কাপ। সসার্ নেই। ওটা গেছে আমার ছোটো বোন ডলির হাত থেকে প'ড়ে। আর কাপ-এর হাতলটা ভেঙেছি আমি। আমার দোষে গেছে।

তবু তো একটা কাপ কম দিন যায়নি। ন'মাস টিঁকছে।

জানি, এটা ভাঙলে আর নতুন কাপ আসছে না শিগ্‌গির।

মাথা নিচু ক'রে ব'সে ছিলো বাবা। মা যখন চা দিয়ে যায় তখনো মুখ তোলেনি। চা-এর কাপে চুমুক দেবার পর আবার বাবা মেঝের দিকে চেয়ে রইলো দেখলাম।

মা রান্নাঘরে যায়নি। যেতে পারে না। শোবার ঘরে হয়তো আছে। সকাল থেকে একটা কথাও মা-র শুনিনি। ডলি পাটীগণিত সামনে নিয়ে পাশের বাড়ির পাঁচিলের কাক গুনছে এবং দু-বছরের টাটু্‌ বাবার জুতোজোড়ার মধ্যে পা ঢুকিয়ে বিকট ঢপঢপ আওয়াজ তুলে ঘরের এমাথা-ওমাথা পায়চারি করছে দেখেও মা শব্দ করছে না। সত্যি কেমন অদ্ভুত লাগে।

তবু আমি বাবার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। দাঁড়াই।

বাবার খাবার সময় মা কাছে থাকে না ব'লেই যেন মা-র জায়গায় আমাকে দাঁড়াতে হয় আজকাল।

বলতে কি, মা সামনে থাক, বিশেষ ক'রে কোনো-কিছু খেতে দিয়ে, বাবা যেন নিজেও চাইছে না। কেননা, লক্ষ্য করেছি, বাবা তখন একেবারে কিছু খেতে পারে না। বড়ো বেশি আড়ষ্ট নির্জীব হ'য়ে পড়ে। যতটা সম্ভব তাই বাবার কাছে আমিই উপস্থিত থাকি। সে-সময় কিছু জিগ্যেস করতে বাবা আমাকেই করে। করছে।

দ্বিতীয়বার চা-এ চুমুক দিয়ে বাবা আমার দিকে তাকালো।

'আমায় কিছু বলছো, বাবা ?' বললাম ঢোক গিলে। কেননা নিজে থেকে বাবা বলবে না কিছু জানা ছিলো।

চেয়ারের হাতলের ওপর হাত রেখে বললাম, 'চা কড়া হ'য়ে গেছে কি ?'

'না, ঠিক আছে।' অল্প হেসে মেঝের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বাবা শেষে মুখ তুললো। আস্তে-আস্তে যেন পরের বাড়িতে কথা বলছে, আমার চোখে চোখ রেখে বললো, 'একটু চিনি দিতে পারবি ?'

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

আমার চুপ থাকাতেই বাবা বুঝলো। 'যাক গে, ঠিক আছে।' ব'লে কাপের ওপর ফের মুখ নামালো। একটু পরে, আমি বেশ বুঝলাম, চিনির কথাটা চাপা দেবার জন্যেই বাবা হঠাৎ আমার পায়ের দিকে তাকায়।

'ইস্, কী মাটি জমেছে পায়ে ত্যাখ্। স্নানের সময় সাবান দিস না, অনু ?' চুপ ক'রে রইলাম।

আমি জানি, সাবান না দিয়েও দুই পা-কে কি ক'রে শুধু জলে অমনি তোয়ালের সাহায্যে রগ্‌ড়ে ঘ'ষে-মেজে ঝকঝকে সুন্দর রাখতে হয়, এই বয়সের আর-দশটি মেয়ে কি ক'রে পা সুন্দর রাখছে। ষোলো বছরের মেয়ের পায়ে ময়লা জমে না। তাই বাবার এই কথা প্রসঙ্গান্তরের কথা, টের পেতে বিলম্ব হ'লো না।

কিন্তু আশ্চর্য, সেই প্রসঙ্গেরও জবাব মিললো। জবাব দিলে মা। আমি যখন চুপ ক'রে ছিলাম পাশের ঘরে শোনা গেলো স্পষ্ট দীর্ঘশ্বাস।

বাবা এই বিষয়ে আর অগ্রসর হ'লো না। চুপ করলো। কিন্তু কতক্ষণ, এই সবে সকাল, দিনের মোটে শুরু। এখনই ডলি ও টাটু ছুটে আসবে মা-র কাছে, 'খেতে দাও, মা।' চিৎকার করবে ওরা। কান্নাকাটি করবে।

তখন। তখনকার ঘরের চেহারা কি হবে। কি ভাবে উত্তর দেবে মা পাশের ঘরে, আর তার ধাক্কা এসে এ-ঘরে লাগবে কেমন! সে-কথা, সেই ছবি আমি ভাবছিলাম। অর্থাৎ বাবার চেহারা মনে-মনে আঁকছিলাম। তার পাশে দাঁড়িয়ে।

আমি জানি বাবা তখন চুপ ক'রে তাকাবে আমার দিকেই।

সন্তানের দিকে এই তাকানো—স্নেহ-দৃষ্টি নয়, স্নেহ-প্রত্যাশার চাউনি। বাপ মেয়ের কাছে স্নেহ খুঁজছে, সান্ত্বনা চাইছে, আশ্রয়।

কেননা, বাবার খাওয়ার সময় মা স'রে থাকতে পারে, ডলি ও টাটুর যখন খাওয়ার সময় উপস্থিত হয়, তখন মা চুপ ক'রে সে-ঘরে শুয়ে থাকতে পারে না, ছুটে আসে এখানে, বাবার সামনে। আসবেই।

'তুমি যদি চাকরি যোগাড় করতে না পারো বলো, আমি যাই, আমায় যেতে দাও, রোজগার করি। ওরা অন্তত পেট ভ'রে খেয়ে বাঁচুক। না পারুক, না লেখাপড়া শিখুক আমার দুঃখ নেই, তবু তো—' মা দেয়ালের দিকে চোখ ফেরাবে, বাবা মুখ তুলছে না দেখে দেয়ালকে লক্ষ্য ক'রেই কথাগুলি বলবে অর্থাৎ দেয়ালের গায়ে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারবে কথার শাবল। হ্যাঁ, একবার আরম্ভ করলে মাকে থামানো মুশকিল। 'তুমি চুপ ক'রে আছো থাকতে পারছো। আমি এখন ওদের কি উত্তর দিই, কি বোঝাই! না সন্তান বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব একলা আমার?' ব'লে জ্বলন্ত দৃষ্টি বাবার আনত ঘাড়ের ওপর রেখে মা ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলবে।

তথাপি বাবা নিরুত্তর থাকবে।

চাল কয়লা তেল, এমন কি হলুদ লঙ্ক. বলতেও ঘরে আজ আর কিছু নেই। আমি জানি। কাল বিকেলে সব ফুরিয়েছে। তারও আগে। সেই দুপুরে। রাত্রে আড়াইখানা ক'রে আটার রুটি আর জলের মতো পাতলা একটু বিউলির ডাল তো হয়েছিলো।

আজ? তা-ও সকাল পার না হ'তে আমি দুধ চিনি দেশলাইয়ের কাঠি ইত্যাদি ধার ক'রে ফেলেছি। না-হলে বাবার অন্তত একবারেরও চা হয় না।

আগুনের সঙ্গে এখানেই আজ সম্পর্ক শেষ। কাগজ জেলে কোনো-রকমে এক কাপ চায়ের জল ফুটিয়ে নামানো। উনুনে আগুন দেয়া হয়নি।

'দুটো টাকা ধার ক'রে এনেছো শুনতাম যদি!' মা মুখ ঘুরিয়ে বলবে, 'সব দিকেই যোগ্য তুমি। ট্র্যাম-বাসের তলে ছ-আনার পয়সা কাল জলে গেছে। বলছিলাম বিকেলে অনিকে। কেমন বলিনি তোকে, অনু?'

অর্থাৎ কাল আবার চাকরির চেষ্টায় গেছে বাবা টালিগঞ্জে কার কাছে। কিছুই হয়নি। ফিরে এসেছে। অনেক রাত্রে ফিরেছিলো বাবা আমি টের পেয়েছি। পায়সার কথাটা কাল বিকেলে মা বলেছিলো।

'ছ-আনা পয়সা অমনি নষ্ট না হ'লে, আমি ওদের—বাচ্চা দুটোকে অন্তত কিছু মুড়ি খাবার কিনে দিতে পারতাম। খামোকা পয়সা নষ্ট করবে তুমি আমি কি জানি না।' ব'লে মা আমার দিকে তাকাতে চেষ্টা করবে হয়তো তখন। হলামই-বা সকলের বড়ো সন্তান। খাওয়া-সম্পর্কে আমার কথার উল্লেখ হ'লো না দেখে সত্যি দুঃখ করছি কিনা তা দেখবার জন্যে মা-র মনে কৌতূহল হওয়া কি স্বাভাবিক নয়? কিন্তু আমি জানি, মা চোখ ফেরাবার আগে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে আর-এক-জোড়া নির্জীব অসহায় লজ্জিত বিষণ্ণ চোখ। 'তুই একবার

তোর মাকে থামতে বল, অনু। আমি যে পারছি না। সারাদিনের সম্বল আমায় একটু চা খেতেও দেবে না ও।' যেন বলছে বাবা।

'তুমি যাও মা ঘরে।' বলবো, বলতে হবে তখন আমাকে। 'দেখি না চেষ্টা ক'রে গোটা-দুই টাকা ধার যদি পাই কারো কাছে।'

জানি, মা গম্ভীর হ'য়ে বেরিয়ে যাবে তৎক্ষণাৎ।

আর মেঝের দিকে তাকিয়ে বাবা ছোট্টো একটা নিশ্বাস ফেলবে। এবং বারান্দার চৌকাঠ পার হ'য়ে আমি যখন ওপরের ফ্ল্যাটগুলিতে ওঠবার সিঁড়ি ধরছি, তখন পিছন থেকে—ঘাড় না ঘুরিয়েও দেখতে পাবো, কৃতজ্ঞ সজল চোখে বাবা আমার দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু আমি জানি, ওপরে কারো কাছে টাকা ধার পাবো না। কেবল মাকে থামাবার জন্য ধারের কথা বলা, কে দেবে আমাকে টাকা কর্জ। কেননা, আমরা যে কিছু না, আমাদের হ'য়ে এসেছে, এটা অনুমান করতে ওপরের কোনো গৃহিণীর বাকি আছে কি। রোজ আমাকে এটা ওটা চাইতে হচ্ছে, এ-ঘরে ও-ঘরে। চিনি থেকে চাল, দেশলাইয়ের কাঠি থেকে কয়লা। এ থেকে সব বুঝতে পারছে। সবাই টের পায়।

ন-মাস বাবার চাকরি নেই। সেই যে ব্যাঙ্ক ফেল প'ড়ে কাজটি গেছে আর জুটছে না। কোনোরকমেই জোটাতে পারছে না একটি কোথাও।

সতেরো জায়গা থেকে ইণ্টারভিউ এসেছিলো। সতেরো জায়গা থেকে বিফল মনোরথ হ'য়ে ফিরেছে বাবা। মা বলছে, 'ওরা যোগ্য লোক নিয়েছে, তার অর্থ তোমার চেয়ে যোগ্য লোক পেয়েছে। তোমার চেয়ে যোগ্য সবাই। সর্বত্র।'

মা আরো বলবে, 'আমি তখনই জানি। বলেছিলাম অনিকে, কেমন বলিনি তোকে, অনু?' ছলছল চোখে ডলি ও টাটুর দিকে তাকিয়ে মা সর্বদা বলছে এ-কথা, 'বাচ্চা দুটো যে চোখের সামনে না খেয়ে মরবে, সেই দুঃখ।'

'চালাক-চতুর হ'তে হয় সংসারে।' কথার শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা। 'চটপটে হ'তে হয়, চোখেমুখে কথা না ফুটলে মানুষ বুঝবে কি ক'রে তুমি একটি এম. এ. পাস মহাবিদ্বান। আর তাতেই বা হ'লো কি। সেই তো পঁচাত্তর টাকায় ব্যাঙ্কের চাকরিতে ঢুকেছিলে, আজ তিন সন্তানের বাপ হ'য়ে দু-শ' টাকায় এসে গড়াগড়ি দিচ্ছো, দিচ্ছিলে। হচ্ছিলোই-বা কি।' মা এখনো এক-এক সময় ভুলে যায় বাবার আজ চাকরিই নেই।

অর্থাৎ বাবা যে সংসারে কোনো কাজের না, হাবাগোবা ভালোমানুষ হ'য়ে

সংসারটা একেবারে ভোঁতা ক'রে রেখেছে সেই দুঃখ উথ্‌লে উঠেছে মা-র মনে তখন। কবে কোন এক বড়ো মার্চেন্ট অফিসে সুযোগ পেয়ে বাবা যায়নি। স্যুট পরতে হবে ভয়ে, যে যায়নি বা সেটা একটা বিলিতি প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক বাঙালির—বাঙালি-প্রতিষ্ঠানে চিরজীবন আঁকড়ে থাকবো এই আদর্শবোধে কি? 'আসলে ও ভয় পায়, আমার কথা কি বুঝলি অনু—' মা বাবার সামনেও আমাকে বোঝায়, 'সাহেব-সুবোর সঙ্গে কথা বলতেই উনি ভয় পাচ্ছেন, চোখেমুখে কথা কইতে হয় সেখানে, টিপটপ চলতে হয়, ফিটফাট না থাকলে চাকরি যায়, চাকরি যাবে ভয়ে শ্যাওলা-ধরা পচা এক ব্যাঙ্কের চাকরি ছাড়ছে না—উত্থানপতন শূন্য হয়ে যেখানে দলা পাকিয়ে শুয়ে আছে সেখানেই থাকছে। তা-ও যদি ভালো ব্যাঙ্ক হ'তো।'

এ-সব কথা বাবা আগেও শুনতো। তখনো হাসতো, আর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো। আমার দিকে আজ যেমন তাকায় বাবা, সেদিনও তাকিয়েছে। অর্থাৎ মা-র মনে যে সন্তোষ নেই, আরো বেশি উপায় করবার মতো সাহস, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, আগ্রহ ও উত্তাপ-হীন হ'য়ে ঠাণ্ডা ভালোমানুষ সেজে অফিসের ছুটির পর দিব্যি ঘরে এসে বাবা মেয়েকে গ্রামার পড়া শেখাচ্ছে, মা-র চোখে তার ক্ষমা ছিলো না। 'এই স্নেহ-যত্নের, এই আতিশয্যের দাম কি যার ঘরে টাকা নেই।' বলতো মা তখনই।

আর, মুখে হাসি ও চোখে বেদনা নিয়ে বাবা আমার মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে থাকতো।

আমি বলতাম, 'তুমি এখন যাও মা, আমি পড়ছি।' মা-র মুখ বন্ধ করতে সেদিনও আমায় কথা বলতে হয়েছে। বাবা আমার আশ্রয়ই নিয়েছিলো।

তবু তো সেদিন রান্না বন্ধ ছিলো না। যদিও রেডিও ছিলো না ঘরে, ইলেকট্রিক ফ্যান, কি মা-র ও আমার দামি-দামি আট-দশখানা ক'রে জমকালো শাড়ি।

অজস্র না থাকলেও অভাব তেমন ছিলো না সত্য।

চলছিলো সংসার টুকটুক্‌ ক'রে।

তাই বলছি, ধার করতে যে এখন ওপরে যাবো, রেণুর মা, পলাশের মা, মৃদুলাদি, মায়া ওরা ভাবছে কি আমাদের সম্পর্কে।

অথচ ওরাও কেউ বড়োলোক নয়। এবং এই সাহস ক'রেই প্রথম-প্রথম তেল নুন কি লঙ্কা চিনি সব ধার করেছি। যেতাম, যেন ভাবতাম মনে-মনে, অভাব তো ওদেরও একদিন হ'তে পারে। আসবে আমাদের কাছে। আসুক।

যেন এমন একটা, গোপন ইচ্ছা পোষণ করতাম কারো দরজায় দাঁড়িয়ে যখনই কিছু চেয়েছি।

সত্যি, ন-মাস বাবার চাকরি থাকবে না এ-কথা কে জানতো। ন-মাসে বাবার চেহারা কি হবে, বা কেমন হবে মা-র মেজাজ, আমি সে-কথা বলছি না, বলছি আমাদের দেখে বাইরের লোকের চেহারা কেমন হচ্ছে। তার চেয়ে বেশি আমায় দেখে। আমাকেই ওরা দেখছে বেশি। প্রায় রোজ একবার দু-বার আমাকে ওপরে যেতে হচ্ছে। কাল এক-টুকরো কাপড়কাচা-সাবান ধার করতে যেতে হয়েছিলো উত্তরের ব্লকে পলাশের মা-র কাছে।

অথচ মনে আছে, বাবার চাকরি ছিলো যেদিন সেদিকে আমি বড়ো-একটা পা বাড়াইনি। তার কারণ ওরা আমাদের চেয়ে গরিব। আগে নিজেদের সঙ্গে তুলনা করলে পলাশদের কত ছোটো মনে হ'তো। স্কুলমাস্টার বাপ। আমার বাবা যা মাইনে পাচ্ছিলো তার অর্ধেক রোজগার করেন পলাশের বাবা। আমার চেয়ে পলাশের ভাই-বোনও সংখ্যায় বেশি।

আগে ওদের দেখে ভাবতাম খুব কষ্টে সংসার চলছে। এখন আমাদের দেখে, কষ্টে নয় আদৌ কি ক'রে চলছে তা-ই ওরা ভাবছে। স্বাভাবিক। আমি দরজায় গেলে ওরা কথা কইতে আসে, হাসে। এবং আমি যে চাইতে গেছি তা ওরা প্রথম বুঝতে চায় না। বুঝতে দেয়নি এক-টুকরো কাপড়-কাচা-সাবানের অভাব হয়েছিলো আমার।

এ যেন মর্মান্তিকভাবে নিষ্ঠুর হওয়া। প্রতিবেশী দরিদ্র হ'লে প্রতিবেশীরা তাই করে। তিনবার বলার পর তবে বিশ্বাস করলো। হঠাৎ বেশ হেসে প্রশ্ন করলো পলাশের মা, 'হ্যাঁরে অনু তুই ইস্কুলে যাস্ নে আর শুনছি। বিয়ের আয়োজন চলছে বুঝি ?' চুপ করে গিয়েছিলাম।

বুঝতে কষ্ট হয়নি, সরাসরি আমার মুখ থেকে জানতে চেয়েছিলো মহিলা, আমার পড়া বন্ধ হয়েছে। মাইনে দিইনি, স্কুলে নাম কাটা গেছে। পলাশ আর আমি একসঙ্গে পড়ছিলাম কিনা। জানতে পেরে পলাশের মা বেশ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। একটা সংসার চলতে-চলতে হঠাৎ থেমে গেলে আশেপাশের সবাই চঞ্চল হয়, উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকে।

কাল রেণুর মা-র কাছে গিয়েছিলাম তিনবার। গৃহস্থের অত্যাবশ্যক তিনটি সামগ্রী অর্থাৎ তেল-নুন ও কয়লা ধার করতে যেতে হয়েছিলো।

আশ্চর্য, তাতেও মহিলা বিচলিত হননি।

হঠাৎ তিনি আমার গায়ে হাত রেখে ব্লাউজের গলার ভিতর রীতিমতো হাত ঢুকিয়ে নেক্‌লেসটা টেনে বার করলেন।

তারপর হেসে উঠলেন। 'আমি আরো ভাবছিলাম নতুন হার গড়িয়েছিস বুঝি।' ব'লে হার থেকে হাত গুটিয়ে নিলেন মহিলা।

চুপ ক'রে রইলাম।

অর্থাৎ আমারটা যে যায়নি এখনো, কেন যায়নি, কবে যাচ্ছে, মুখ দিয়ে ঠিক খবরটা বেরোয় কিনা শুনবার জন্যেই যে রেণুর মা এই কাণ্ডটি করলো এবং ভবিষ্যতেও করবে বেশ জানা ছিলো। জানতাম।

মা আজ মাসের ওপর ওপরে যায় না। ওরা কি টের পায় না কেন। অর্থাৎ মা-র গায়ে আর একটাও গয়না নেই। তারা ধ'রে নিয়েছে। তারা বোঝে। তেল নুন লঙ্কা চেয়ে অভাবের ফুটো সারানো চলে। কিন্তু বড়ো-বড়ো ফাঁক—বাড়িভাড়া, রেশন খরচ, টাটুর দুধের দাম যোগাতে বড়ো-বড়ো জিনিসে হাত পড়ছে। আর, আমরা সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে আছি ব'লে সবাই এখন আমাদের সুখ নিয়ে এত বেশি টানাটানি করছে। বিশেষ ক'রে আমার, আমাকেই হাতের কাছে পাচ্ছে, কবে আমার বিয়ে হবে, গায়ে নতুন গয়না উঠলো নাকি?

দুঃখের মধ্যেও হাসি পায়।

আমার সুখ দিয়ে আমাদের সকলের দুঃখের পরিধি নির্ণয় করছে ওরা। সমস্ত পরিবারের।

অর্থাৎ পরিবারের যে মেয়েটির ষোল বছর পূর্ণ হ'লো তার এই পাওয়া উচিত ছিলো, এই হওয়া, তাই কি? পরিবারের মেয়ের কোনো দাম দিলে না।

মনে-মনে বলেছি, ওরা যদি জানতো—ওরা জানে না।

ভালোমানুষ, সরল, সত্যপ্রিয় স্নেহান্ধ লোক আধুনিক পৃথিবীতে অচল। বাবার অপরাধ তাই। চেষ্টার ত্রুটি করেনি। এখনো খুঁজছে চাকরি। কে দেয়?

হ্যাঁ, মা-র চোখে পর্যন্ত বাবা অবান্তর, অপদার্থ, অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেলো, দেখতে-দেখতে। তোমরা তো হাসবেই। আমার, আমাদের দুরবস্থা দেখে, ষোলো বছরের মেয়ের সম্ভাবিত সুখের ঝিলমিল ধ'রে টানাটানি করবে এ আর বিচিত্র কি। এই নিয়ম।

তাই ভাবছিলাম টাকা চাইতে গেলে কেমন চেহারা হবে ওদের কে জানে।

বরং টাকা ধার চেয়ে না পাওয়ার চেয়ে ওদের হাসিকে আমি ভয় করবো বেশি। আমার একটা-কিছু চরম দুখের কথা তুলে আমার বঞ্চনাকে প্রকট-ভাবে চোখের সামনে মেলে ধরবার জন্যে তিন-পা এগিয়ে আসবে হয়তো মৃদুলা।

মৃদুলা নার্স। স্বামী-সন্তান লাভের সৌভাগ্য হয়নি এখনো। কেন হয়নি, হবে কিনা তা ও-ই জানে। উজ্জ্বল শ্যামল রং। ত্রিশের কাছে বয়েস। ফিটফাট চেহারা, সেজেগুজে থাকে। অল্প হেসে চটি পায়ে পায়চারি করতে-করতে বলবে, 'তোমার মতো সুন্দর চেহারার মেয়েকে টাকা ধার কে না দেবে, ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-পুরুষ সবাই, কিন্তু জিজ্ঞেস করি, হঠাৎ টাকার দরকার হ'লো কেন, টাকা দিয়ে করবে কি?'

এক চোখ ছোটো ক'রে প্রশ্ন করবে মৃদুলা।

চোখ ঘুরিয়ে মায়া বলবে, 'কেন আর কি, লুকিয়ে লাভারকে কিছু প্রেজেণ্ট করবে, ফটো তুলে রেজিস্টার্ড চিঠি দেবে, দরকার হয়েছে আর কি বাড়তি টাকার, বাপের খরচে কি আর সব দিক কুলোয় মেয়ের।'

'হ্যাঁ, বয়েস আসে বৈকি একটা ঢেউ-খেলানো, যখন দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না টাকা চাইতেও। এতে বাপের কলঙ্ক হ'লো কি অকলঙ্ক। শেষটায় কার কাছে গিয়ে পড়বে টাকার জন্যে, তোমরা মেয়েরা কার কাছে কি আছে দিয়ে দাও ভালোয়-ভালোয় অনুকে টাকা ধার।' ব'লে মৃদুলা কাটবে। নীচ রসিকতা দিয়ে নিজের অনিচ্ছার নীচতাকে ঢেকে রেখে স'রে পড়বে জানা কথা। তবু ও স্বীকার করবে না শুধু আমার টাকার দরকার নয়, আমাদের, সকলের।

আর মেয়েদের মধ্যে থাকে মায়া এবং রেণু। ওদের হাতে টাকা থাকে না। ওরা পরিষ্কার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে মাকে।

মহিলারা হেসে বললেন, 'ওই তো মেয়ে মুশকিল বাধালে, টাকা? উঁহু। সব পারি তোমায় দিতে, ওটা পারি না। আমার মেয়েরা গাড়ি ক'রে ইস্কুলে যায় গাড়ি ক'রে ফেরে। ট্র্যাম-বাসের পয়সা বলতেও ওরা হাতে কিছু পায় না। টাকা ধার ক'রে সিনেমা দেখবি? রেস্টুরেণ্টে যাবি? কে, সঙ্গী কারা? একলা খুব ঢুঁ মারতে শিখেছিস বুঝি বাইরে। যা, ভাগ্‌। টাকা নিয়ে তুই করবি কি?' বলবে ওরা হেসে।

এই বলছে ওরা যেদিন থেকে শুনেছে আমরা বিপন্ন।

আমার উচ্ছলতার, আমার উজ্জ্বলতার, চপল যৌবনের সব ছবি টেনে আনছে চোখের সামনে।

ডিসেম্বরের এই অদ্ভুত রোদ-পোহানো-দুপুরে বোটানিক্যাল-গার্ডেন কি ইডেন-গার্ডেনে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করার খরচ যোগাচ্ছে অনু। বলবে কেউ।

কেননা, ওরা বেশ জানে এই টাকা এনে আমি বাবার হাতে দেবো। বাবা বাজারে যাবে। তবে আমাদের রান্না চড়বে। টাটু ডলি খাবে। অর্থাৎ অন্তত এক-দুপুরের মতো ঠাঁই হবে আমাদের দাঁড়াবার।

তবু ওরা জানবে না। হাসি-ঠাট্টার নিচে আমার টাকা-চাওয়া চাপা প'ড়ে যাবে। তেল-নুন-লকড়ি ধার দিলেও টাকা দেবে না কেউ। আমাদের দিয়ে বিশ্বাস কি।

চুপ ক'রে ভাবছিলাম।

দেখি চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বাবা একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অনেকক্ষণ চা খাওয়া শেষ হয়েছে, টের পাইনি।

'আমায় কিছু বলছো বাবা ?' ঢোক গিলে বললাম।

'কাল টালিগঞ্জ থেকে যখন ফিরছি ট্র্যামে অবনী মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা।' ব'লে বাবা চুপ করলো। আমিও চুপ ছিলাম। বাবার আর একটি বন্ধু। বন্ধুরা এখন কেউ আর বাড়িতে আসে না। বাবার সঙ্গে রাস্তায়, ট্রামে-বাসে কখনো-সখনো দেখা হচ্ছে আর বাবার অসহায় অবস্থা দেখে আলগা থেকে এক-একজন এক-এক রকম পরামর্শ দিচ্ছে উপদেশও বলা যায় ; এটা করো, ওটা করো।

একটু পরে আস্তে-আস্তে জিগ্যেস করলাম, 'কিছু কথা হ'লো কি, জানাশোনা আছে তাঁর কোনো চাকরি তোমার—'

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'বললে, টাইপরাইটিং শিখে ফেলো চাকরি পাওয়া সহজ হবে।'

চুপ আমি। বাবার চোখে জল এসে গেছে।

'এ-বয়সে ও-সব এখন শিখতে পারবো, মা ? তুই আমায় একটু বুদ্ধি দে, আমি যে—'

বাবার চেয়ারের হাতল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বাবার পিঠের ওপর আস্তে হাত রেখে আমিও ছোট একটা নিশ্বাস ফেললাম। বন্ধুরা এ-ধরনের অদ্ভুত সব পরামর্শ দিচ্ছে বাবাকে। যা তার পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়। এই বয়সে। সত্যি কি বাবা প্রায় বুড়ো হ'তে চললো না ? চোয়াল বসে গেছে, দৃষ্টি ক্ষীণ হয়েছে। নতুন করে এখন টাইপ শিখতে গেলে বাবার বুকের হাড় ন'ড়ে উঠবে

রান্নাবান্না শেষ করলাম বটে, ডলি টাটু অনেকদিন পর দু-টুকরো মাছ দিয়ে পেট ভ'রে ভাত খেলো। কিন্তু আমার মনের ভার কাটলো না।

মেয়েকে দিয়ে টাকা ধার করানোর ঘৃণায় মা খেতে এলো না ব'লে নয়, টাকা ধার করার সামর্থ্য যখন ফুরিয়েছে তখনো আমি সাহায্য করতে গেছি, মানে আরো এক-পা বাড়িয়েছি। যদি মা জানতো, টের পেতো গলার হার খুলে দিয়েছে আজ অনু।

কিন্তু সেজন্যে তো আমার মন খারাপ নয়, ভয় হচ্ছিলো, তারপর কি হবে।

কাল-পরশুর মধ্যে টাকা ক'টা ফুরোবে।

আবার একদিন রান্না বন্ধ হবে।

ডলি টাটু কেঁদে উঠবে। তখন আমি করবো কি?

মা-র বাক্যবাণে জর্জরিত ক্লান্ত বিষণ্ন বাবা আবার যখন আমার দিকে চোখ তুলে তাকাবে তখন আমি কি দেবো তাকে, কি দিয়ে আশ্বাস দিই।

যদি আমার আরো দু-পদ গয়না বেশি থাকতো! এক-সময় ঈশ্বরকে ডাকলাম। না, গয়না নয়, মনে-মনে বললাম, গয়না ফুরোয়, আরো বেশি, এমন-কিছু যা মা-র চোখে পড়ে না। অথচ সংসার চলে। মা-র অজানতে আমি চালিয়ে নিচ্ছি গোটা পরিবার, বাবা যতদিন না পারছে। এমন কি হয় না? এমন কি করে না আমার বয়সের কোনো মেয়ে?

ঈশ্বর আমার ডাক শুনলো।

অঘ্রাণের রাত। ডলি টাটু সকাল-সকাল খেয়ে ঘুমিয়ে আছে। মা আর উঠলো না। আলো নেভানো ঘরের। রুক্ষ ঠাণ্ডা-টা ক'মে গেছে, আকাশ মেঘ-মেঘ। হাওয়াটা কেমন নরম মোলায়েম ঠেকছিলো অনেকদিন বাদে। ফাল্গুনী হাওয়ার মতো। আমি বারান্দায় দাঁড়াই।

না, অকালবসন্তের কথা ভাবিনি আমি। ভাবছিলাম বাবার কথা। কত রাত ক'রে ফিরবে কে জানে, বেরিয়েছে কাজের চেষ্টায়—একদিন কি বিশ্রাম নিলে হয় না। আশ্চর্য, একদিন, একটা দুপুর বাবা ঘরে ব'সে থাকতে পারলো না চাকরি গেছে পর থেকে—রোজ বেরোচ্ছে, যেন মা-র ভয়েই আরো বেশি বাইরে-বাইরে থাকছে। আর ফিরছে গভীর রাত ক'রে শেষ ট্র্যাম যখন যায় কি আসে, কি তারও পরে। ক্লান্ত কুণ্ঠিত একখানা হাত চোরের মতো আস্তে-আস্তে সদরের কড়া নাড়ে আমি টের পাই, আমি জেগে থাকি তার অপেক্ষায়, দরজা খুলে দিই।

ভাবছিলাম। রাত ন'টাও বাজেনি আজ—হঠাৎ সদর ন'ড়ে উঠলো। চমকে উঠলাম। হ্যাঁ, বাবার গলা, ফিরে এসেছে।

'বারান্দায় আলো জেলে দে, অনু।' শুনলাম।

তাড়াতাড়ি আলো জেলে দিই। দরজা খুলে দিয়ে আমি থমকে দাঁড়াই, তারপর চ'লে আসি রান্নাঘরে।

দেখি একমিনিট পর বাবা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আমার বন্ধু রাজশেখর, দেখা হ'য়ে গেলো রাস্তায়।'

চাপা রুদ্ধ কণ্ঠস্বর বাবার। যেন কি জিগ্যেস করতে গিয়ে হঠাৎ আমি থামলাম।

'চা কর।' আমার চোখের দিকে না তাকিয়ে বাবা বললো, 'চা নিয়ে চট্ ক'রে চ'লে আয়, আমি আছি ওখানে, আমি থাকবো।' বাবা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

আমি তেমনি দাঁড়িয়ে। সত্যি, একমিনিট আমি কিছুই করতে পারিনি। তারপর চায়ের কেটলিতে জল ঢালি, আগুন জ্বালি নতুন ক'রে।

চা নিয়ে যাবার আগে আবার ভাবলাম মাকে ডাকবো কি ডাকবো না। কিন্তু ডাকা হ'লো না।

অন্যদিনের মতো বাবার দিকে চেয়ে বাবার কথা ভাবতে-ভাবতে চা নিয়ে আমি চৌকাঠের বাইরে গেলাম। দরকারী লোক সঙ্গে নিয়ে এসেছে বাবা, বাবার একটা সুবিধা হচ্ছে কি ভাবলাম।

আমার পড়ার ঘর।

আমার সেই ছোট্টো টেবিল, যেখানে পাটীগণিত, সরল হাইজিন আর ডেভিড কপারফিল্ড সাজানো থাকে, থাকতো, সেখানে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখার নির্দেশ দেয় বাবা।

'এঞ্জেল! চমৎকার!' হৃষ্ট উল্লসিত একটা নিশ্বাসপতন-শব্দ কানে এলো আমি টেবিলের সামনে দাঁড়াতে।

তখন আমি চোখ তুললাম।

বাবার চেয়েও বুড়ো বাবার বন্ধু। চুল অনেক বেশি পাকা। কিন্তু বাইশ বছরের একটি ছেলের মতো চাঁছা পালিশ ঘাড়, অদ্ভুত পরিচ্ছন্ন পোশাক, আর তার চেয়েও অদ্ভুত লাগলো বকের পাখার মতো সাদা ধবধবে বাঁধানো দাঁতগুলো। দেখে কেমন ভয় করছিলো আমার। এক চোখে চশমা, ফিতেটা কাঁপছে। কালো ছুরির ফলার মতো চওড়া ফিতে।

'আশ্চর্য, তোমার মেয়ে এত বড়োটি হয়েছে একদিনও আমায় জানাওনি, যতীশ।' বাবার দিকে নয়, আমার দিকে তাকিয়েই সাদা দাঁতগুলো হাসছে। 'তোমার নাম কি খুকি?'

নাম বললাম।

কুন্ঠিত কৃতার্থের ভঙ্গিতে বাবা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে।

'তুমি আর-একটু সোজা হ'য়ে দাঁড়াও।' প্রত্যাদেশ করলেন হঠাৎ আমাকে অভ্যাগত। তেমনি চুপচাপ। দেখছে।

আমি সোজা হ'য়ে দাঁড়াই।

'এবার ঘুরে দাঁড়াও।'

আমি তা-ই করলাম।

'বাঁ-হাতটা একটু তুলে ধরো।'

ভয়ে-ভয়ে আমি হাতও তুললাম।

'গালটা দেয়ালের দিকে ঘোরাও।'

আমি গাল ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে রাখলাম।

'হবে, খুব হবে।' যুগপৎ প্রচণ্ড উৎসাহ ও চায়ের কাপে দীর্ঘ চুমুকের শব্দ কানে এলো। 'আমার হাতে ছেড়ে দাও, কী আমি ওকে ক'রে তুলি দ্যাখো-না, যতীশ।' চা শেষ করার একটু পরে তিনি উঠে পড়েন। রাস্তা পর্যন্ত বাবা বন্ধুর সঙ্গে গেলো। শুনলাম গাড়ির শব্দ।

ফিরে এসে বাবা বললো, 'তোর খুব প্রশংসা করলো।'

ভ্রূ-কুঞ্চিত হয়েছিলো যেন আমার একটু, ঈষৎ হেসে ঢোক গিলে বললাম, 'কি বললেন উনি?'

'তোর নাক-চোখ, হাত-পা, কোমর-বুক সব সুন্দর, বললে, খুব ভালো হবে।' আমার শরীরের ওপর চোখ রাখলো বাবা।

এবার সত্যি আমার ভুরু কুঁচকোয়, টের পাই।

'কী হবে সুন্দর বুক আর কোমর দিয়ে?' গলা কাঁপছিলো আমার।

'তিনটে সিনেমা-কোম্পানিতে টাকা ঢালছে রাজশেখর রায়, বলছে, তোকে—'

বললাম, 'তোমার খাওয়া হয়নি, বাবা, কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধোও।'

'তোর ইচ্ছে নেই, অমু?' বাবা আমার হাত ধরলো 'তোর মা-র কথা ছেড়ে দে, এই অবস্থায় তুই যদি এখন—'

না, বাবা আমার হাত ধরছে ব'লে কি! আমি পারি না, আমি পারিনি আমার শরীরের ওপর সেই কাতর বিষণ্ণ স্থির দৃষ্টি বেশিক্ষণ ধ'রে রাখতে। ছুটে এলাম ঘরে, মা-র ঘরে।

আশ্চর্য, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে তখনো আমি ভাবছি মাকে বলবো কি বলবো না।